আধুনিক বাংলা কাব্য

প্রথম পর্ব

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বি. বি. প্রেস, ১১০।বি অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা ৯ হইতে
এস. এম. শাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

সূচীপত্র

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয় কবির কাব্য বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য পর্ব্বের পূর্ব্বসীমা ১৮৩০, উত্তরসীমা ১৮৯৬। রবীন্দ্রকাব্যের কিছু অংশকেও কাল-পরিমাপে এই পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, কিন্তু প্রকৃত বিচারে রবীন্দ্রকাব্য হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব্বের সূত্রপাত। কালক্রমের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাই রবীন্দ্রকাব্যকে এই পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। উনবিংশ শতকের বাংলা কাব্যের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের কাব্যালোচনা করিতে আমি কিছুতেই সাহসী হইতাম না এবং এইরূপ ধারাবাহিক আলোচনা করিবার কোন পরিকল্পনাও আমার ছিল না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ কাব্যধারা সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছায় এই যুগের অপরাপর কবির রচনাও পুনরায় অধ্যয়ন করিয়াছি এবং সেই অধ্যয়নের ফলে যে প্রবন্ধগুলি একটির পর একটি জমিয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। তাই কোন বিশেষ যুগের কাব্যালোচনায় যেরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়, বর্ত্তমান পর্য্যায়ের আলোচনাগুলির মধ্যে সেরূপ কোন ঐক্যভাব বজায় থাকিতে পারে নাই। সামগ্রিকভাবে ইহা এই বই-এর একটা মৌলিক ত্রুটি। তবে মোটামুটিভাবে প্রত্যেক কবিকেই যুগের সমাজ-পরিবেশ ও কাব্য-পটভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাঁহার রচনার গুরুত্ব ও মূল্য বিচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আলোচনাগুলিতে সচেতনভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট সমালোচনা-পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হয় নাই। তবে কবির প্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া প্রত্যেক কবির রচনাকে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। এই কারণে আলোচনাগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে নীরস ও একঘেয়ে মনে হইবে। বিশেষ করিয়া কবির রচনার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় অল্প, এ আলোচনা পাঠে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

আলোচনায় দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা যথেষ্টই আছে এবং সে সম্বন্ধে আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন। একটি জটিল যুগের কাব্যালোচনা করিতে গিয়া পদে পদে নিজের অজ্ঞানতা ও অক্ষমতা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। তবে ইচ্ছাশক্তি ও অন্তঃপ্রেরণা

দ্বারা সমস্ত অক্ষমতার বাধা অপসারিত করিয়া কোনক্রমে আলোচনার পর্য্যায় সমাপ্ত করিতে পারিয়াছি। যে-সঙ্কল্প লইয়া এ যুগের কাব্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে সঙ্কল্প কবে পূর্ণ হইবে জানি না। তবে ইতিমধ্যে যে বইখানি প্রকাশিত হইতে পারিল, সেটি অগ্রিম লাভ।

আমার অধ্যাপক ও গবেষণা-নির্দ্দেশক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বইয়ের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার তুচ্ছ-নগণ্য রচনাগুলিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বরাবরই আমি তাঁহার স্নেহানুকূল্য পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে নানারূপ উপদেশ-পরামর্শ পাইয়াছি। ছাত্রাবস্থা হইতে তাঁহার সযত্ন তত্ত্বাবধান ও প্রেরণা আমাকে পাঠ-চর্চ্চায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। সংশয়-স্থলে তাঁহার নির্দ্দেশ না পাইলে আমার জীবনের ধারা ভিন্ন-রূপ হইত।

আমার অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছি। তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'এর দ্বিতীয় খণ্ডকে আমি ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি।

আমার অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই বইয়ের কয়েকটি আলোচনাও তিনি দেখিয়া দিয়াছেন।

বইখানি প্রকাশ ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য পাইয়াছি আমার অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের নিকট হইতে। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা না থাকিলে বইখানি প্রকাশিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। ইঁহারা সকলেই আমার পূজনীয় অধ্যাপক, ইঁহাদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া-ই এই আলোচনাগুলি সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

অধ্যাপক শ্রীশচীনন্দন সিংহ ও স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিজিতকুমার দত্ত নানাভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া এই বই-এর বহু দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিয়াছি।

অগ্রজপ্রতিম শুভার্থী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্নেহানুকূল্য না পাইলে আমার অধ্যয়ন-অনুশীলন সম্ভব হইত না। তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য।

শ্রদ্ধেয় শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহযোগিতায় এই বইয়ের বহু ত্রুটিপ্রমাদ সংশোধিত হইয়াছে। সশ্রদ্ধচিত্তে সে-কথা স্বীকার করি।

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

প্রস্তুত দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কারের কাজ যৎসামান্য। আসলে এটি দ্বিতীয় মুদ্রণ। যে-রচনার উদ্দেশ্য তথ্য পরিবেশন নয়, সাহিত্য বিশ্লেষণ, তেমন রচনাকে সংস্কৃত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় একটি—নূতন করিয়া লেখা। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব তাই বিকল্প উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সমস্ত রচনাটি অবিকৃতরূপে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। শ্রীযুক্ত বিজিতকুমার দত্ত ইতস্তত রং রিপু করিয়াছেন মাত্র। তবে আমার মূল বক্তব্য কোথাও পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর যাঁহারা আমার সমালোচনা রীতিকে নেতি-বাচক মনে করিয়াছিলেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির রচনা বিশ্লেষণে আমার নির্ম্মম ও অসহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাইয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

সমালোচকের কাছে প্রত্যেক কবির রচনার বিবিধ প্রকার গুরুত্ব; এক ঐতিহাসিক; দুই সাহিত্যিক; দুটি এক জিনিস নয়। চর্য্যাগীতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক দলিল, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন নয়। আমার আলোচনায় আমি কোন কবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব খর্ব্ব অথবা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি নাই। ইতিহাসে তাঁহাদের আসন পাকা এবং সেই কারণে তাঁহাদের রচনা আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমি ইতিহাসের সিংহাসনারূঢ় ছয় জন কবির রচনার সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিয়াছি; সে-বিচারে যদি প্রতিপন্ন হয় তাঁহাদের অধিকাংশেরই রচনা কাব্যাংশে তুচ্ছ তথাপি বলা চলে না বিচারে গলদ আছে, বিচাররীতি নেতিবাচক অথবা তাঁহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ভিত্তিহীন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
১১-১১-৫৯

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

॥ ১ ॥

ইহা অত্যন্ত সুখের কথা যে, উচ্চতর পরীক্ষার জন্য বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনার ফলে আমাদের তরুণ ছাত্র ও গবেষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন প্রণালীতে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রেরণা জাগিয়াছে। বিশেষত পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন আলোচনা-পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে উপাদানের অপ্রাচুর্য্য ও তথ্যগত অনিশ্চয়তা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পক্ষে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, সৌভাগ্যবশত আধুনিক সাহিত্য তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত। এখানে প্রয়োজন জীর্ণ পুঁথিপত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ নহে, বিচারবুদ্ধির স্থিরতা ও অনুভূতির গভীর-অনুপ্রবেশশীল মৌলিকতা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুনর্গঠন করিতে হইলে আধুনিক যুগের অধ্যায় হইতে সেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। অনতিপূর্ব্ব অতীত ও বর্ত্তমান সাহিত্য আস্বাদনের দ্বারা অনুশীলিত রসবোধ লইয়া মধ্যযুগের গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার মধ্যে সুস্পষ্ট পথরেখা আবিষ্কার অধিকতর সম্ভব হইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে গবেষণা-রত শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় এই পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্য-প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত হইতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রসারিত। আধুনিকতার সূত্রপাত হইতে উহার দৃঢ়প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত এই আলোচনার অঙ্গীভূত। এই যুগের কবিগোষ্ঠীর সহিত মোটামুটি আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। তাঁহাদের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও যুগবিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক বিষয়েও আমাদের ধারণা অনেকটা নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছে। তথাপি ইঁহাদের সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আলোচনা ও সামগ্রিক যুগ-পরিচয়ে ইঁহাদের স্থান নির্ণয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তারাপদ-র গ্রন্থে যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে ও কাব্য-বিচারের চরম মানদণ্ডে এই সমস্ত সুপরিচিত কবির পুনরালোচনা হইয়াছে। এ কার্য্য যে দুরূহ ও পরিণত-বিচারবুদ্ধি-সাপেক্ষ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগের কোন অনাবিষ্কৃত বা

॥ পাঁচ ॥

স্বল্পপরিচিত কবি সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। যতদিন কাব্যরচনা গোষ্ঠী-ভাব নিয়ন্ত্রিত, ততদিন গোষ্ঠী-পরিচয়েই কবির স্থান-নির্দ্দেশ সূচিত হয়। কিন্তু যে যুগে কবির ব্যক্তিসত্তা গোষ্ঠী-অন্তর্ভুক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশে উন্মুখ, সে যুগের কবি সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ সূক্ষ্মতর বিচারবুদ্ধি ও স্থিরতর রসবোধের উপর নির্ভরশীল।

আলোচ্য গ্রন্থে তরুণ গ্রন্থকারের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-রীতির সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের দ্বারা অনুশীলিত রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের কবিদের সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলি লেখক কোথাও নির্ব্বিচারে মানিয়া লন নাই—প্রত্যেকটিকে তীক্ষ্ণ মনীষা ও সতর্ক বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পুনঃ পরীক্ষা করিয়া তাহার গ্রহণীয়তা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কবির আলোচনায় এই স্বাধীনবুদ্ধির দীপ্তি অনুভব করা যায়। কবিগান বৈষ্ণব পদাবলীর রুচি-আদর্শের ক্রমাবরোহণশীলতার শেষ ধাপ, ভাটার টানে উদ্‌ঘাটিত শেষ পঙ্কস্তর, না ইহার কোন স্বতন্ত্র, মানবিক বা কাব্যিক মূল্য আছে, ঈশ্বর গুপ্ত যুগসমাপ্তির কবি না যুগসূচনার কবি, রঙ্গলালের কাব্যের যথার্থ ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কি, বিহারীলালের কবিতা কতটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ, কতটাই বা উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার পূর্ব্বাভাস—ইত্যাদি যে সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমরা মানসিক ঔদাস্য ও শিথিলতার জন্য পাশ কাটাইয়া যাইতে অভ্যস্ত, এই অতি প্রয়োজনীয়, অথচ অস্পষ্টতামণ্ডিত প্রশ্নগুলির সহিত লেখক মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরের সত্য রহস্যটিকে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়াছেন। সময় সময় মনে হয় যে লেখকের অনুসন্ধিৎসার তীব্রতা যেন তরুণসুলভ অত্যুৎসাহ চালিত হইয়া মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তরুণ লেখকের পক্ষে এই সাহসিকতা, লক্ষ্যভেদের এই দুর্জ্জয় সঙ্কল্প সত্যই প্রশংসনীয়।

॥ ২ ॥

এই যুগের তিনজন প্রধান কবি—মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—অতি বিস্তারিত আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। বিশেষত মধুসূদনের আলোচনায় লেখকের মনস্বিতা ও মৌলিক চিন্তাধারার প্রশংসনীয় নিদর্শন মিলে। মধুসূদন যুগের সমস্ত কবির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত কবি। তাঁহার কাব্যকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হইয়াছে। স্বর্গত প্রখ্যাত সমালোচক

॥ ছয় ॥

মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় মধুসূদন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা প্রামাণ্যরূপেই গৃহীত হইয়াছে। তথাপি এই বহু-প্রশংসিত, বহু-আলোচিত কবি সম্বন্ধেও তরুণ লেখক যে অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার ধীশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট। মোহিতবাবুর সমালোচনার একটি নিরূপণ —মধুসূদনের কাব্য বীররসপ্রধান না হইয়া করুণরসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও কবির অনভিপ্রেতভাবে—কিছুটা সংশয় ও প্রতিবাদ-স্পৃহার উদ্রেক করে এবং তারাপদ সাহসিকতার সহিত এই সংশয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। মোহিতবাবু বীর ও করুণরসের মধ্যে একটি স্বাভাবিক বিরোধ ও বৈপরীত্যের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং এই বিরোধের ভিত্তিতেই তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার মহাকাব্যে এই দুই আপাতবিরোধী ভাব একত্র-সন্নিবিষ্ট ও পরস্পরের পরিপূরক। বীরত্ব জিনিসটা শূন্যে আস্ফালন মাত্র নহে, একাধিক প্রতিযোদ্ধার পরাজয় ও হননের উপরই ইহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। করুণরসের অপরিহার্য্য স্ফুরণ ব্যতীত বীররসের অভিব্যক্তি অসম্ভব। মহাকাব্যীয় বীররস যেন শোক-পারাবারের মধ্যে অর্দ্ধ-নিমগ্ন, ইন্দ্র বজ্রাহত মৈনাক। ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী, অনন্তশয্যাশ্রয়ী নারায়ণের মতন ইহার অঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নিঃসৃত; মৃত্যুর ঝটিকা-বিধ্বস্ত, অশ্রুপ্লাবিত আকাশে ইহার বিদ্যুৎ-স্ফূরণ। স্তরাং মহাকাব্যে শোক-বিয়োগবেদনা প্রভৃতি স্নকুমার বৃত্তিগুলিকে অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগে বিতাড়িত করিবার উপায় নাই। লৌহবর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কোমল, বেপথুমান হৃদয়, অস্ত্র-ঝনৎকারের সঙ্গে অলঙ্কার-শিঞ্জিত, নির্ম্মম অনমনীয় সঙ্কল্পের সঙ্গে করুণ, অশ্রুসিক্ত বিলাপ—মহাকাব্যের উদার প্রাঙ্গণে ইহারা সদাবিচরণশীল, নিত্যসহচর। সকল মহাকাব্যেই 'শোকের ঝড়' বহিয়া যায়; ইহার পরিসমাপ্তিতে 'বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে' শোক-স্তম্ভিত বীরবৃন্দ শিবিরে ফিরিয়া আইসে। স্নতরাং বীর ও করুণরসের অঙ্গাঙ্গি সমন্বয়েই মহাকাব্যের ভাব-সংশ্লেষ গঠিত হয়। রণাঙ্গনের শবাকীর্ণ বীভৎসতার মধ্যে ব্যথাদীর্ণ অন্তরের শোকোচ্ছ্বাস স্মৃতিদীপহস্তে হারানো প্রিয়জনকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

এখানে একমাত্র প্রশ্ন, এই অবশ্যম্ভাবী শোকের মাত্রা ও অভিব্যক্তির রীতি বিষয়ক। হোমারের মহাকাব্যে হেক্টর যখন তাহার প্রিয়তমার নিকট শেষ বিদায় লয়, বা বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম হতপুত্রের শবদেহের জন্য পুত্রহন্তা একিলিসের জানুস্পর্শ করিয়া করুণ আবেদন জানায়, তখন কি আমরা এক-মুহূর্ত্তে যুদ্ধের নৃশংসতা ও বীরধর্ম্মের বজ্রকঠোর আদর্শের কথা ভুলিয়া গিয়া

॥ সাত ॥

অসহায় মানবের দৈবনির্য্যাতিত দুর্ভাগ্যের জন্য করুণ সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠি না? এই করুণ রসের জন্য বীররস ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং এই অশ্রুধৌত, বেদনা-শোধিত বীরত্ব আরও উজ্জ্বল ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে, বর্ষাজলভরা মেঘের সান্নিধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গ আরও উত্তুঙ্গ ও মহিমান্বিত দেখায়। ভার্জিল ও মিলটনের মহাকাব্যে করুণরসের ততটা অবকাশ নাই; কেননা ইহাদের মধ্যে প্রথমটির বিষয় সাম্রাজ্য সংস্থাপন ও দ্বিতীয়টির বিষয় ধর্ম্মতত্ত্ব। রামায়ণ-মহাভারত ও মধুসূদনের মহাকাব্যে আবার পারিবারিক জীবনের প্রাধান্য—স্নেহমায়ামমতার মন্থনের বীররসের ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি। অবশ্য হোমারের শোক ও মধুসূদনের শোকের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। সমাজবিন্যাসের আদিম যুগের আকস্মিক মৃত্যু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল—বহুলোকের মৃত্যুবরণই গোষ্ঠী-জীবনে অক্ষুণ্ণ অস্তিত্বের অপরিহার্য্য সর্ত্ত ছিল। সুতরাং সে যুগের কাব্যে শোক-প্রকাশের মধ্যে একটা সহজ ক্ষণিক দুঃখানুভূতি, একটা সংযত, বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য-প্রধান সুররূপে ধ্বনিত হইত। কোন গভীরতর অনুরণন, বিশেষ শিল্পরীতি প্রয়োগে ইহাকে আরও তীব্র ও মর্ম্মভেদী করার প্রয়াস, ইহার করুণরসকে ব্যঞ্জনা ও কল্পনা-রোমন্থনের সাহায্যে, সূক্ষ্মতা ও অন্তর্মুখী, নীরন্ধ্র ব্যাপকতা দিবার চেষ্টা ইহাদের রচনায় দেখা যায় না। যে অশ্রুপ্রবাহ ক্ষীণ নির্ঝররূপে মানব অস্তিত্বের আদিম যুগ হইতে বহিতে শুরু করিয়াছে তাহাই যুগে যুগে নূতন নূতন ধারার সংযোজনে ক্রমশ স্ফীতকায় ও উদ্বেল হইয়া ক্রমবর্দ্ধমান গতিবেগে ও তরঙ্গকল্লোলে আধুনিক যুগের দুঃখ-সমুদ্রের মোহানার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। উদ্ভবমুহূর্ত্তে ইহার যে যাত্রাপথ প্রায় সমতলভূমির সঙ্গে একই স্তরের ছিল, তাহা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর প্রণালী খনন করিয়া আজ প্রায় অতলস্পর্শ খাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে। আজ মানবনেত্রক্ষরিত একটি অশ্রুবিন্দুতে সপ্তসিন্ধুর লবণস্বাদ ও পাতালস্পর্শী অপরিমেয়তা সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও পার্থক্যের আরও নিগূঢ় কারণ আছে। হোমার বা বাল্মীকির শোকগাথায় কবির নিজ মানস-স্পর্শ কতটা ছিল তাহা বলা শক্ত। ইহা বড় জোর কবির উদার সমবেদনা-প্রসূত, কিন্তু কবি-চিত্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহার মধ্যে জটিল তন্তু বয়ন করে নাই। রাম-সীতার দুঃখের মধ্যে বাল্মীকির নিজের দুঃখ, প্রিয়ামের করুণ মিনতির মধ্যে হোমারের ব্যক্তিগত বেদনা আমরা শুনিতে পাই না। কিন্তু মেঘনাদবধের বিলাপের মধ্যে মধুসূদনের জীবন-বেদনা, বঞ্চিত, ব্যর্থ আশার রুদ্ধ রোদনাবেগ, বিশ্ব-বিধানের প্রতি সার্ব্বভৌম

ক্ষোভ ও বিদ্রোহের রেশটি স্পষ্ট শোনা যায়। যে কবি আত্মবিলাপে আশায় ছলনার নিদারুণ আঘাতের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহারই প্রচ্ছন্ন অশ্রু, শোক-কম্পিত কণ্ঠস্বর, তাঁহারই ভাগ্যহত জীবনের বিষণ্ণ বিড়ম্বনাবোধ চিত্রাঙ্গদা-রাবণের খেদোক্তির ভিতর নিজ ছদ্মপ্রকাশের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইহা মধুসূদনের দোষ নহে, আধুনিক কালেরই অনিবার্য্য পরিণতি। আধুনিক কবি যে মন লইয়া কাব্য লেখেন তাহা প্রাচীন কবির মনের সহিত ঠিক সমধর্ম্মী নয়। এ যুগের আকাশ-বাতাসই যে বেদনার করুণ গুঞ্জনে মুখর; শতেক যুগের কবিদল, অতীত বংশ-পরম্পরায় শোকাবহ অভিজ্ঞতা, জটিল আত্মদ্বন্দ্ব-পীড়িত, সংশয়ক্ষুদ্ধ চিত্তের অন্তর্গূঢ় অস্বস্তি ও অকারণ ক্ষোভ যে কবির শোকানুভূতিকে আবিষ্ট করিয়াছে—এই যুগ-যুগ-সঞ্চিত মানস উত্তরাধিকার হইতে কবির নিষ্কৃতি কোথায়? কাজেই মহাকাব্যের সমুদ্রগর্জ্জনের মধ্যে যদিই বা কপোতাক্ষ নদের শান্ত বিষণ্ণ কুলু কুলু ধ্বনি শ্রুত হয়, তাহা মধুসূদনের মহাকাব্য-রচয়িতার মনের অনিবার্য্য অভিব্যক্তিরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

মধুসূদনের সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহারই মন ছিল সর্ব্বাপেক্ষা আবেগধর্ম্মী ও আত্মপ্রকাশপ্রবণ। কাজেই তাঁহার রচনায় মহাকাব্যের নৈর্ব্যক্তিকতা যে বিশেষ করিয়া ব্যক্তিমানসের রঙে অনুরঞ্জিত হইবে আত্মপ্রকাশের আবেগে দোলায়িত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? মধুসূদনের ব্যক্তিমানস ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যও করুণরসপ্রসারের অনুকূল ছিল। বাংলা কাব্য তাহার জন্ম হইতেই শোকসাধনা করিয়া আসিতেছে। তাহার প্রতি পত্রের মর্ম্মরধ্বনি হইতে করুণ সুরের মূর্চ্ছনা উত্থিত হইতেছে। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য তো এই গভীর হৃদয়-আর্ত্তির দীর্ঘশ্বাসে প্রতিধ্বনিময়। চৈতন্যদেব তো অবিরল অশ্রুনিষেকে জাতির চিত্তকে বর্ষণোন্মুখ নবনীরদমালার ন্যায় রোদনাতুর করিয়া তুলিয়াছেন। সমস্ত বাংলা কাব্য কালিদাসের শোকবিহ্বলা মদনপ্রিয়ার ন্যায়—

"বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা।"

কাজেই মধুসূদনের মহাকাব্যে যে করুণরস বীররসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে, বীরত্বব্যঞ্জক উক্তি ও আচরণের মধ্যে অন্তরশায়ী বেদনার ফল্গুধারা বহিয়া যাইবে, শক্তিমত্তা ও দম্ভের পারুষ্য যে কারুণ্যের ব্যঞ্জনায় স্নিগ্ধ-কোমল হইবে ইহা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। প্রশ্ন এই হওয়া উচিত যে মধুসূদন

॥ নয় ॥

কি কোথাও করুণরস প্রকাশে মহাকাব্যোচিত সংযম ও মর্য্যাদাবোধের সামা অতিক্রম করিয়াছেন? তাহা না করিয়া থাকিলে তাঁহার মহাকাব্যের ভাবাবহ সৃষ্টিক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। তাঁহার বীরের গণ্ড বাহিয়া দুই-এক ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া পড়ে, তাঁহার মাতৃহৃদয়েব শোকোচ্ছ্বাসে নারীসুলভ উচ্চ রোদনধ্বনির মধ্যে রাজকর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য অনুযোগ, শাশ্বত নীতি লঙ্ঘনের জন্য তিরস্কার শোনা যায়। কোথাও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অযথা প্রশ্রয় ও অনুচিত প্রসার নাই। চিতাশয্যাশায়িত পুত্র-পুত্রবধূব সম্মুখে রাবণের খেদোক্তি বাঙ্গালী মায়ের হাহাকারে ফাটিয়া পড়া, আত্মসংবরণে অনিচ্ছুক ভাবাতিশয্য নয়, আগ্নেয়-গিরির প্রতিরোধ-বিদারী অগ্ন্যুৎক্ষেপ, অসহ্য চিত্তদাহের প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে কয়েকটি স্ফুলিঙ্গের অদম্য বহিঃনিষ্ক্রমণ।

মধুসূদনের মহাকাব্য সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণের পূর্ব্বে যুগধর্ম্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। বর্ত্তমান সময়ে বীরত্ব নৈর্ব্যক্তিকতায় ম্লান ও কারুণ্য আত্যন্তিক অনুশীলনে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বতন যুগের গৌরবরশ্মি আর বীরমুকুটকে বেষ্টন করিয়া নাই—ইহার প্রকাশভঙ্গীব মধ্যে নাটকীয় উজ্জ্বলতা আজ অনেকটা স্তিমিত। অধুনাতনকালে বীর শিবিরের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। রণক্ষেত্রের অনাবৃত মহিমায় তাঁহার আত্মপ্রকাশের পথ অবরুদ্ধ। সময় সময় তিনি আবার আত্মগোপন করিয়া গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের সাধারণ ভূমিতে নামিয়া আসেন, লোকে তাঁহাকে সহজে চিনিতেই পারে না। পক্ষান্তরে করুণ রস আজ উহার ভূগর্ভস্থ অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত জীবনকে প্লাবিত করিয়াছে। আজ ভূগোলের অনুবর্ত্তনে মানবের মানস সংস্থিতিতে এক ভাগ বীরত্বের শুষ্ক ভূমি, আর তিন ভাগ কারুণ্য-রস-প্রবাহের বিশাল সমুদ্র। যাহা অতিমাত্রায় প্রকট ছিল তাহা এখন প্রায় অপ্রকট হইয়াছে; আর যাহা অন্তঃরুদ্ধ ছিল তাহা আজ সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া বিপুল জলকল্লোলে, সীমাহীন বিস্তারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজ এই প্রত্যক্ষ সত্যকে কে অস্বীকার করিবে? আজ বীররসের বর্ণনায় করুণরসের গভীর অনুপ্রবেশ কোন্ যুগচেতনাসম্পন্ন কবি ঠেকাইয়া রাখিবেন? আজ হিমালয় কুহেলিকার আবরণে অস্পষ্টভাবে অর্দ্ধপ্রকাশিত; আর হিমালয়ের পাদদেশনিঃসৃত জাহ্নবী-ধারা সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাণধারারূপে প্রবহমাণ। তাই 'গাইব মা বীররসে ভাসি' বলিয়াও মধুসূদন "নেত্রজলে তিতিয়াছেন"। ইহা প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অপরাধ নয়, অভ্রান্ত কবি-সংস্কার-প্রবর্ত্তিত যুগোচিত রূপান্তরসাধন।

॥ ৩ ॥

রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্য আলোচনায় লেখক অনুরূপ স্বাধীনচিত্ততার ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষত বৃত্র-সংহার সম্বন্ধে তিনি অতি নির্ম্মম ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহার কাব্যোৎকর্ষের দাবীকে একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড ও ধূলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিচার কাব্যাদর্শের দিক দিয়া যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মনে হয় যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের দিক দিয়া ইহাদের যে মূল্য তাহা যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃত হয় নাই। লেখক রঙ্গলালের বিচারপ্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত কবির মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সমালোচকের যে কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা theory-র দিক দিয়া সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু অস্ত্রাঘাতের অত্যুৎসাহ এই উদার নীতির বাস্তব প্রয়োগকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—লেখক নিজের নীতিনির্দ্দেশ নিজেই অনুসরণ করেন নাই। বস্তুত সাহিত্যবিচারে যেমন একটা absolute মূল্যপরীক্ষা আছে, তেমনি একটা ঐতিহাসিক স্থান-নির্ণয়ও আছে। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি কবিত্বশক্তিতে অপেক্ষাকৃত হীন হইয়াও ইতিহাসের বাহন ও নূতন কাব্যচেতনার প্রবর্ত্তকরূপে সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানিত আসন গ্রহণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরাজী সাহিত্যে Cowper, Crabbe প্রভৃতি যুগসন্ধিক্ষণের কবির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের কাব্যধারা ক্ষীণ স্তিমিত প্রবাহে, কোথাও বা সরল, অকৃত্রিম অথচ সাধারণ অনুভূতির পাল খাটাইয়া, কোথাও বা অতিরূঢ় বাস্তবতার চড়া ঠেলিয়া যুগান্তরের অলক্ষিত সম্ভাবনাপূর্ণ পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইঁহাদের বিচারে যদি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর উন্নততম মান অনুসৃত হয়, তবে সাহিত্যবিচার ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচারের বীভৎস আকার ধারণ করিবে। এই জাতীয় সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পূর্ব্বাভাসের আবিষ্কার। ইঁহাদের দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা লইয়া পাতার পর পাতা পূর্ণ করা যায়। ইঁহাদের প্রতি উপর্য্যুপরি আঘাত-পরম্পরা হানিয়া অস্ত্রপরীক্ষায় উত্তরণ ও লক্ষ্যভেদের তৃপ্তি অনুভব করা যায়। কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে এই অসামঞ্জস্য, ক্ষুদ্র শিকারে গুলি-বারুদের অযথা অপব্যয় যে পরিমিতি ও ঔচিত্যবোধের কিছুটা অভাব সূচিত করে ইহাও সত্য।

রঙ্গলালের প্রকৃত কৃতিত্ব হইল যে তিনি সর্ব্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বীর যুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। এই দ্বার খুলিতে গিয়া তিনি কোদালি, শাবল প্রভৃতি স্থূলজাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বারদেশে কপাটের উপর

ক্ষোদিত সূক্ষ্ম কারুকার্যের উপর ভোঁতা অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন; কাঁচা রঙের স্থূল প্রলেপের দ্বারা তুলির মোটা টানে কতকগুলি বীরত্বের রঙচঙে পুতুল সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা জয়ঢাকের পরিবর্ত্তে আম-আঁঠির ভেঁপু বাজাইয়া রণসঙ্গীতের কৃত্রিম উন্মাদনার সুর তুলিয়াছেন; বীর-দর্পের সহিত কান্না মিশাইয়া এক অদ্ভুত সঙ্করজাতীয় বীরভাষণের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইহা সবই সত্য; তথাপি রঙ্গলাল যে যুগসন্ধিক্ষণের কবি, তিনি যে বাংলা কাব্যের এক নূতন মোড় ফিরাইয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। রাজপুতানার শৌর্য্যবীর্য্যমণ্ডিত ইতিহাস-কাহিনীর প্রতি গতানুগতিকতা-ক্লিষ্ট, ভক্তি-রোমন্থনস্তিমিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বঙ্গসরস্বতীর বীণায় নূতন তার সংযোজন করিয়াই তিনি ইতিহাসে চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়াছেন। খনির তিমিরগর্ভ হইতে হয়ত তিনি মণি উত্তোলন করিতে পারেন নাই, নূতন তার বাজাইবার পূর্ণ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন নাই—তথাপি প্রথম আবিষ্কারের গৌরব তাঁহার প্রাপ্য। শঙ্খের কন্দরে প্রথম ফুৎকার-বায়ু প্রেরণের ফলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহা প্রায়ই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হয়; কিন্তু বায়ুপ্রবাহ স্থিরতর ও ফুৎকার-কৌশল আয়ত্ত হইলে সেই অর্দ্ধস্ফুট শব্দ-ভ্রূণ মধুর ও গম্ভীরনাদী হইয়া উঠে। রঙ্গলালের কৃত্রিম বীরত্ব মধুসূদনের সত্যকার বীররসস্ফুরণের অগ্রদূত ও উদ্বোধক। বাংলা সাহিত্যে বীরযুগের ক্ষণস্থায়িত্বের ফলে রঙ্গলাল-প্রবর্ত্তিত ধারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করে নাই; তাঁহার কাব্যে যে সত্যকার উৎকর্ষ-সম্ভাবনা ছিল তাহাও পরিণত রূপে বিকশিত হয় নাই। তাঁহার গাঢ়বদ্ধ অর্থ-গৌরবভূয়িষ্ঠ পয়ার-গ্রন্থন, তাঁহার প্রকৃতি অঙ্কনের চিত্রল-তা (picturesqueness), প্রাচীন ভূগোল ও ইতিহাসের সূত্র অবলম্বনে দেশের ঐশ্বর্য্যময় ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপায়ণ, তাঁহার নীতিমূলক কবিতার সরল ও অকৃত্রিম ভাব-সংস্থাপন—এগুলির প্রতি আমরা এক প্রকারের উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কিন্তু ইহাদের অভাব আমাদের কাব্যকে যে অতিমাত্রায় ভাববিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ করিয়াছে তাহা বুঝিতে চাহি না। রঙ্গলালকে তুলনা করিতে হইবে রোম্যান্টিক আখ্যায়িকার স্রষ্টা স্কট ও বায়রনের ও আধুনিক যুগের মেসফিল্ডের সঙ্গে। ইহাদের কাহারও কাব্যশিল্প অনবদ্য নহে, অথচ আখ্যান কৌতূহলের জন্য ইহাদের অমার্জ্জিত রীতি ক্ষমার্হ ও উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

॥ বারো ॥

॥ ৪ ॥

হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার সম্বন্ধেও লেখক যে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও তাঁহার মনীষা ও তীক্ষ্ণ সাহিত্য বিচারের নিদর্শন। প্রত্যেকটিই মর্ম্মান্তিক রূপে সত্য। যে কবি সম্বন্ধে এত বিরূপ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়, মনে হয় যেন তাঁহাকে আলোচনার বাহিরে রাখাই ভাল। শুধু প্রমাদ-তালিকা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া কাহারও কোন লাভ নাই। সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় যে হেমচন্দ্রের সমস্ত কাব্যসাধনা যেন প্রাংশুলভ্য ফলে বামনের উদ্বাহুতার মত নিছক একটা মূঢ়, অক্ষম উচ্চাকাঙ্ক্ষার পর্য্যায়ভুক্ত। অথচ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে তাঁহার রচনা উচ্চ কাব্যগুণের অধিকারী। প্রশান্তগম্ভীর রসসৃষ্টিতে তাঁহার নৈপুণ্য অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার কাব্যে দোষ-গুণের, শক্তি-দুর্ব্বলতার এমন অস্বাভাবিক সমন্বয় কেমন করিয়া সম্ভব হইল? মনে হয় যে ইহা কবিকে অযথার্থ দৃষ্টিকোণ হইতে দেখারই ফল। এককালে হেমচন্দ্রকে মধুসূদনের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠতর প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস হইয়াছিল। কালচক্রের আবর্ত্তনে এই কৃত্রিম সম্মানের আরোপ ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার হেতু হইয়াছে। যাঁহাকে এক সময় আকাশে তোলা হইয়াছিল—কোন কোন সমালোচনায় হেমচন্দ্রকে নভোলোকের কবি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—আজ রুচির পরিবর্ত্তনে তাঁহাকে রসাতলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আসল কথা এই যে হেমচন্দ্র আকাশেরও কবি নহেন, পাতালেরও অধম কবিযশঃপ্রার্থী নহেন, তিনি মধ্য-লোকের, এই স্থূল ও স্থির পৃথিবীর কবি। তিনি রাজমুকুটের দাবীদার নন, কণ্টক-মুকুটও তাঁহার শিরোদেশে ঘটা করিয়া পরানোর প্রয়োজন নাই।

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই কথাটাই সত্য যে তিনি কোনদিন মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হন নাই, বা মহাকাব্যের আদর্শকে গ্রহণ করেন নাই। বৃত্র-সংহার মেঘনাদ-বধের মত এক অখণ্ড রসের অভিব্যক্তি, এক সুসংযত ভাব-কল্পনার বিকাশ, এক আদ্য-মধ্য-অন্ত সম্বলিত অনবদ্য গঠন-সুষমার নিদর্শন নহে। ইহার ঘটনা-বিন্যাসের অন্তরালে কোন নবানুভূত সাংকেতিক তাৎপর্য্য, কোন তীব্র, একমুখীন হৃদয়াবেগ গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে নাই। ইহার তথ্য-সমাবেশ কোন নবারুণদ্যুতির আভাসে ভাস্বর হইয়া উঠে নাই। ইহার ধনুকের ছিলা এত টান করিয়া বাঁধা হয় নাই যে ইহার জ্যানির্ঘোষ-টঙ্কার শরক্ষেপের পূর্ব্বেই

গতিবেগ ও অভ্রান্ত লক্ষ্যের পূর্ব্বঘোষণারূপে আমাদের অনুভূতিকে বিদ্ধ করে। বৃত্র-সংহার মহাকাব্যের বাহ্যলক্ষণ-সমন্বিত পৌরাণিক কাহিনী-কাব্য—ইহার ঘটনাবলী শিথিল আকস্মিকতা-সূত্রে গ্রথিত। যাহা ঘটিয়াছে তাহারই একটু সমুন্নত কাব্যরূপ দিয়াই ইহা সন্তুষ্ট, কোন নূতন তাৎপর্য্য আরোপ, কোন সার্ব্বভৌম ব্যঞ্জনার আভাস ইহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। ইহার অন্তর্নিহিত নীতিকথাটি অত্যন্ত পুরাতন—নারীর লাঞ্ছনায় দেবরোষ-উদ্দীপন ও দেবানুগ্রহ-প্রত্যাহার। দেবতার স্বর্গোদ্ধার ও অসুরের আধিপত্য-রক্ষা—এ উভয়ই এক স্তরের জৈব কামনা হইতে উদ্ভূত। যুধ্যমান উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ কোন আদর্শ তারতম্য বা পাঠকের সহানুভূতির কোন ইতর-বিশেষ নাই। মধুসূদনের ইন্দ্রজিতের মত হেমচন্দ্রের কোন favourite বা প্রিয়পাত্র নাই—ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে মধুসূদন যে অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ('cost me many a tear'), রুদ্রপীড-নিধনে হেমচন্দ্রের অনুরূপ কোন শোকোচ্ছ্বাসের পরিচয় মিলে না। মধুসূদনের বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও গভীর রহস্যময় নিয়তি-বিধান হেমচন্দ্রের দৈবের প্রতি দুর্ব্বল নির্ভরশীলতা ও ভাগ্যের খামখেয়ালি পরিবর্ত্তনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পুরাণ-কাহিনীর চরিত্র-সংস্রবহীন, দৈবপ্রধান আকস্মিকতা, সাধারণ নীতিবাদের মৃদু আকর্ষণ-নিয়ন্ত্রিত জীবন-ধারা আধুনিক কাব্যের রীতি-সমুন্নতি ও কল্পনা-প্রসারের ছদ্মগৌরবমণ্ডিত হইয়া যুগ-রুচির নিকট ইহার শঙ্কিত আবেদন জানাইয়াছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বৃত্র-সংহারের বিচার করিলে ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি আর ততটা ভয়াবহ বলিয়া মনে হইবে না। যাহা মনে হইতেছিল আদর্শচ্যুতির স্খলন, তাহা প্রকৃতপক্ষে নিম্নগামী অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন। বৃত্র-সংহারের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে বৃত্রের চরম সৌভাগ্যের ক্ষণে, তাহার মেদস্ফীত আত্মতৃপ্তির স্থূল পরিণতির মুহূর্ত্তে। পুরাণে তো স্বর্গরাজ্য উপভোগের ইন্দ্রালয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং হেমচন্দ্রের স্বর্গ নিছক পৌরাণিক আদর্শেই পরিকল্পিত। রাবণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ভূমিকম্পের মধ্যে, তাহার তপঃক্লিষ্ট, শোকানলদগ্ধ চরিত্র-মহিমার জ্যোতির্ম্ময়তায়। লঙ্কার ঐশ্বর্য্য-দীপ্তির উপর আসন্ন সর্ব্বনাশের পাণ্ডুর ছায়া পড়িয়াছে। তাহার মণিময় স্তম্ভের স্ফটিকপ্রভা যেন শোকাবহ পরিণতির পূর্ব্বাভাসে ম্লান হইয়া আমাদের সম্মুখে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া আছে, রাবণের রাজসভার মণিমুক্তা-খচিত শিল্পসৌন্দর্য্য যেন মৃতের সমাধি-মন্দিরের ছদ্মাবরণ মাত্র। রাবণের প্রতিটি উক্তি ও অঙ্গ-ভঙ্গী, প্রত্যেক আচরণ যেন

॥ চৌদ্দ ॥

অন্তরাত্মার অবারিত আলোকচ্ছটায় ভাস্বর। পক্ষান্তরে বৃত্রের স্বর্গ স্থূল বস্তুপুঞ্জে, ভোগবিলাসের উপকরণ-প্রাচুর্য্যে ভারাক্রান্ত, আত্মতৃপ্তি ও দম্ভের নিঃশ্বাসবায়ুতে আবিল। সুতরাং বৃত্র ও রাবণ, তাহাদের অবস্থা-সাম্য সত্ত্বেও একজাতীয় নহে। রাবণের আত্মিক জ্যোতির ক্ষীণতম স্পর্শও বৃত্রে দৃষ্ট হয় না।

তারপর পতনের কারণও উভয়ের বিভিন্ন। রাবণের পাপের বীজ দীর্ঘ অপেক্ষার পর অঙ্কুরিত ও শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যু ফল-পরিণতির প্রথম নিদর্শন, ইন্দ্রজিতের পতনে ইহার তিক্ত রস পরিপূর্ণভাবে প্রকট। ইহার পর রাবণের মৃত্যু যেন anticlimax বা চরম পরিণতি হইতে অবরোহণ বলিয়াই মনে হয়—এ যেন শাখাপত্র-বর্জ্জিত শুষ্ক কাণ্ডের অগ্নিদাহের জন্য উদাস প্রতীক্ষা। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই কবি যেন কাব্যের সমস্ত সম্ভাবনা, নিয়তি-নির্য্যাতনের সমস্ত দুজ্ঞের্য় দুর্ব্বিষহতা নিঃশেষ করিয়া দিয়াছেন—রাবণের জীবন্মৃত্যু, তাহার অন্তর-প্রজ্বলিত শোকানল যেন তাহার মৃত্যু অপেক্ষা আরও মর্ম্মন্তুদ। রাবণের শেষ দৃশ্য আমরা কবির সাহায্য ব্যতিরেকে কল্পনাতেই প্রত্যক্ষ করি—তিনি আমাদের কানে যে সুর ঢালিয়াছেন তাহার দীর্ঘায়িত অনুরণনের মধ্যেই রাবণের দৈবাহত জীবনের পরিসমাপ্তি প্রচ্ছন্নভাবে বাজিতে থাকে। 'মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে'—লক্ষ্মণের এই নিয়তি-রহস্যদ্যোতক উক্তিটি যেন মহাকাব্যের সমস্ত বায়ুমণ্ডলে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।

বৃত্রের পাপ ও শাস্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রথমত তাহার শাস্তি তাহার পাপের হাতে হাতে, অব্যবহিত পরে আসিয়াছে। সুতরাং পাপ ও শাস্তির মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যবধানে নিয়তির অলক্ষ্য, গোপনচারী ক্রিয়া যে ঘন রহস্যবোধের, যে সংশয়-কণ্টকিত অনিশ্চয়ের উদ্রেক করে এখানে তাহার একান্ত অভাব। বৃত্রের শাস্তি যেন অঙ্কের যোগফলের মত সুনির্দ্দিষ্ট, এখানে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কোন অননুমেয় শক্তির রহস্যলীলা, কোন বহুগুণিত প্রতিক্রিয়ার দুর্ব্বোধ্যতা অনুভব করা যায় না। এখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে সর্ব্বধ্বংসী বহ্নি-বিস্তারের আভাস মিলে না। এ শাস্তি বৃত্রের সহিত পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, কেবল ঐন্দ্রিলাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দিগ্-বিদিকে ঘুরাইয়াছে। রাবণ-মন্দোদরী-চিত্রাঙ্গদা বা ইন্দ্রজিত-প্রমীলার সুখে-দুঃখে, জীবনে-মরণে সুনিবিড়, অচ্ছেদ্য ঐক্যের পরিবর্ত্তে আমরা পাই ঐন্দ্রিলার পরিবারের বাঁধন-কাটা স্বাতন্ত্র্য। ঐন্দ্রিলা স্পর্ধায় ও আত্মগৌরবলোলুপতায় যেমন পারিবারিক

সামঞ্জস্যকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তেমনি পরিণামেও সে নিঃসঙ্গ বেদনার উন্মাদ ঘূর্ণিবাত্যায় আবর্ত্তিত হইয়াছে।

বৃত্রের অপরাধের স্থূলতাটিও স্বপ্রকাশ। রাবণের সীতাহরণ ও বৃত্রের শচীহরণ নারী-নির্য্যাতনের দিক দিয়া এক, কিন্তু উদ্দেশ্য-প্রেরণার দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শচীহরণের উদ্দেশ্য নিছক ঈর্ষা ও আধিপত্যগর্ব্ব; সীতাহরণ হয় রাজনৈতিক প্রতিশোধ না হয় রূপমোহের পর্য্যায়ভুক্ত। পৌরাণিকযুগে নারীহরণ রাজধর্ম্ম-বিরোধী ছিল না—বসুন্ধরা ও রূপসী নারী উভয়েই বীরের ভোগ্যা ছিল। রাক্ষসসমাজপ্রচলিত নীতি-বোধ রাবণের এই অপকর্ম্মকে ক্ষাত্রশৌর্য্যের একটু অসাধারণ, উদ্ভট বিকাশরূপেই দেখিয়াছিল। হেলেন-অপহরণে ট্রয়বাসীর মাথা স্কন্ধচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু হেঁট হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীর একটা খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য নিঃসহায়া নারীর বিরুদ্ধে অভিযান দৈত্যকুলের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করে নাই। বৃত্রের শচীহরণ নিছক স্ত্রৈণতা হইতে উদ্ভূত, ইহার মধ্যে শক্তিমত্তার কোন পরিচয় নাই। কাজেই উভয় ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া যে ভাব-পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে, কবি-কল্পনার যে গতিপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক। মেঘনাদ-বধের ভাবগভীরতা ও কবি-কল্পনা ও পাঠক-চিত্তের প্রগাঢ় আলোড়ন আমরা বৃত্র-সংহারে আশা করিতে পারি না।

॥ ৫ ॥

হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিতে চাহেন নাই, কাজেই মহাকাব্যের উপযোগী এক অখণ্ড ভাবমণ্ডল রচনা করাও তাঁহার পরিকল্পনায় ছিল না। ইহা অক্ষমতা-প্রসূত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে কবির বিষয়-নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা আছে, সেখানে অক্ষমতার উপরই বেশী জোর দেওয়া সমীচীন নহে। তিনি আখ্যায়িকা-কাব্যের প্রথা অনুযায়ী নানা ছন্দোবৈচিত্র্যের মাধ্যমে নূতন নূতন রস উদ্বোধন করিয়াছেন। কোথাও গীতি-কবিতার উচ্ছ্বাস, কোথাও বিবৃতির নিরুত্তাপ, সমতলীয় তথ্যনিষ্ঠা, কোথাও দার্শনিক তত্ত্ববিচার, কোথাও বা উদাত্ত গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ভাব ও পরিবেশ-রচনা—লেখক নির্ব্বিচারে এই প্রতিটি ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। সব মিলিয়া একটা ঐকতান বাদ্যের সৃষ্টি হইবে ইহাই ছিল তাঁহার আশা ও ধারণা। এই যোজনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে যদি কোন অসঙ্গতি থাকে কবি নিশ্চয়ই তাহার জন্য নিন্দনীয়। কিন্তু ইহা মহাকাব্যের

আদর্শানুযায়ী নহে বলিয়া তিনি অভিযুক্ত হইতে পারেন না। হেমচন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনা পরিবেশ-গাম্ভীর্য্য সৃষ্টির জন্য নহে, যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ও রণকৌশলের আনন্দ-উত্তেজনা অনুভবের জন্য। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনা কোন ভয়াবহ সঙ্কেত বহন করে না, বা কোন ভাব-সমুন্নতির উদ্বোধক নহে—নিছক মারামারি-কাটাকাটির আনন্দ দেয়। হেমচন্দ্র আর একটু উন্নত প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধের সাধারণ উত্তেজনাকে উপমাপ্রয়োগে, আবেগ-সঞ্চারে ও ছন্দোক্রতির সাহায্যে একটু অসাধারণ কাব্যিক পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধুসূদনের যুদ্ধ ভাব-গৌরব সৃষ্টির উপায় মাত্র; ইহার ছন্দের ভেরী-নিনাদ ও শব্দের শঙ্খধ্বনি আমাদের কল্পনাকে স্ফীত করিয়া মহাকাব্যের আবহ রচনা করে। হেমচন্দ্রের যুদ্ধ ঘটনাবহুল ও ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল—ইহা কোন বিশেষ ভাবের পরিপোষক নহে। কাব্যে উভয় প্রকার যুদ্ধবর্ণনারই স্থান আছে।

মধুসূদনের দেব-চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে হেমচন্দ্রের অনুরূপ প্রচেষ্টার রুচি ও কাব্য-গত প্রভেদ আছে। মধুসূদনের দেব-দেবী মানবিক প্রাণসত্তায় পূর্ণ, জীবনের বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহাদের শিরা-ধমনীতে দ্রুতসঞ্চারশীল; দেবোচিত চরিত্র-মহিমা ও উন্নত ভাবাদর্শ তাহাদের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় নহে। তাহাদের বর্ণোজ্জ্বলতা ও চিত্রসৌন্দর্য্যই আমাদিগকে প্রধানভাবে আকৃষ্ট করে। তাহাদের চারিদিকে যে একটা ক্ষীণ ভক্তিরসের পরিমণ্ডল রচনার চেষ্টা হইয়াছে তাহা মুখ্যত তাহাদের শক্তিমত্তার স্বীকৃতি, তাহাদের ভাব-গরিমার প্রতি প্রণতিজ্ঞাপন নহে। এখানে মধুসূদন প্রধানত হোমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন; প্রাচীনতার বৈদিক দেবতার সহিত আদি মানবের যে ভক্তি ও হৃদ্যতা-প্রীতিমিশ্রিত সম্পর্ক ছিল এখানে যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখি। মধুসূদনের হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বের দার্শনিক দিকটা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল না—তাঁহার প্রেত-লোকের বর্ণনা কেবল চিত্রসমষ্টি ও মানবিক রসের উৎসার। তাঁহার নরক ও পিতৃলোক যথাক্রমে বীভৎস ও শান্তরসের দ্যোতক। তিনি হিন্দুর অধ্যাত্মতত্ত্বকে কবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, দার্শনিক তাৎপর্য্য-বোধের দিক দিয়া নহে। হেমচন্দ্রের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বই প্রধান; তিনি ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে বাহিরের দিক হইতে ভিতরের দিকটাই বড় হইয়াছে। পৌরাণিক বাহ্যরূপের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মতর অধ্যাত্ম তাৎপর্য্য বিদ্যমান তাহাকেই তিনি আধুনিক কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক ও প্রজ্ঞামূলক মতবাদের সমর্থনে কাব্যরূপ দিতে চেষ্টা

করিয়াছেন। শ্রীমান্ তারাপদ ইহাকে নীরস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। হয়ত মধুসূদনের বর্ণোজ্জ্বলতার সহিত তুলনায় হেমচন্দ্রের পরলোকের চিত্র, তত্ত্বধূলিসমাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ। কিন্তু বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ নিরবয়ব ভাবময়তার কথা চিন্তা করিলে ইহাতে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প নহে। ভাষার যে পরিমাণ গাম্ভীর্য্য ও ব্যঞ্জনাশক্তি থাকিলে দার্শনিক বিষয়কে কাব্যে রূপ দেওয়া যায়, তাহা হেমচন্দ্রের ছিল। ইহার সহিত উদাত্ত-ভাবব্যঞ্জক ছন্দোধ্বনির উপর তাঁহার সমান অধিকার থাকিলে তিনি অবিমিশ্র প্রশংসাভাজন হইতে পারিতেন। সমালোচক যে সমস্ত গুণের জন্য কবির বিশ্বকর্ম্মার অস্ত্রশালা বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন সেই সমস্ত গুণই তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্ব উপস্থাপনের মধ্যেও পাওয়া যায়। আর এই উপস্থাপনা দীর্ঘ হইলেও ইহা তাঁহার দেবলোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের একটা প্রধান উপায়। সুতরাং ইহার নীরসতা আপেক্ষিকভাবে সত্য ও ইহার ক্লান্তিকরতা পাঠকের তত্ত্বগ্রাহী রুচির উপর নির্ভর করে। মোটামুটি এইটুকু বলা যাইতে পারে যে কোন অলৌকিক ও জাতির ধর্ম্মসংস্কৃতিমূলক আখ্যায়িকা পাঠ করিতে হইলে কিছু পরিমাণ গুরুপাক দার্শনিক তত্ত্ব হজম করিতে হইবে—শুধু অঞ্জলি ভরিয়া বিশুদ্ধ কাব্যরসপান হয়ত এই জাতীয় কাব্য আস্বাদনের মধ্যে সম্ভব হইবে না।

মহাকাব্যের পরিবেশে ইন্দুবালার অনুপযোগিতা বহুদিন হইতে স্বীকৃত ও নিন্দিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বৃত্রসংহার ঠিক মহাকাব্য নহে, মহাকাব্যের গার্হস্থ্যসংস্করণ। এখানে যেমন ঐন্দ্রিলার দম্ভ ও আত্মপ্রাধান্য-বিস্তার ও বৃত্রের ব্যক্তিত্বহীন স্ত্রৈণতা, সেইরূপই ইন্দুবালার কুসুমপেলব কমনীয়তা। হেমচন্দ্র ইন্দুবালা-চরিত্র কল্পনার সময় গার্হস্থ্য চিত্রেই নিজ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, মহাকাব্যের বৃহত্তর পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ইন্দুবালা ঐন্দ্রিলার বিপরীত, মহাকাব্যে উভয়েই প্রায় সমভাবে বেমানান। একের পরুষতার আধিক্য অপরের কোমলতার আতিশয্য দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দুবালাকে বিচার করিতে হইবে তাহার বর্ণনায় কাব্যকলার সুকুমারত্ব ও চরিত্র-চিত্রণে অন্তঃসঙ্গতির মানদণ্ডে। এমন কি এই পরিবার-চিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ছবি—রুদ্রপীড়ও ঠিক বীর নহে, প্রমোদমুক্ত সাধারণ সুস্থ মানবের প্রতিনিধি। ইন্দ্রজিতের ক্ষেত্রে যে যশোলিপ্সা সার্থকভাবে জীবনের অঙ্গীভূত ও খানিকটা আত্মশ্লাঘাপুষ্ট হইয়া উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত, রুদ্রপীড়ের ক্ষেত্রে তাহা উৎসুক-কুণ্ঠিত অনুসরণের বিষয়। যে খ্যাতিরশ্মি ইন্দ্রজিতের কিরীটে স্থির-

ভাস্বর তাহা রুদ্রপীড়ের অনায়ত্ত, অথচ একান্তভাবে কাম্য তরুণ স্বপ্নের চঞ্চল বিদ্যুৎ-দীপ্তি। এই তরুণসুলভ আগ্রহ ও দুষ্প্রাপ্য গৌরবের প্রতি উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল কর-প্রসারণই তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। বৃত্রের চরিত্রের এই অকারণ যুদ্ধপ্রীতি ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য ক্ষোভ একটা সূক্ষ্ম, অনির্দ্দেশ্য অতৃপ্তির হেতু হইয়াছে।

শ্রীমান্ তারাপদের মতে বৃত্র-সংহার হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনার ক্রমবিবর্ত্তনে একটি ব্যতিক্রম। এই মতবাদ শুধু উল্লেখ করিলে চলিবে না, ইহাকে আলোচনা-সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। হেমচন্দ্রের রোম্যাণ্টিক আখ্যান-কাব্যের দিকে গোড়া হইতেই প্রবণতা ছিল। তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' ও 'বীরবাহু কাব্য' নানা উপাদানে গঠিত হইলেও, মোটের উপর আখ্যান-প্রধান। ইহার পর 'আশা-কানন' ও 'ছায়াময়ী'তে তিনি রূপক ও পরলোক-তত্ত্বাশ্রয়ী কাব্যরচনায় ব্রতী হন। ইতিমধ্যে মধুসূদনের প্রভাব ও উভয়বিধ কাব্যরীতির সংমিশ্রণের ফলেই বৃত্র-সংহারের উদ্ভব। সুতরাং ইহা যে হেমচন্দ্রের কাব্যজীবনে একটা আকস্মিক প্রক্ষেপ এই মত বোধ হয় তথ্যসমর্থিত নহে। আমার মনে হয় শ্রীমান্ তারাপদ হেমচন্দ্রের গীতিকবিতাকেই তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাভাবিক বিকাশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহার জন্য প্রস্তুতিই তাঁহার কাব্যজীবনের প্রধান ধারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের যে ভাব-দুর্ব্বলতা ও শক্তির অসমতা বৃত্র-সংহারে ক্ষমার্হ তাহা তাঁহার কবিতাবলীতে আরও তীব্রতর সমালোচনার যোগ্য। বৃহৎ আখ্যান-কাব্যে খুঁত থাকিতে পারে, কিন্তু গীতিকবিতার ও স্বল্প-পরিসর পরিপাটি বিন্যাসের মধ্যে কোনও খুঁত আরও পীড়াদায়ক। তবে হয়ত দশমহাবিদ্যাকে তাঁহার কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া যাইতে পারে। এখানে মহাকাব্যের সংযমহীন পৌরাণিক কল্পনা ও ধর্ম্মতত্ত্ববিলাস কবির স্বাভাবিক প্রবণতার সহিত আরও সহজ সম্পর্কান্বিত হইয়াছে।

॥ ৬ ॥

ভূমিকা দীর্ঘতর করিয়া লাভ নাই। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের উপর প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনায় মাত্র একটি ছোট অনুচ্ছেদে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাসূচক

কথা বলা হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের বিরাট পরিকল্পনায় গঠনগত ত্রুটি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার যাথার্থ্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা মানিয়া লইলেও ইহাতে যে পরিমিতিজ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় তাহা নিঃসন্দেহ। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা ঠিক প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চ আসন তাঁহাদের অবিসংবাদিত। ইঁহাদের তুল্য কবি সম্বন্ধে যদি বিরূপ সমালোচনার একাধিপত্য ঘটে, তবে বাংলা কাব্যের সমালোচনা ত্রুটি-নির্দ্দেশেরই এক বিরাট অধ্যায়ে পর্য্যবসিত হইবে। দুই-চারিটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকলের ভাগ্যে নিন্দাই জুটিবে। ইহা যেমন কবিদের পক্ষে অসম্মানজনক, তেমনি সমালোচকের পক্ষেও নেতিবাচক মনোবৃত্তিরই পরিপোষক হইবে ও সৌন্দর্য্য-অনুভূতি অপেক্ষা ছিদ্রান্বেষণের দিকেই তাহাদিগকে প্রণোদিত করিবে।

আর একটা বিষয়ও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। পরিকল্পনার ত্রুটি ও গঠন-পারিপাট্যের অভাব আখ্যান-কাব্যের অপকর্ষের হেতু তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহাই কি কাব্যবিচারে একমাত্র নিয়ামক নীতি? নাটকের নিবিড় ঐক্য ও ঘটনাবিন্যাস-কুশলতার আদর্শ আখ্যান-কাব্য ও উপন্যাসে ঠিক প্রযোজ্য নহে। ইংরেজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিসমূহ প্রায় কেহই এইজাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের The Prelude ও Excursion, শেলীর Revolt of Islam, কীটসের Endymion, টেনিসনের Idylls of the King, ব্রাউনিং-এর The Ring and the Book—এই সবগুলি দীর্ঘ কাব্যেই গঠন-সুষমার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। কল্পনার অজস্রতা, সৌন্দর্য্যের প্লাবন, মননশক্তির উৎকর্ষ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তা পরিকল্পনার সুস্পষ্ট ক্রমানুবর্ত্তনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমালোচক ইহাদের আঙ্গিক শিথিলতার কথা দুই-একটি মন্তব্যেই শেষ করিয়া ইহাদের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও আবেদনের স্বরূপটির উপরেই তাঁহার দৃষ্টিকে ন্যস্ত করেন। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও আমাদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বনই বিধেয়। আখ্যান-কাব্যের আদর্শ হইতে তাঁহারা যে বিচ্যুত হইয়াছেন, মধুসূদনের উন্নত মান যে তাঁহাদের অনায়ত্ত রহিয়াছে ইহা এতই স্বপ্রকাশ যে ইহার সুবিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের উৎকর্ষ, বাংলা কাব্যে কি তাঁহাদের স্থায়ী অবদান, কাব্য-ধারায় গতিবেগ সঞ্চার করিয়া, ক্রমউপচীয়মান শক্তির পরিচয় দিয়া ইহার অগ্রগমনকে ইঁহারা কিরূপে ত্বরান্বিত করিয়াছেন, অনুভূতি-রাজ্যের কোন্ নূতন নূতন খণ্ডাংশের উপর ইঁহারা

কাব্যের জয়-পতাকা উড়াইয়াছেন—এই সমস্ত বিষয়ই ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রধানত আলোচ্য। বৃত্র-সংহারের কোন্ কোন অংশে ভাব-সমুন্নতি, দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় অর্থগাঢ় ভাষাপ্রয়োগ, গীতিঝঙ্কারের ভিতর দিয়া যুদ্ধের উত্তেজনা, প্রেমের মাদকতা ও চরিত্রের সুকুমার চারুতার প্রকাশ, বিশ্বকর্ম্মার অস্ত্রশালা ও বজ্রনির্ম্মাণ-বর্ণনায় পিণ্ডীকৃত জড় উপাদানকে দ্রবীভূত করিবার মত কল্পনার উত্তাপ উদাহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা ও তাহার কাব্যমূল্য নির্দ্ধারণ সমালোচকের প্রধান কর্ত্তব্য। নবীনচন্দ্রের ভাষার অসংযম ও মাঝে-মধ্যে অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও যেখানে যেখানে বর্ণনার শান্ত মহিমা, প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় আবেদনের সূক্ষ্ম উপলব্ধি, গীতি-উচ্ছ্বাসের দ্বারা মানবিক আবেগের দুর্দ্দমনীয় গতিবেগের ব্যঞ্জনা, দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের কাব্যময় সাবলীল প্রকাশ, আত্ম-উদ্ঘাটনের (self-revelation) অদম্য প্রেরণা প্রভৃতি উৎকর্ষ-লক্ষণ পরিস্ফুট, সেগুলির যথাযোগ্য বিচার ও রসাস্বাদন সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আলোচনার ধারা উপরি-উক্ত প্রণালীতে প্রবাহিত হইলে কবির কাব্যোৎকর্ষ ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য উভয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তথাপি এই নবীন সমালোচক যেরূপ গুরু দায়িত্ববোধ ও গভীর অনুপ্রবেশশীলতা লইয়া তাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন ও ইহার মধ্যে নিজ অনুভব ও প্রকাশ-শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্ব্বদা প্রশংসনীয় ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। সমালোচনাক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ও বাঁধাধরা মতবাদের প্রভাব-মুক্ত হওয়া ও বিচারের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ ও নির্ভীক আত্মনির্ভরশীলতার সমর্থন উপস্থাপিত করা যথেষ্ট কৃতিত্বের নিদর্শন এবং এই গুণের প্রাচুর্য্যের জন্য আমি গ্রন্থখানিকে ও গ্রন্থকারকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। তরুণের সাধনা যেমন অন্য অন্য ক্ষেত্রেও, সেইরূপ সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও, নবাবিষ্কারের গৌরবমণ্ডিত হউক ইহাই একান্তভাবে কামনা করিতেছি।

১০ই জুন, ১৯৫৪

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্য

আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা

॥ ১ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্য প্রবাহকে ১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত একটা বিশেষ পর্ব্বে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই পর্ব্বের এক কোটিতে প্রাচীন যুগের শেষ উত্তরাধিকারী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর-এক কোটিতে বাংলা মহাকাব্যধারার শেষ কাব্য 'প্রভাস'। তবে এই পর্ব্বকে কাব্যের রূপগত ও ভাবগত কোন নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষিত করা শক্ত। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ভাব-জগতের ভারসাম্য নানা অপরিচিত ও অভাবিত তরঙ্গে এমনভাবে বিচলিত হইয়াছে যে এই যুগের কাব্যসাধনার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট আদর্শের নিয়ন্ত্রণ বা কোন নির্দ্দিষ্ট কাব্যাদর্শের অনুসরণ-চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান-সীমা যেন আপনা হতেই রচিত হইয়া আছে; এক-একটি বিশেষ যুগের সমস্ত কবি যেন তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই একটা নির্দ্দিষ্ট সুরে ও আদর্শে কাব্যসাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সেই সুর বা আদর্শ সাম্যে সেই যুগের কবিগোষ্ঠীকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র যুগ কল্পনা সম্ভব। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে সেরূপ কোন গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্য সহজে লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণত রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে একই সুরের ও একই আদর্শের কবি মনে করিয়া ইঁহাদের কাব্যমাল্য দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধকে বাংলা কাব্যের বীরযুগ (heroic age) বা কৃত্রিম ক্লাসিক যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়; কিন্তু এই চারজন কবির মধ্যে সাদৃশ্য যতখানি, বৈসাদৃশ্যও তদপেক্ষা বেশি। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র রীতি ও আদর্শের কবি। ইঁহাদের এই পার্থক্যকেও হয়ত কোন একটি সাদৃশ্যসূত্রে একত্র করা যায়, কিন্তু তাহা ক্লাসিক যুগের বীরযুগের বা কাব্যে সঙ্কীর্ণ সাধারণ ধর্ম্মে নয়।

এই বীরযুগের বীরত্ব-উন্মাদনার মধ্যে বিহারীলালের সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা, ক্লাসিক মহাকাব্যের কোদণ্ডটঙ্কার ও তূর্য্যনিনাদের মধ্যে গীতিকবির আত্মবীণার সুরালাপন এই সাধারণ ধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং সেই সময় কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যধারার ন্যায় রোম্যান্টিক গীতিকবিতা-ধারায়ও কাব্যানুশীলন কিছু কম নাই। শেষোক্ত ধারার বহু উল্লেখযোগ্য কবি কালবিচারে এই ক্লাসিক যুগের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইবেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮): তাঁহার 'মহিলা' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬): তাঁহার 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র প্রকাশকাল ১৮৭৩-৭৪: দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০): গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) ও অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮)—এই কবিগোষ্ঠীর লিরিকধর্ম্মী বহু কবিতা এই যুগের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে মহাকাব্য-ধারা এবং রোম্যান্টিক গীতিকাব্য-ধারার অনুবর্ত্তন এই যুগে ঠিক সমানভাবেই চলিয়াছিল। তাই বাংলা কাব্যের এই পর্ব্বকে বীরযুগ বা কৃত্রিম ক্লাসিক যুগ নামে অভিহিত করিলে এই পর্ব্বের সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ হয় না। এই যুগকে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্ব্ব—এই সাধারণ নাম ছাড়া অন্য কোন বিশেষ নামে অভিহিত করা শক্ত। এই পর্ব্বের পূর্ব্বপ্রান্তে ঈশ্বর গুপ্ত, উত্তরপ্রান্তে 'প্রভাস'। এখন এই দুইটি প্রান্তসীমা সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে।

প্রথমেই ঈশ্বর গুপ্তকে এই পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করিবার কারণ নির্দ্দেশ করি। ঈশ্বর গুপ্তকে বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের স্রষ্টা ঠিক বলা যায় কিনা তাহা বিতর্কমূলক প্রশ্ন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে আধুনিকতার বহু লক্ষণ যে অস্ফুটাকারে প্রকাশিত হইয়াছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং আধুনিক যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহাকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-বিহারীলালের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কালগত ব্যবধান যতই দীর্ঘ হউক, ইঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রথম জীবনের রচনার উপর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। রঙ্গলালের প্রতিভার স্বকীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার শেষ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'তে। এই একখানি কাব্য ছাড়া তাঁহার প্রত্যেকখানি কাব্যের উপর অন্যান্য কবির প্রভাবের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব-চিহ্ন সুপ্রকট। বিহারীলাল তাঁহার নিজস্ব সুরটি প্রথম ধরিতে পারিয়াছেন 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে; ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'বন্ধুবিয়োগ' 'প্রেমকাহিনী'তে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের বর্ণনা ও লিপিচাতুর্য্য অনুসরণ করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের তৃতীয় কাব্য 'বৃত্রসংহারে' তিনি মধুসূদনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও তাঁহার প্রথম

দুইখানি কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী' ও 'বীরবাহু'তে ঈশ্বর গুপ্তের (এবং রঙ্গলালেরও) প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে। কেবল রচনাদর্শ নয়, ইঁহাদের উপর ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবগত প্রভাবও আছে। সমসাময়িক সমাজের অনাচার-ব্যভিচার,চরিত্র-দৈন্য, আদর্শ হীনতা ঈশ্বর গুপ্তকে যেমন পীড়িত করিয়াছে, রঙ্গলাল-বিহারীলাল-হেমচন্দ্রকেও ঠিক তেমনি পীড়িত করিয়াছে। এবং ইঁহাদের কবিতায়ও ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার সেই সুরেরই অনুবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রকে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুতরাং যে কবির রচনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়া রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্রকে পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাঁহাকে এই যুগের বহির্ভূত রাখা ঠিক হইবে বলিয়া মনে হয় না—বিশেষত যখন এই যুগবিভাগ কাব্যের রূপলক্ষণের (form) আদর্শে নয়, ভাববৈশিষ্ট্যের (Spirit) আদর্শে কল্পিত হইতেছে।

একখানি কাব্যের প্রকাশকালের উপর ভিত্তি করিয়া যখন এই যুগের উত্তরসীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সে কাব্যখানির মধ্যেও যখন যুগনির্দ্দেশক বৈশিষ্ট্য নাই বলিলে চলে, তখন এই সীমারেখা বিশেষ দৃঢ় মনে না করিবার হেতু রহিয়াছে। তবে এক্ষেত্রে 'প্রভাস' কাব্যখানির প্রকাশকালকে এই পর্ব্বের উত্তর প্রান্তরূপে যে গ্রহণ করা হইয়াছে ইহা একটা বাহ্য লক্ষণ; ভিতরে ভিতরে রসের ও রুচির পরিবর্ত্তন যখন সহজেই ধরা পড়িয়াছে তখন একটা নির্দ্দিষ্ট বৎসরকে সেই পরিবর্ত্তনের বাহ্য লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা বিশেষ অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

১৮৯৬-তে আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত হইল বলিয়া ধরা হইতেছে। রোম্যান্টিক গীতিকবিতার প্রচুর সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ক্লাসিকধর্ম্মী মহাকাব্যের ধারাই সে যুগে প্রবল। গীতিকবিতার ধারা এই মহাকাব্য-ধারার মধ্যে অন্তঃশীলা হইয়া প্রবহমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতি-চরিত্র গঠনের যে সর্ব্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, জড়তা ও সংস্কারের প্রভাব-মুক্ত যে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ দেশের আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল —সে আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন গীতিকবিতা হইতে পারে না; গুরুবস্তুভার-বহনক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। গীতিকবিতা সেই যুগেরই সৃষ্টি যে যুগে জাতীয় জীবন শান্ত ও সমাহিত। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচিত হইলেও এই গীতিকবিতার জন্য সে যুগের জনচিত্ত যেন প্রস্তুত ছিল না—এই শ্রেণীর কবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের কাছে উন্মোচিত হয় নাই।

বিহারীলাল এবং তাঁহার অনুগামী কবিগোষ্ঠীর সহিত যেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। সে যুগের কাব্যপিপাসা রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জাতীয় ভাবোদ্দীপক মহাকাব্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে। যে সৈনিক যুদ্ধে যাইতেছে রোম্যান্টিক কবির সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা তাহার চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, ক্লাসিক কাব্যের বীরগাথা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, যুদ্ধজয়ের উল্লাস তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। সেই কারণে উঁচু সুরের আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাব্যই এই পর্ব্বের প্রধান কাব্যধারা ; গীতিকবিতার ধারা শুরু হইয়াছে, তবে তাহা যুগচিত্তের স্বীকৃতি তখনও পায় নাই।

বিশুদ্ধ কাব্যরসের আদর্শের বিচারে এই যুগের কাব্যগুলি খুব মূল্যবান না হইলেও রচনাগুলি সে যুগে কেন এরূপ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল, সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হয়। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে যুগে কাব্যরস অপেক্ষা জাতীয় ভাবোদ্দীপক আদর্শের দিকেই যুগচিত্ত উন্মুখ হইয়াছিল। এবং এই কারণেই এই সকল বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যায়িকা-কাব্য অপেক্ষা কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাগুলি সে যুগের জনচিত্তের কাছে পূর্ণ সমর্থন-স্বীকৃতি পায় নাই। ইহার দ্বারাই সে যুগের কাব্য-বাসনা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালে 'প্রভাস' প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যধারার স্রোতে যেন ভাঁটার টান শুরু হইয়াছে এবং ইহার পর বিহারীলালের কাব্যসাধনাই জয়ী হইয়াছে। এই রুচি ও স্বাদ পরিবর্ত্তনের বাহ্য কালসীমা ১৮৯৬। 'প্রভাসে'-এর পর কিছুকাল পর্য্যন্ত এই কাব্যধারার অনুশীলন চলিয়াছিল ; তবে তখন রোম্যান্টিক গীতিকবিতার ধারা প্রধান, ক্লাসিক কাব্যধারা গৌণ—প্রায় নিশ্চিহ্ন।

১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এ পর্ব্বের বাংলা কাব্যকে জাতীয়-আন্দোলনের কাব্য বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এই যুগের কাব্যের প্রধান লক্ষ্য নয়। জাতীয় আদর্শের প্রচারের গুরুদায়িত্ব এই যুগের কাব্যের লক্ষ্যকে ভিন্নমুখী করিয়াছে। কাব্যের গতি সৌন্দর্য্যলোকের দিকে ; কিন্তু এ যুগে গুরুবস্তুভার ঝুলাইয়া দিয়া কাব্যকে বাস্তব জগতের দিকে টানিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮০০ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের রসের ভাণ্ডারে যেন তালাচাবি আটকাইয়া কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল ঈশ্বর গুপ্ত কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ রসের উৎস-মুখ অনাবৃত করিয়াছিলেন, নতুবা গদ্যানুশীলন, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নূতনাদর্শের নাটক

রচনার ঝোঁকে কাব্যের রসধারাটির উপর সকলে যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর রঙ্গলাল যখন সেই কাব্যধারার দিকে আবার জনচিত্তকে আকর্ষণ করিলেন, তখন এই কাব্যধারা জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনের বাহন হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিল এবং এই পরিচয়-ই এই যুগের কাব্যের বিশিষ্ট পরিচয়। কিন্তু ১৮৩০-১৮৯৬—এই পর্ব্বের পর হইতে কাব্য জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ লোক হইতে সরিয়া নেপথ্যালোকে চলিয়া গেল—কাব্য এবং জাতীয়-আন্দোলন যেন দুইটি স্বতন্ত্রধারায় পৃথক হইয়া আপন আপন পথে বহিয়া যাইতে লাগিল। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে এই দুইটি ধারা একত্র বহিয়া আসিতেছিল। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম সমাজ-রাষ্ট্রসমস্যা এবং কাব্যকে একসূত্রে গ্রথিত করেন, কিন্তু বাহুত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কাব্য রসপ্রধান হইল। জাতীয় ভাব প্রচারের পরোক্ষ ভার নাটক, উপন্যাস, সাময়িকপত্র, প্রবন্ধাদির মধ্যে, বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল এবং প্রত্যক্ষভাবে, হিন্দুমেলা, জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি সভা-সমিতি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া কাব্যের অঙ্গ হইতে প্রয়োজনের বোঝা নামাইয়া লইল। সুতরাং সে দিক দিয়াও ১৮৩০-৯৬ এই পর্ব্বটিকে আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যান্য পর্ব্ব হইতে একটু স্বতন্ত্র করিয়া দেখা সম্ভব এবং এই পর্ব্বকে বলা যাইতে পারে আধুনিক বাংলা কাব্যের বাহন পরীক্ষার যুগ। প্রাচীন কাব্যধারা যখন বিরুদ্ধ পরিবেশ ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে লুপ্ত হইয়া গেল এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা কাব্য যখন নূতন গতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সে কাব্যধারা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ক্লাসিক মহাকাব্যের খাতে প্রবাহিত হইবে অথবা বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার খাতে প্রবাহিত হইবে—এই পর্ব্বে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে এবং পরিশেষে দেখা গিয়াছে বিহারীলালের কাব্যধারাই জয়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার দৃষ্টান্ত।

॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের আদর্শে এই যুগের কবিদের বিচার করিলে ইঁহাদের উপর সুবিচার করা হইবে না। এই যুগের কবিদের কাব্যসাধনা ঠিক রস-সাধনা নয়, ইহা জাতীয় আদর্শের সাধনা নয়। যে শক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে নবযুগের বীজ বপন করিয়াছে, সেই শক্তি ভাবের ক্ষেত্রেও সক্রিয়। জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ, ভাবের ক্ষেত্রে সেই শক্তি প্রচ্ছন্ন। এই যুগের চিন্তানায়ক ও বাণী-সাধক—একই আদর্শের সমভূমিতে দাঁড়াইয়া একই লক্ষ্যে তাঁহাদের শক্তিকে পরিচালিত করিয়াছেন। এই যুগের ভাবযোগী কর্ম্মযোগীদেরই পরিপূরক অংশ। সুতরাং কেবলমাত্র রসের মানদণ্ডে নয়, যুগপরিবেশের সহিত মিলাইয়া এই কাব্য-পর্ব্বের গুরুত্ব ও মূল্য বিচার করিতে হইবে।

কিন্তু সেদিক দিয়াও এই পর্ব্বের কাব্যধারার বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, এই যুগের কাব্যধারাকে আমরা যেন কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। এই যুগের বহু উল্লেখযোগ্য কবির মধ্যে এক মধুসূদনের রচনায় ছাড়া অপর কোন কবির রচনায় কোনরূপ শিল্পকলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলা কাব্যের প্রাচীন যুগের সহিত ভাব ও প্রকাশ-রীতির তুলনায় এই যুগের অপর প্রত্যেক কবির রচনাকেই তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হইবে। সে রস-বিচারের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম ; অন্য যে গুরুত্ব এ যুগের কবিদের উপর আমরা আরোপ করিয়া থাকি, সে গুরুত্ব-বিচারেও এই যুগের কাব্যধারা উল্লেখযোগ্য নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর নবজাগরণের এই যুগটি অত্যন্ত জটিল ও নানা বিক্ষুব্ধ। নানা বিরোধী ভাবের তরঙ্গ পথে আসিয়া এই যুগটিকে আবর্ত্ত সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ ও জটিল যুগটি কাব্যে যেন যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় নাই ; এই যুগে সমস্যা-সংঘাতের আলোড়ন যেন এই যুগের কাব্যে সংহত রূপ লাভ করিতে পারে নাই। অন্যান্য দেশের সাহিত্যে সমাজ-রাষ্ট্রের সঙ্কট-মুহূর্ত্তগুলি কাব্যে যেরূপ স্পষ্টভাবে রূপায়িত হয়, সমাজ ও রাষ্ট্র-দেহের মৃদুতম কম্পন-তরঙ্গটুকু যেভাবে কাব্যে স্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া যায়, এ যুগের কাব্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী যুগে কেবলমাত্র কাব্যের আশ্রয়ে যদি কেহ এই যুগ-সঙ্কটের পরিচয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি এ যুগের ভাব-ভাবনার একটা স্পষ্ট ও পূর্ণ

প্রতিচ্ছবি পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কাহিনী ইতিহাসে যতটুকু আছে তাহার চেয়ে বেশি আছে ফরাসী সাহিত্যে। সে তুলনায় বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের গুরুত্ব অতি নগণ্য। প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার মধ্যে, প্রাচ্য সংস্কার ও পাশ্চাত্যশিক্ষার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে যে তীব্র বিরোধ-সংঘর্ষ দেখা দিয়াছিল, এক মধুসূদনের কাব্যে ভিন্ন অন্য কাহারও কাব্যে সে বিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয় নাই; মধুসূদনের কাব্যেও সে বিরোধ-সংঘাতের মীমাংসা নাই, কবি কেবল চিত্রখানি উপস্থাপিত করিয়াছেন। মধুসূদনের পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও অবশ্য এই বিরোধের চিত্র কিছুটা প্রকাশিত হইয়াছে বটে—তবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বিরোধটা বাহ্যত, আদর্শগত নয়। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে বিরোধের চিত্র নয়, একটা নূতন জীবন-ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছে। সে ব্যাখ্যার কাব্যমূল্য ও ঐতিহাসিক মূল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও কবি যে একটা নূতন আদর্শে ও লক্ষ্যে, সংঘাতের উর্দ্ধে সংগঠনের দিকে মন সংযোগ করিতে পারিয়াছেন সে কথাটি বুঝিতে পারি। নবীনচন্দ্র ও মধুসূদনের মধ্যে কালব্যবধান কিছু দীর্ঘ; নবীনচন্দ্রের যুগে প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষ একটা পারস্পরিক সামঞ্জস্য-মীমাংসার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে; দুই বিরোধী শক্তির সংঘাতের ধূম্রজাল কাটিয়া গিয়া যেন বাতাস স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, ঐ যুগের সংগঠন-পরিকল্পনা কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু মধুসূদন পর্য্যন্ত জাতীয় আদর্শ কোন নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত হয় নাই, তখনও পরিবেশ ঠিক স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে পারে নাই, তাই মধুসূদনের কাব্যে বিরোধের চিত্র প্রধান। কিন্তু এই দুইজন কবি ভিন্ন এই পর্ব্বের অন্য কাহারও কাব্যে এই যুগসমস্যা ও ভাবসংকট তেমন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদের সমগ্র শক্তি যেন সুলভ-উচ্ছ্বাসবহুল দেশাত্মবোধের বাণী প্রচারেই নিঃশেষিত হইয়াছে। জাতীয় সংকট-মুহূর্ত্তে যুগচিত্ত যখন বিরোধী তরঙ্গের মধ্যে দ্বিধা-সংশয়ে কম্পিত, তখন কবিকেই সর্ব্বাগ্রে আগাইয়া আসিয়া একটা সুস্পষ্ট আদর্শ-লক্ষ্যে যুগচিত্তকে পরিচালিত করিতে হয়; দূর হইতে কবির বীরত্বের আস্ফালন ও দেশমাতার জয় ঘোষণার উচ্চ নিনাদে আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলে চলে না। সে বিচারে এ যুগের গদ্যলেখকের তৎপরতা ও গুরুত্ব অনেক বেশি। তাঁহারা গদ্যের প্রবাহ-পথে জ্ঞানের পণ্যদ্রব্য জনচিত্তের মধ্যে বিতরিত করিয়া দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন।

গদ্যানুশীলনে এবং জ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থপ্রকাশে তৎপরতা দেখিয়া স্পষ্টই মনে করা যাইতে পারে যে এই যুগের গদ্য-লেখকেরা যুগের সংকট-মুহূর্তের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া একটা স্থির আদর্শে ও প্রেরণায় অক্লান্তভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের তুলনায় এই যুগের কবিগোষ্ঠী যেন দূর হইতে এই কর্ম্মবীরদের পৃষ্ঠপোষণা করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয়ভাবোদ্দীপক আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এই যুগের কাব্যে তাই জাগরণ-যুগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ; এই যুগ আবির্ভাবের ফলে এই কবিদের উপর যে বিরাট দায়িত্ব আপনা হইতেই আরোপিত হইয়াছিল, সে দায়িত্ব তাঁহারা যেন যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। এই যুগের ভূমিকায় যে ব্যাপক প্রস্তুতি ও সংগঠনের আয়োজন আছে, কাব্যে তাহার অতি ক্ষীণ অংশই প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহা এ যুগের কবিদের পক্ষে বিশেষ অগৌরবের বলিয়াই মনে হয়। এইবার এই পর্ব্বের সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

এই যুগের সমাজ-জীবনের গ্রন্থিসঙ্কুল নানা বিরোধী ভাবধারার মধ্য হইতে তিনটি প্রধান ধারাকে পৃথক করা যায়। মোটামুটিভাবে এই তিনটি ধারাতেই সে যুগের বঙ্গসমাজ আন্দোলিত হইয়াছিল। আরও বহু ক্ষুদ্র ধারা ছিল, তবে সে বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

প্রথম ধারাকে বলিতে পারি সংগঠন-ধারা; ইহার মুখপাত্র রামমোহন। তাঁহার সংগঠন-আদর্শের বাস্তব রূপ ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহার অনুগামী হইলেন কালীনাথ রায়, মথুরনাথ মল্লিক, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। দ্বিতীয় ধারাকে বলিতে পারি সংরক্ষণ-ধারা: ইহার প্রতিনিধি রাধাকান্তদেব; তাঁহার প্রতিষ্ঠান 'ধর্ম্মসভা'। তাঁহার অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন মতিলাল শীল, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন প্রভৃতি। তৃতীয় ধারাকে বলা যায় বিপ্লবধারা: ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি হিন্দু কলেজ—প্রবর্ত্তক ডিরোজিও, অনুবর্ত্তক 'ইয়ং বেঙ্গল' দল। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই দলের প্রধান। এই ত্রিদলের উর্দ্ধে ছিলেন বঙ্গবাসীর পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহামতি ডেভিড হেয়ার। তিনি রামমোহন-রাধাকান্তেরও বন্ধু আবার ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাভূমি হিন্দু কলেজের সহিতও সংযুক্ত। 'স্কুলবুক সোসাইটি'র সভ্য হইয়া তিনি রামমোহনের সহিত স্কুলপাঠ্য পুস্তকও লিখিয়াছেন, আবার 'স্কুল সোসাইটী'তে রাধাকান্ত দেবের সহিত যুগ্ম সম্পাদকরূপে ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপনাও করিয়াছেন।

বাংলাদেশে নবযুগের সূত্রপাতে হেয়ারের সাধনা এই তিনটি দল অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়; তাঁহার আদর্শ লইয়া তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র ধারা।

রামমোহনের আদর্শ হইল প্রাচীনকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লওয়া, প্রাচীন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর নূতন ভাব-সৌধ নির্ম্মাণ করা। প্রাচীনকে পরিহার করিলে সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে পরিহার করিতে হয়, তাহা মঙ্গলের নয়। আবার প্রাচীনকে সংস্কার করিয়া না লইলে তাহা দ্বারা যুগপ্রয়োজন মিটিবে না; রামমোহনের মন্ত্র তাই প্রাচীন-নবীনের সমন্বয় মন্ত্র, প্রাচীনের সংস্কার মন্ত্র। সে সংস্কার কেবল ধর্ম্মে নয়; সমাজনীতিতে, শিক্ষানীতিতেও।

রাধাকান্ত দেবের ধর্ম্মসভার আদর্শ হইল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা; প্রাচীনকে সর্ব্বপ্রযত্নে নবীনের স্পর্শ হইতে রক্ষা করা। এই আদর্শের অনুবর্ত্তন দেখি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায়।

ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' ও ইহার সভ্যবৃন্দের আদর্শ হইল—প্রাচীন সংস্কার-বিশ্বাস স্বাধীন চিত্তবৃত্তির পক্ষে অন্তরায়; প্রাচীন যুগের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে নবীন যুগের মুক্ত হাওয়াকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হইলেও, যে সময় তাঁহার আবির্ভাব সে সময়ে ডিরোজিওর প্রভাব আধুনিক বঙ্গ যুবকদের উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মধুসূদন পতঙ্গবৎ সেই আদর্শে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও জ্ঞান-পিপাসায় ডিরোজিওর প্রভাব অনুভব করি; কাব্যে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই, পরোক্ষ প্রভাব আছে। ব্যক্তি-জীবন অপেক্ষা কবি-জীবনের উপর মধুসূদনের মমতা কিছু বেশি, তাই 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উচ্ছৃঙ্খলতার হলাহল ব্যক্তি-জীবনের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া তিনি কবি-জীবনকে ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন, কারণ ইয়ং বেঙ্গলের অশ্রান্ত বিপ্লবী-মনোভাব লইয়া কাব্য রচনা করা সম্ভব নয়। তবে দুইটি বিরোধী ভাব একই ব্যক্তির মনে একত্র থাকায় কিছু পারস্পরিক প্রভাব পড়িয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত মধুসূদনের রাবণ চরিত্র।

এই তিনটি ধারার প্রথম সঙ্গমস্থল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কিন্তু স্বাধীন চিত্তের বিকাশ আছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণ আস্থা আছে, শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু ভণ্ডামি-গোঁড়ামি নাই। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকেও উপেক্ষা করেন নাই। তবু

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই মিলন যেন পূর্ণ নয়, সে মিলন পূর্ণ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে বাংলার সমাজ-জীবনে ভাব-বিরোধের তীব্রতা যেন হ্রাস পাইয়াছে; এবং ১৮৭০-১৯০০ এই যুগটির মধ্যে বাংলার সমাজ-জীবনে সমন্বয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই যুগের কবিদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সংরক্ষণ দলে, মধুসূদন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর দলে, নবীনচন্দ্র বঙ্কিমী দলে। রঙ্গলাল, বিহারীলাল এবং হেমচন্দ্রকে কোন বিশেষ দলভুক্ত করা যায় না। বিহারীলাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র কোন নির্দ্দিষ্ট ধারাভুক্ত না হইলেও সাধারণভাবে জাতীয়-মন্ত্রে দীক্ষিত।

॥ ৩ ॥

ঈশ্বর গুপ্তকে এই যুগের প্রথম কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; কিন্তু যুগের সূত্রপাত একা ঈশ্বর গুপ্তকে লইয়া নয়, তিনি একটি বৃহত্তর কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক। সেই কবিগোষ্ঠীর রচনার পরিচয়ও এই প্রসঙ্গে দেওয়া দরকার। ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের যোগ প্রধানত প্রকাশরীতিতে। কবিওয়ালাদের ভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গিতে যে একটা সহজ অকৃত্রিমতা লক্ষ্য করা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে সেই ধর্ম্মটি পাইয়াছেন। তবে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপকটাক্ষের ভঙ্গিটি ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব। কবিওয়ালাদের রচনার ভাবগত প্রভাব পড়িয়াছে ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতাগুলির উপর; যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা যাইবে। তাহার পূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিওয়ালা সম্প্রদায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

কবিওয়ালাদের রস-রুচিবোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিশেষ উঁচু নয়। এ কথা ঠিক যে কবিগানের বহু অংশে প্রকৃত কাব্যরস অপেক্ষা অরসিকের কুরুচির প্রশ্রয় আছে এবং এই কুরুচি ও অশ্লীলতার প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্র পর্যন্তও বিস্তারিত হইয়াছে। তবে এই রুচিবিকৃতির জন্য কবিওয়ালাদের স্থূলরুচি

বা যুগপরিবেশ কোন্‌টি বেশী দায়ী তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন যুগে ইঁহাদের আবির্ভাব এবং দৈবক্রমে এমন সব শ্রোতাদের মনোরঞ্জন ইঁহাদের করিতে হইয়াছে যে, ইচ্ছায় হউক,আর অনিচ্ছায় হউক,ইঁহাদিগকে রচনার মধ্যে কিছু ভেজাল দিতে হইয়াছে, যাহাতে বিকৃত রুচির শ্রোতারা সহজেই মুগ্ধ হয়। তাই কবিওয়ালাদের গানে যে ভাবশুদ্ধির অভাব দেখা যায় তাহার জন্য যতটা দায়ী যুগপরিবেশ, ততটা দায়ী কবিওয়ালারা নন্ বা শ্রোতারাও নয়। কবিগানের আলোচনার পূর্ব্বে তাই ঐ যুগের গতি-প্রকৃতির একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ ১৭৬০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত। আবার এইটিই হইল বাংলাদেশের অরাজক-বিশৃঙ্খলার যুগ। এই অরাজক-বিশৃঙ্খলার প্রভাব যে কিরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী হইয়া বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল, ঐ যুগের রাষ্ট্রীয় পরিবেশ হইতে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়।

১৭৫৭ হইতে বাংলাদেশে দ্বৈত-শাসনের যুগ। ইংরাজ শোষক, নবাব শাসক। দেশের উপর প্রভুত্ব ইংরাজের, শাসন-দায়িত্ব নবাবের। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইংরাজের ইচ্ছা নাই, তাঁহাদের লক্ষ্য রাজস্বের উপর। নবাবের ভাগ্যে শূন্য রাজকোষ। শূন্য রাজভাণ্ডার নিয়া রাজ্যশাসন করা যায় না, তাই নবাবও নিষ্ক্রিয়। এই দ্বৈত-শাসনের জাঁতাকলে পড়িয়া বাঙালীর দুরবস্থার অবধি রহিল না।

ইংরাজ ও নবাবের পেষণে সর্ব্বস্বান্ত ও দেউলিয়া হইল বাংলার জমিদার-শ্রেণী। এই জমিদারেরাই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষক। এই জমিদার-বাড়ীতে বাংলার বারোমাসের তেরো পার্ব্বণ, উৎসব, শিক্ষা, ধর্ম্মালোচনা। জমিদারবাড়ীতেই অপরাধীর দণ্ডবিচার, গুণীর পুরস্কার, শিল্পীর শিরোপা। জমিদার কেবল জমির মালিক নন্, প্রজার সহিত তাঁহার কেবল ব্যবহারিক সম্পর্ক নয়, ভাবের সম্পর্ক। এই জমিদারেরা সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় বাংলার সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষা-ধর্ম্ম আশ্রয়চ্যুত হইল, অথচ নূতন কোন আশ্রয়কেন্দ্রও তখন গড়িয়া উঠে নাই।

এই যুগের ইংরাজ ও দেশবাসীর চিন্তাধারার চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বহুখ্যাত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থে: "বণিকদিগকে রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্ত্তব্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে

প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কিনা। পলাশীর যুদ্ধে তাঁহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ চলিল।...১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজরাজা স্থায়ী হইল এবং তাঁহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিকের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, ভারত-সাম্রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তাঁহাদের মস্তকে।"—এইভাবে পারস্পরিক বোঝাবুঝির পালা সমাপ্ত হইবার পর আর এক সমস্যা দেখা দিল—রাজ্যব্যবস্থায় কোন্ আদর্শ অনুসৃত হইবে —প্রাচীন না নবীন?

এই শাসন-অব্যবস্থার যুগে সাধারণ ধনী-দরিদ্রের নৈতিক আদর্শ কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন, "এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে একশ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত।...এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ-আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকা-যোগে আমোদ করিতে যাইত।" ধনীদিগের নৈতিক চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনী-গণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য-ভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্ত্তকী সহরে আসিত, তাহারা বাইজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজভবনে বাইজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের 'নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল।...এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজের প্রাধান্যলাভের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের গুপ্তপ্রণয়ের প্রত্যক্ষপ্রভাব বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসকে বহুদিন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রভাব রূপান্তরিত হইয়া এবং অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া প্রায় ১৮৪৫ পর্য্যন্ত বাংলাদেশের এক শ্রেণীর জনচিত্তের উপর ক্রিয়াশীল ছিল। সুতরাং এই যুগপরিবেশে যে গানগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহাতে উচ্চ নৈতিক আদর্শ আশা করা যায় না, পরন্তু আদিরসের উষ্ণ স্রোতই প্রবল হইবার কথা।

এই সময় বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় যেরূপ বিপর্য্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা যায় অনুরূপ বিপর্য্যয় কাব্যের ক্ষেত্রেও। প্রাচীন বাংলা কাব্যের রসপ্রবাহ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভা শব্দ-সঙ্গীতের জাদুমন্ত্রে শুষ্ক মৃত ভাবদেহে কৃত্রিম কল্লোল ও তরঙ্গ জাগাইয়াছে। অন্নদামঙ্গলের প্রাচীন কথাবস্তুকে ঘিরিয়া কবি যে রসের মধুচক্র গড়িয়াছেন, এই সাধারণ ও সুপরিচিত কাহিনীর মধ্যে যে যুগোপযোগী কাব্য-তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এক অভিনব কবিকর্ম্মের ইঙ্গিত বহন করে। এই তাৎপর্য্যের বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব; এক কথায় বলিতে পারি—ভক্তির স্থানে বুদ্ধি, আন্তরিকতার স্থানে কৌশল, গভীরতার স্থানে সাঙ্কেতিকতা। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার কাব্যের নূতন ইঙ্গিত গ্রহণ করিবার মত শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটিল না। ভারতচন্দ্রের পরহইতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের অব্যবস্থা শক্তিশালী কবির আবির্ভাব না ঘটিবার একটি কারণ।

কাব্যে যখন এইরূপ অরাজকতা, অর্থাৎ প্রাচীন আদর্শ লোপ পাইয়াছে অথচ নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠে নাই তখন অপেক্ষাকৃত স্থূল কবিত্বসম্পন্ন কবিওয়ালারা বাংলা কাব্যের আসরে প্রধান গাহেন। এই যুগে তাঁহারা যে এত প্রাধান্য পাইয়াছেন যুগপরিবেশই তাহার কারণ। যে ভূমিতে বিরাট মহীরুহের বীজ অঙ্কুরিত হয় না সেখানে আগাছা জন্মাইতে পারে। বাংলা কাব্যের জমিতে তখন মহাকবির আবির্ভাবের উপযোগী উর্ব্বরতা ছিল না, তাই কবিওয়ালাদের ন্যায় বহু আগাছা সেখানে মাথা উঁচু করিয়াছে। মহাকবিদের তুলনায় কবিওয়ালারা আগাছা সে কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা করা উচিত নয়। বিশৃঙ্খল-অরাজকতায় ইঁহাদের আবির্ভাব, সুস্থ-শান্তিময় পরিবেশে ইঁহাদের বিলাপ। এই স্বল্পকালে তাঁহারা একটি যুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—সে যুগ সন্ধি যুগ। নূতন-পুরাতনের সংযোগের যুগ। প্রাচীন যুগের সিদ্ধিকে নবীন যুগের আগন্তুকদের হাতে সমর্পণ করিয়া ইঁহারা প্রাচীন-

নবীনের সংযোগকে সুদৃঢ় করিয়াছেন। এবং সে গুরুব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন কবিওয়ালাদের সুযোগ্য উত্তরসাধক—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

॥ ৪ ॥

কবিগানকে প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—ভবানী-বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। ভবানী-বিষয়ক গানগুলির মধ্যেও আবার দুইটি শ্রেণী আছে—এক শ্রেণীতে দুর্গার ঐশ্বর্য্যভাব, আর এক শ্রেণীতে মাধুর্য্যভাব। কিন্তু ঐশ্বর্য্যভাব গানগুলির বাহ্যরূপ; ঐশ্বর্য্যভাব দিয়া গানের আরম্ভ করিলেও ক্রমশ কবি আরাধ্যাদেবীর সহিত মাতৃসম্পর্ক স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার অনুযোগ-অভিযোগ করিয়াছেন; দেবীর ঐশ্বর্য্যরূপের মধ্য হইতে সন্তানের আবেগ-আকুতি লইয়া প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন কবি স্বয়ং। এই গানটির সূচনা দেবীর ঐশ্বর্য্যরূপের বর্ণনা দিয়া—

"জয় যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা বলে, যে ডাকে মা তোমায়
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥"

একটু পরেই দেখি, গানে মা গৌণ হইয়াছেন, প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন কবি—

"তবু সন্তানের মুখে চাহিলে না মা
আমায় দয়া কোরলে না মা
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?"

—ঐশ্বর্য্যভাবের গানগুলিতে কবিওয়ালারা কোনরূপ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন না। ইহার কারণ, কবিওয়ালারা অনেকখানি স্বভাব-কবিদের পর্য্যায়ের; নিরলম্ব তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কবিতা রচনা করিতে পারেন না। তাঁহারা তাঁহাদের ঘরের মধ্যেই মিলনধর্ম্মী পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য যে ভাবসমুদ্র তরঙ্গিত হইতে দেখিয়াছেন, তাহারই একটুখানি কল্লোল, একটুখানি স্পন্দন এই গানগুলির মধ্যে সংহত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই তাঁহাদের গানগুলি তত্ত্বরূপের জন্য নয়, একটা চমৎকার আটপৌরে ঘরোয়া ভাবের জন্য রসিক চিত্তের স্বীকৃতি পায়।

তাঁহাদের অকৃত্রিম ভক্তিভাবকেও তাঁহারা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই গানটিতে দেখি কবি মুক্তি চান না, চান দুর্গার পায়ে অচলা ভক্তি—

"যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়
আমার মুক্তি পদেতে কাজ নাই ॥
আমি শুনিয়াছি শিব-উক্তি, সেবিব শিব-শক্তি
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই ॥"

নির্ব্বাণে কবির অনিচ্ছা; কবির আসক্তি সংসারের উপর। আসক্তি ত বন্ধন, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে বন্ধন-মুক্তির উপায়—ভক্তি। বন্ধন-মুক্তির সাধনা সকলের নয়, সন্ন্যাসীর। ভোগাসক্তির সাধনা—সেও মানুষের নয়, জড়ের। মানুষের সাধনা যেমন বন্ধনের, তেমনি বন্ধন-মুক্তির। তাই কবি বলেন,—

"বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে
বিজ্ঞানে দেহি যে শিবে;
সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই।"

এই পর্য্যায়ের গানগুলিতে যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এই—সংসারকে ফাঁকি দিয়া মুক্তি চাই না, তীর্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শূন্য পুণ্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চাই না—

"গয়া গঙ্গা বারাণসী
হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ কাবেরী কুরুক্ষেত্র
ঐ পদে যত তীর্থরাশি।"

দুর্গার পাদপদ্মে যেন আমার ভক্তি থাকে। সেই ভক্তিতেই আমার মুক্তি, সিদ্ধি, নির্ব্বাণ। এই মোহমুক্ত ও সংস্কারমুক্ত অধ্যাত্মবোধের প্রভাব ঈশ্বরচন্দ্রের ভগবদ্‌বিষয়ক কবিতাতেও প্রকাশ পাইয়াছে, তবে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় এরূপ আবেগ-বিহ্বলতা প্রকাশ পায় নাই।

ভবানী-বিষয়ক গানের অপর অংশের নাম আগমনী। আগমনী গানগুলির পিছনে বাংলাদেশের সমাজ-নিসর্গের একটি ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকায় আগমনী গানের রস-সৌন্দর্য্য যথার্থ প্রকাশ পায়। আগমনী গানগুলির মানবিক আবেদন সর্ব্বাধিক। যে সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে গানগুলি রচিত সে কাহিনীটি এই—দুধের মেয়ে উমা, তাহাকে পাঠাইতে হইয়াছে কৈলাসে স্বামীগৃহে। জামাই শিব শ্মশানবাসী, গাঁজা ভাং খায়, গায়

ছাইভস্ম মাখে, সংসারে চির-দারিদ্র্য। এমন অবস্থায় মা মেনকার দিন কেমন করিয়া কাটে? মেয়েকে দেখিবার জন্য মায়ের প্রাণ আকুপাকু করে। মা স্বপ্নে দেখেন শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়ের ঘরে স্বর্ণলতা উমার দুঃখের অবধি নাই। বৎসরান্তে মাত্র তিনটি দিনের জন্য উমা তাঁহার কোলে আসে; কিন্তু মায়ের কুশল-প্রশ্ন, মেয়ের অনুযোগ-অভিযোগে তিনটি দিন তিনটি মুহূর্তের মত কাটিয়া যায়—তাহার পর-ই বিজয়ার দিনে বাজে বিদায়ের করুণ ভৈরবী।

গানগুলির নাম আগমনী; গৌরীর হিমালয় আগমনের কথাই গানগুলির মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। তথাপি গানগুলিতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন মা মেনকা। মা মেনকা সহস্র বঙ্গজননীর প্রতিনিধি হইয়া কন্যা-বিরহের গভীর দুঃখ অনুভব করিয়াছেন। কেবল দুঃখানুভবই নয়—সকলের কাছেই তিনি অপরাধী। বাংলাদেশের সমাজ মেয়ের উপর যে অবিচার করিয়াছে, মেনকা বছরের পর বছর চোখের জলে সে সমস্ত অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। একে মেয়ের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল, তাহাতে আবার গিরিরাজকে ক্রমাগত ভৎসনা করিয়াও কৈলাসে পাঠানো যায় না—

"গিরি তুমি যে অগতি, বুঝে মা পার্ব্বতী
প্রসূতির অখ্যাতি জন্মায়।"

গিরিরাজ যেমন স্থূল প্রকৃতির তেমনি উদাসীন-নির্লিপ্ত—

"তোমারে কেউ কিছু ব'লবে না
দেখে পাষাণ পরাণ
আমার লোক গঞ্জনায়
যায় প্রাণ।"

অথচ গিরিরাজের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তরও নাই—

"আমি অচলা নারী, চলিতে নারি,
পারি না যে দেখে আসি।"

মেয়ে কিন্তু সে কথা বোঝে না, ভর্ৎসনা করে মাকে—

"শিবের থাকিলে বৈভব, বাড়িত গৌরব
দুবেলা তত্ত্ব ক'রে পাঠাতে।"

অতি দুঃখেই মেনকা তাই বলিয়াছেন—

"মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বোলবার
আছে তারাই জানে।"

এত দুঃখেও মেনকার দুঃখ নাই ; মেয়ের মুখ দেখিয়া এক বছরের দুঃখের স্মৃতি মুছিয়া যায়। কিন্তু সে ত ক্ষণিকের জন্য ; দীর্ঘ এক বছরের চোখের জল শুকাইতে শুকাইতে আবার চোখের জলে জোয়ার আসে মেয়েকে বিদায় দিবার সময়।

আগমনী গান রচয়িতাদের মধ্যে রাম বসু শ্রেষ্ঠ। রাম বসু ছাড়া জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য ও গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিনজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গানগুলিতে কোন গভীর দার্শনিক ভাব বা সূক্ষ্ম কবিত্বের প্রকাশ নাই, অথচ বহুকাল ধরিয়া গানগুলি সাধারণ বাঙ্গালীর হৃদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ইহার একটি কারণ এই যে, গানগুলির সহিত বাঙ্গালীর জীবন একই সুরে বাঁধা। এই কবিরা যে ঘটনা বা ভাব বাস্তবে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছেন, তাহাকেই সংগীতের রথে চড়াইয়া সাহিত্যের অমরলোকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

সংসারের যে ঘটনার প্রতি আমরা উদাসীন-নির্লিপ্ত, তাহা আমাদের মনের উপর কোন ছাপ না রাখিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় ; কিন্তু যে ঘটনা আমাদের মনের তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করে, তাহা তখনই নানা সুরে, নানা রাগিণীতে প্রকাশ হইয়া পড়িতে চায়। ঘটনার ক্ষণিকতা হইতে, বাস্তবের সাময়িকতা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের নিত্যকালের শাশ্বত রস-বস্তু করিয়া রাখিতে ইচ্ছা জাগে। লোক-সংগীতের রহস্য এইখানে। এইসব কবিরা লৌকিক সংসার জীবনের বিচিত্র মানব-সম্পর্কের মধ্যে একটা নিঃসীম গভীরতার সন্ধান পাইয়াছেন ; দেখিয়াছেন মানব-সম্পর্কে এই বিচিত্র প্রীতিরসের মধ্যে যে অনন্ত মাধুর্য্য, উপলব্ধিতে-অনুভবে-আস্বাদনে তাহা নিঃশেষ হয় না। এই অশেষ-অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশে ছাড়া তৃপ্তি নাই। তাই কোথায়ও প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-রাগে, কোথায়ও মা-মেয়ের বাৎসল্য-স্নেহে, কোথায়ও পতি-পত্নীর দাম্পত্য-প্রেমে যেখানেই অশেষের সুর লাগিয়াছে, সেইখানেই এই কবিরা তাঁহাদের আনন্দকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুভূতি প্রত্যক্ষ ও গভীর ; তাই প্রকাশও পরিচ্ছন্ন ও সহজ। প্রায় অধিকাংশ গানগুলিতেই সহজ কথোপকথনের সুরটি অব্যাহত আছে। ছন্দোনৈপুণ্য গানগুলিতে নাই বলিলেও চলে। ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য সহজ-সচ্ছন্দ-সাবলীল গতি। অনেক জায়গায় শব্দবিন্যাস গদ্যের মত, তবু ছন্দোভঙ্গ হয় নাই। শব্দ-চয়নও নিতান্ত আটপৌরে অথচ অপরূপ প্রকাশভঙ্গির মহিমায় গানগুলি কালজয়ী হইতে পারিয়াছে।

রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গান-ই কবিগানের প্রধান অংশ এবং কবিগান সম্পর্কে যত কিছু অভিযোগ, তাহা এই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া। কবিওয়ালাদের গানে এমন কোন অংশ চোখে পড়ে নাই, যাহা শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। বেশী কথা কি, পদাবলী-সাহিত্য যাঁহাদের পড়া আছে (চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও বিদ্যাপতির পদাবলী সমেত) তাঁহারা কবিগানে নূতন কোন কথা শুনিবেন না ; ভারতচন্দ্রের কাব্যে যাঁহাদের রস-চেতনা পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল। তবে একটি পার্থক্য আছে—বৈষ্ণব পদাবলীতে শক্তিশালী করিয়া শিল্পের আবরণে ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় যে কথা শোভন করিয়া বলিয়াছেন, ঠিক সেই কথাটি কবিগানে অত্যন্ত সাধারণ লৌকিক ভাষায় বলা হইয়াছে। তাই তাঁহাদের কথা কানে বাজে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিয়াছেন—"রূপযৌবন আছল দিন চারি, তা দেখি আদর কএল মুরারী।" এই কথাটি-ই কবিওয়ালারা বলিয়াছেন—

"তোমার চরিত, পথিক যেমত
হোয়ে শ্রান্তি যুত, বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে
পুন নাহি চায় ফিরে।"

পদাবলী-সাহিত্যের রাধিকারও জীবন-যৌবনের উপর পূর্ণ আসক্তি। কৃষ্ণ তাঁহাকে পরিহার করিয়া গেলেন, তাঁহার জীবন-যৌবন বিফল হইয়া গেল—এই প্রবল ভোগাকাজ্ক্ষা এবং যৌবনের জন্য ক্রন্দন বহু পদে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই ক্রন্দনের সুর অনুসরণ করিয়া আরও একটু বাস্তবদৃষ্টিতে কবিওয়ালাদের রাধিকা বলিয়াছেন,

"জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার।
বাঁচি-তো বসন্ত পাবো, কান্ত পাব পুনরায়।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রেমের যে চিত্রটি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর একটু তত্ত্বের আব্রু টানিয়া দিলে চিত্রটিকে শোভন ও সংযত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্বের আবরণটি সরাইয়া লইলে তাহার মধ্য হইতে প্রকট হইবে পরস্ত্রী-লোলুপ কামান্ধ কৃষ্ণের বীভৎস প্রেমাকুলতা। এই কুৎসিত

প্রেমাভিনয় মহাপ্রভুর প্রেমাদর্শের ভূমিকায় গ্রহণ করি বলিয়া ইহার কদর্য্য দিকটি তেমন উগ্র হইয়া প্রকাশ পায় না। অবশ্য এই ভূমিকা ছাড়াও পরবর্ত্তী যুগের পদাবলীতে এমন অনেক কিছু আছে, যাহাতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলাকে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কেলিবিলাসের পর্য্যায়ের মনে না করিয়া অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলা মনে করা যাইতে পারে। সে কথা স্বতন্ত্র। এখানে যে কথাটি প্রাসঙ্গিক, সেটি এই যে কবিগানে এমন কোন প্রেমের চিত্র নাই, যাহা নীতিতে দুষ্য, রুচিতে বিকৃত।১

কবিগানে সখী-সংবাদ, বিরহ প্রভৃতি পর্য্যায়ের কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার মহিমা অক্ষুন্ন থাকে নাই। ইহার কারণ দুইটি—প্রথমত, বৈষ্ণব-কবিদের মত কবিওয়ালারা মহাজন নন। দ্বিতীয়ত, ইহাদের কবিশক্তির বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে যে, কবিওয়ালারা স্বভাব-কবিদের সমগোত্রীয়। প্রত্যক্ষ বাস্তবে যে প্রেরণা তাঁহাদের অনুভূতিকে আন্দোলিত করিয়াছে, তাহাকেই ইঁহারা সংগীত-মুখর করিয়া তুলিয়াছেন। যে অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রেরণা নাই সে অনুভূতি তাঁহাদের গানে স্থান পায় নাই; সে অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল না। সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমলীলার যে চিত্র তাঁহারা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই ছিল রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনায় তাঁহাদের আদর্শ। বৈষ্ণব-কবিদের আদর্শও যে ইহা হইতে স্বতন্ত্র তাহা বলি না, তবে তাঁহারা প্রাকৃতের মধ্যে অপ্রাকৃতের ব্যঞ্জনা দিতে পারিয়াছেন কবিওয়ালারা তাহা পারেন নাই; সেই কারণে কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা-গৌরব তাঁহারা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

যেমন, "শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো
ওখানে এখন যেয়ো না
মানা করি কলহ আর বাড়াও না।"
অথবা, "তোরে ভালবেসেছিলাম বোলে কিরে প্রেম
আমার দুকূল মজালি
দুমাস না যেতে দারুণ বিচ্ছেদের হাতে
সঁপে দিয়ে 'আমায় ফেলে পালালি।"

১ খেঁউড় এ আলোচনায় 'গ্রহণ করা হয় নাই; কোন সংকলন গ্রন্থেও খেঁউড়ের নিদর্শন নাই। কবিগানের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণেও তাই খেঁউড়ের পাঁক ঘাটাঘাটি করা সঙ্গত নয়।

এই প্রকারের ভাব বৈষ্ণব-কবিতায় বহু আছে। কিন্তু সেখানে সখী বা রাধার উক্তি ঠিক এতখানি লৌকিক বা সাধারণ বলিয়া মনে হয় না। এ কথাগুলিকে কেবল কথা বলিয়াই মনে হয়। কবি-কল্পনার সাহায্যে কথার মধ্যে যে আবেগ ও তরঙ্গ আসে, বাচ্যের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয়ের ব্যঞ্জনা জাগে, তাহার স্পর্শ ইহাতে নাই। এই লৌকিক প্রকাশ-ভঙ্গি আগমনী গানের পক্ষে ভূষণ হইয়াছে, কারণ সেখানে সাধারণ লৌকিক ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের ব্যঞ্জনা দেওয়াই গানগুলির লক্ষ্য। মেনকা-উমাকে কেন্দ্র করিয়া মা-মেয়ের বাৎসল্য-স্নেহ এই ঘরোয়া-আটপৌরে প্রকাশভঙ্গির সাহায্যে চমৎকার ফুটিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সাধারণ লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমাভিনয়ের চিত্রের আশ্রয়ে অপার্থিব লোকোত্তর প্রেমের ব্যঞ্জনা দিতে হইবে। সেখানে শব্দ কেবল বাচ্যার্থকেই প্রকাশ করিবে না, বাচ্যার্থের অতীত রম্যার্থের ইঙ্গিত দিবে। বাচ্যার্থের অতীত যে রম্যার্থ, শব্দের নিকট হইতে তাহা আদায় করিতে দুর্লভ কবি-শক্তির প্রয়োজন। কবিওয়ালাদের তাহা ছিল না। লৌকিক-ভাব যে কবি-কল্পনার আশ্রয়ে 'অতিশয়' হইয়া কাব্যে রসরূপ পায়, কবিওয়ালাদের মধ্যে সে কবি-কল্পনার অভাব। রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গানে তাই কবিওয়ালারা আগমনী গানের মত কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন না।

বৈষ্ণব-কবিদের পদরচনার পিছনে একটা বিপুল রসশাস্ত্রের আদর্শ ছিল, একটা বিরাট গোষ্ঠী-মনোভাব সক্রিয় ছিল। সেই আদর্শের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেক কবি একই ভাবের একই সুরের পদরচনা করিতে পারিয়াছেন। কবিওয়ালাদের সেরূপ কোন আদর্শ ছিল না, তাই তাঁহাদের গানের মধ্যে অনেক স্ব-বিরোধী ভাব দেখা যায় এবং তাঁহাদের রাধিকা চরিত্রের মধ্যেও ঐক্য সঙ্গতির বিশেষ অভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি কখনও উচ্চ আদর্শ-জ্ঞাপক গভীর ভাবের কথা বলিয়াছেন, আবার কখনও একেবারে সাধারণ নায়িকার স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহাতেই অনুমান করা যায় যে, কবির মনে নির্দ্দিষ্ট কোন আদর্শ ছিল না, এবং তাঁহার অনুভূতি-আবেগও তেমন গভীরভাবে জাগ্রত হয় নাই, যাহাতে ভাবে ও প্রকাশরীতিতে একটা সমতা আসে। লিরিক-কবির অনুভূতি যখন প্রকৃতই উদ্রিক্ত হয়, তখন তাহা একটি রস-নিটোল গান বা কবিতায় প্রকাশ পায়। তাহার মধ্যে কোন দুর্ব্বল বা তুচ্ছ অংশ থাকে না। কারণ লিরিক-অনুভূতি একটা ক্ষণিকের স্পন্দন। এই স্পন্দন যেমন ক্ষণিকের তাহার প্রকাশও তেমনি ক্ষুদ্রাবয়ব ও নীরন্ধ্র। আখ্যায়িকা-কাব্যে, মহাকাব্যে,

উপন্যাসে, এমন কি নাটকেও দুর্ব্বল অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—কিন্তু লিরিকের কোন অংশ নাই। তাহা একটি অখণ্ড শিল্পবস্তু। কবিগান লিরিকের এই বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত হইয়া সমগ্র শিল্পবস্তুরূপে দানা বাঁধিতে পারে নাই। একটি গানেরই স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব, প্রকাশভঙ্গিও অভিনব; কিন্তু সমগ্র গানটি পড়িলে বহু বিকৃতি দেখা যায়। যেমন—

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হোল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।"

ইহার পরই যে লাইনগুলি আছে সেগুলি নিতান্তই গদ্যগন্ধী।

"যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে।
নির্লজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে
নারী জনম যেন করে না।"

কবিগানের বহু জায়গায় পদাবলী-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব আছে। বিস্তৃত উদ্ধৃতি সহযোগে তাহা দেখাইবার স্থানাভাব। এখানে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। ইহাতে কবিগানের উপর পদাবলীর প্রভাব কতখানি তাহা বোঝা যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিগানের কবিত্ব সম্বন্ধেও সামান্য একটুখানি ইশারা পাওয়া যাইবে।

"বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে
হোতেছে স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি।
না এলো মুরারী, পাই যাতনা।"

অথবা, "সই, রবি কিরণের প্রায় হিমকর
এ তনু আমার দহিছে
শিখি পিকরব, অঙ্গে মোর
বজ্রাঘাত সম বাজিছে।

অথবা, অঙ্গ অগোর চন্দন চর্চ্চিত
বনমালা গলায়।

গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়।”

এইবার কবিওয়ালাদের রাধিকার প্রেমের সামান্য একটু পরিচয় দিয়া আলোচনা শেষ করা যাইবে। অনেকে রাধিকার প্রেম দৈহিক ভোগ-লালসার সহিত যুক্ত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এমন বহু গান আছে যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, কবিওয়ালাদের রাধিকা কেবলমাত্র দৈহিক ভোগাকাঙ্ক্ষার সহিত সম্পৃক্ত নন।

একটি পদে দেখি রাধিকা সাধারণ লৌকিক প্রেমের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমের আস্বাদ পাইবার জন্য উৎসুক। তিনি বলেন,

“সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়।
এমন পীরিতি করি যাতে তরি দুদিকো।
ঐহিকো আব পার্থিকো।
শ্রীনন্দ নন্দনো দুঃখ ভঞ্জনো
সদা রাখি মনো তাঁরি পায়।”

আর একটি গানে দেখি রাধিকা সখিকে অনুরোধ করিতেছেন,

“কহ সখি কিছু প্রেমের কথা
* * * *
হায়! কোন প্রেম লাগি প্রহ্লাদো বৈরাগী
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে।
আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথ চেয়ে
মানসে করি সেরূপ ভাবনা।”

রাম বসুর একটি পদে দেখি রাধা মান করিয়াছেন, কৃষ্ণরূপ আর দেখিবেন না, কিন্তু মান রাখিতে রাধার সে কি বিড়ম্বনা!

“আমি যেদিকে ফিরে চাই,
সেদিকেই দেখতে পাই
সজল আঁখি জলদ বরণে।”

যেখানেই আঁখি পড়ে সেইখানেই কৃষ্ণের রূপ জাগে, চক্ষু-জোড়া কৃষ্ণমূর্তি।

কেবল তাই নয়—

"শ্যামকে হেরব না সখি।
বোলে চক্ষু মুদে থাকি।
সেরূপ অন্তরে দেখি ॥"

কৃষ্ণ কেবল বাহিরেই নয়—অন্তরে। রাধিকার ভিতর-বাহির কৃষ্ণময়। যে রাধিকা কৃষ্ণকে ভোগাকাঙ্ক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন সে রাধিকা নিশ্চয়ই অন্তরে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখেন নাই। তাই কবিওয়ালাদের রাধিকা যে প্রেমে কৃষ্ণের সহিত বাঁধা, সে প্রেম কেবল ভোগের নয়—ভোগাতীতেরও।

সেই রাধিকা বলেন, "জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে
আর নাহিকো সখা।"

তিনি-ই বলেন, "হায়, পীরিতের কিবা সৌরভ আছে ॥
সে সৌরভ মম অঙ্গে বয়।
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাস ॥
ব্যাপিলো ভুবনময়।"

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কলঙ্ক ও ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়।" এটি আংশিক সত্য। সমগ্রতার মধ্যে কলঙ্ক ও ছলনায় বিকৃতি সহজেই বিলীন হয়। কলঙ্ক ও ছলনা কবিগানে আছে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও যাহা আছে তারা পঞ্চমুখে প্রশংসনীয়। আর ছলনা ও চাতুরীই যদি কবিওয়ালাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বিষয়ের অভাব ছিল না—বিদ্যাসুন্দরের গুপ্তকেলির সুড়ঙ্গ-পথও পূর্ব্ব হইতেই খনন করা ছিল। কবিওয়ালারা গুপ্ত-পথের দিকে না গিয়া স্বভাব-সৌন্দর্য্যের পথ ধরিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুরুচির পক্ষে এইটি প্রধান যুক্তি। সে সৌন্দর্য্য কতখানি তাঁহারা পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র বিচার।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, গোধূলি আকাশের পতঙ্গের মত কবিওয়ালারা বাংলা সাহিত্যের আসরে আকস্মিকভাবে উদিত হইয়া আকস্মিকভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ কথা ঠিকই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদের স্থায়িত্ব দীর্ঘকালের নয়; ইঁহাদের পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের রস সাধনার ঐতিহ্য নাই; তাই বলিয়া ইহাদের গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখা সম্ভব নয়। ইঁহারা বাংলা-কাব্যের এক মহাদুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া সুলভ কবিত্ব, স্থূল অলঙ্কার প্রয়োগ, ক্ষীণ রসচেতনা ও প্রচুর চমক-কৌতুক প্রভৃতির আশ্রয়ে কোনক্রমে

বাংলা কাব্যের শুষ্কপ্রায় রসপ্রবাহটিকে ক্ষীণভাবে বাঁচাইয়া আনিয়া পরবর্ত্তী যুগের বিরাট ভাবসমুদ্রের সহিত সংযোগ ঘটাইয়াছেন'; তাই আধুনিক বাংলাকাব্যের যথার্থ ভূমিকা কবিওয়ালাদের গানে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ ১ ॥

বহু প্রাচীন কবির মত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও আধুনিক যুগের রসিক চিত্তের কাছে পূর্ণ সমাদর পান না। নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কেবলমাত্র কাব্য রসাস্বাদনের জন্য এযুগের কোন পাঠক গুপ্ত-কবির শরণাপন্ন হইবে না। ইহাতে অনুমান হয় যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় এমন কোন শাশ্বত রস-আবেদন নাই যাহাতে সেকালের রসের তরণী একালের রসিকের হৃদয়তটে আসিয়া ভিড়িতে পারে। যুগে যুগে সাহিত্যের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়, পাঠকের রুচি-দৃষ্টিরও পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তন-ধর্ম্ম ছাড়াও সাহিত্যের একটা স্থায়ী রূপ আছে, যুগ ও কালের ব্যবধান, রুচি ও ভাষার বিভিন্নতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যও যাহাকে অস্পষ্ট বা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না—এইটিই সাহিত্যের চিরন্তন রূপ। এই চিরন্তন রূপের সূত্রে কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত সেক্‌স্‌পীয়ারের যোগ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় মনে হয়, সাহিত্যের এই ধর্ম্মটির একেবারে অভাব। সেইজন্য তাঁহার কবিতাগুলি অতি সামান্যকালের ব্যবধানের আস্তরণও ভেদ করিতে পারিতেছে না। অথচ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাগুলিকে যিনি সংগৃহীত করিয়া উত্তরকালের পাঠকের জন্য সযত্নে রাখিয়া গিয়াছেন, রস-বৈদগ্ধ্যে, কাব্যবিচারের সূক্ষ্মদর্শিতায়, কেবলমাত্র একজন ব্যতীত প্রত্যেক বাঙ্গালীর উপর তাঁহার স্থান। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র [illegible]পাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনবৃত্তান্তের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া [illegible]ন্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-সমালোচনা করিয়া তাঁহার কবিতাবলীর একখানি [illegible] সংস্করণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ইহা যে কেবল প্রভাকর-সম্পাদকের

প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্বীকার বা উৎসাহ-দাতার প্রতি সৌজন্য-জ্ঞাপন তাহা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে এই কবিতাগুলির রস কেবলমাত্র বর্ত্তমান যুগের পাঠকদের মধ্যেই নিঃশেষিত হইবার নয়; ইহাদের মর্ম্মকোষে যে মধু-সঞ্চয় রহিয়াছে ভাবী যুগের গৌড়জনেও তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া পান করিতে পারিবে। তাই কবিতাগুলিকে তিনি ওষধির মত সাময়িক প্রয়োজনে বিনষ্ট হইতে দেন নাই, বনস্পতির দীর্ঘ স্থায়িত্ব দিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ সুরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের ফলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্রনিস্তরঙ্গ হ্রদটির বক্ষে মহাসাগরের অস্থির চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল, বাঙ্গালী-জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডাকাশ অনন্ত বিশ্বাকাশে মুক্তি পাইল, বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী গৌণ হইয়া বিশ্ববাসী প্রধান হইয়া উঠিল। গুপ্ত-কবির সময় হইতে ইহার সূত্রপাত। ঈশ্বর গুপ্তই শেষ বাঙ্গালী কবি এবং তাঁহার কবিতা-গুলিতেই বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষা শেষবারের মত স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে—এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির কবিতাবলী সাগ্রহে সংগ্রহ করিয়াছেন। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব একটি কৈফিয়ত আছে—"…বাংলা সাহিত্য কাব্যরাশিভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সে কথাটা আগে বুঝাই।…খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।…মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালার কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি।…এই কবিতাগুলি মায়ের প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।"

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুইটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার—তাঁহার কবিতার স্থায়ী মূল্য এবং তাঁহার বাঙ্গালী-প্রাণতা। অবশ্য এই দুইটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ বলিয়া মনে করা ঠিক হইবে না—ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক। কবির যেটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেইটিই তাঁহার কবিতারও স্থায়িত্বের কারণ। বাঙ্গালীয়ানাই ঈশ্বরচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—সহজ, সরল, সত্যসন্ধ ভাবটিকে তাঁহার বাঙ্গালীয়ানা বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং এই ভাবটির নিরাভরণ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল প্রকাশেই তাঁহার কবিতার স্থায়িত্ব। এই কবিতাগুলির স্থায়ী রস পৌষ-পার্ব্বণের পিঠা-পুলির রস। যে শ্রেণীর

পাঠকের কাছে এখন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা উপেক্ষিত হয় তাঁহাদের কাছে পিঠা-পুলি, 'অ্যাণ্ডাওয়ালা তপ্‌সা মাছ,' সোনার টোপর মাথায় দেওয়া 'আনারস' —ইহার কোনটির রসই স্বাদু নয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের পাঠকের অশ্রদ্ধা-উপেক্ষা কবির প্রতি নয় ইহা ধরিয়া নিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা আলোচনায় উৎসাহের সহিত অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার কাব্যমূল্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য কারণে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। বস্তুত, ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-গুরুত্ব ঠিক তাঁহার কবিতার রসোৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যান্য কবিদের সহিত তুলনামূলক বিচারে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর, এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর কবি হইবেন—কিন্তু যেজন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার গুরুত্ব—তাহা ঐতিহাসিক গুরুত্ব। গ্রীক দেবতা 'জেনাস্‌'-এর (যাঁহার নাম হইতে জানুয়ারী মাসের উৎপত্তি) দুইটি মুখের একটি গত দিনের দিকে, আর একটি অনাগত দিনের দিকে। ঈশ্বরচন্দ্রকেও বাংলা সাহিত্যের 'জেনাস্‌' বলা যায়। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দুইটি যুগকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া আছেন। তাঁহার এক মুখ প্রাচীন অতীতে, আর এক মুখ অনাগত ভবিষ্যতে। তাই তাঁহার কবিতায় একদিকে যেমন পুরাতন ধারার অনুবর্ত্তন আছে, অন্যদিকে তেমনি নতুন ধারার ইঙ্গিতও আছে। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার রসবিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়া তাঁহার কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ইহার মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সূত্র দুইটি কেমন করিয়া একত্র বিধৃত হইয়া আছে তাহা দেখা দরকার।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি বিশেষত্ব আছে, সেটিও তাঁহার কবিতা আলোচনার সময় সমভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়—কর্ম্মযোগী ও ভাবযোগী। কর্ম্মযোগী সাহিত্য-সৌধের মুটে-মজুরের শ্রমসাধ্য কাজগুলি করিয়া থাকেন, ভাবযোগী শিল্পীর কাজ করেন। কিন্তু একই লোকের মধ্যে এই মুটে-মজুর ও শিল্পী, কর্ম্মযোগী ও ভাবযোগীর একত্র মিলন খুব বিরল ক্ষেত্রেই ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সেই মুষ্টিমেয় সব্যসাচীদের অন্যতম। তিনি নিজে যেমন লেখনী চালনা করিয়াছেন, তেমনি আরও বহু লোককে লেখনী চালনা করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। 'প্রভাকর' ছিল তাঁহার পাঠশালা। প্রভাকরের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী যুগের খ্যাতিমান বহু লেখক প্রথম শিক্ষানবিশী করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন

ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি প্রধান। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তাঁহার কবিতাবলী আধুনিক যুগের প্রবর্ত্তনায় কতখানি সহায়তা করিয়াছে তাহা বির্তকের বিষয়, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যিক অধমর্ণের দলই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গুরু-স্থানীয়। ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে কোন আলোচনায় তাঁহার এই দুটি বৈশিষ্ট্য (কর্ম্মযোগী ও ভাবযোগী) মিলাইয়া লইয়া আলোচনা করিলেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। একমাত্র কবি-পরিচয় ঈশ্বর গুপ্তের আংশিক পরিচয়।

॥ ২ ॥

প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করিয়া পরে উদাহরণ সাহায্যে তাঁহার কবিতাগুলির অন্তরঙ্গ-মূলক (intensive) আলোচনা প্রসঙ্গে এই সূত্রগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলে গুপ্ত-কবির কবি-ভাবনার স্বরূপ ও কবি-প্রতিভার মৌলিকতা বুঝিতে সুবিধা হইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—

১॥ বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য কবির সহিত তুলনায় ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার কবি-প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতে পারেন তাহা হইল অতি তুচ্ছ, নগণ্য, উপেক্ষিত অথচ সুপরিচিত বস্তুসমূহে অপরূপ মহিমা ও কাব্য-গৌরব আরোপ। এই সমস্ত বিষয় হইতে যে কাব্যরস নিষ্কাশন করা সম্ভব প্রাক্-ঈশ্বর গুপ্ত যুগের বাঙ্গালী কবিদের তাহা ধারণাতীত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্ত বিষয় হইতে (আনারস, আওয়ালা তপসা মাছ, পাঁঠা ইত্যাদি) এক বিচিত্রতর রস নিষ্কাশন করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার কবি-কল্পনার রশ্মিতে ইহাদেরই আত্মস্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছেন। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য সমালোচকের ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্রের এই অসাধারণ ক্ষমতাকে বলা যায় to open out the soul of little and familiar things.

২॥ ঈশ্বরচন্দ্রের নিসর্গ চেতনা : ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের বহিঃপ্রকৃতি উদ্দীপনা বিভাগের কাজ করিয়া আসিয়াছে—বর্ষা প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-ব্যথাকে নিবিড় করিয়াছে, বসন্ত তাহাদের মিলন-ইচ্ছাকে তীব্রতর করিয়াছে। এইভাবে প্রকৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার চিত্তে স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাবোদ্দীপনে সহায়তা করিয়া কাব্যে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় সর্ব্বপ্রথম কাব্যের রাজদরবারে নিসর্গের স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। নিসর্গ যে মানবমনকে কেবল পুলকিত ও অশ্রুসজল করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা নয়; নিসর্গের নিজস্ব একটি রূপ-মহিমা আছে—সে আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র। বর্ষায়, শরতে, শীতে, হেমন্তে নিসর্গের বিচিত্র রূপ-মাধুরী বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৩॥ ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ-চেতনা : এই সমাজ-চেতনা তাঁহার মধ্যে এত প্রবল, সমাজের আচার-অনাচার, সুব্যবস্থা-কুব্যবস্থার প্রত্যেকটি তাঁহার কবি-মনকে এমন গভীরভাবে উদ্‌বেজিত করিয়াছে যে, সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমাজ-চেতনাই ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-প্রেরণার মূল উৎস। উনবিংশ শতকের ঐ যুগান্তকারী সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব না ঘটিলে হয়ত ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাবলী সংখ্যায় অনেক কম হইত। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত কবিরই সমাজের সহিত দৃঢ় যোগসূত্র রহিয়াছে, কিন্তু সমাজ তাঁহাদের কাব্য-কবিতায় ভাবাবহ বা পটভূমি। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় সমাজই মুখ্য।

৪॥ ঈশ্বরচন্দ্রের রঙ্গপ্রিয়তা : পারমার্থিক বা নৈতিক পর্য্যায়ের কবিতাগুলি ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র কবিতাগুলির মূল সুর রঙ্গ-রসের। জগৎ ও জীবনকে তিনি রঙ্গ-রসের গবাক্ষ লণ্ঠনের আলো দিয়া দেখিয়াছেন। এইটিই তাঁহার কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—তিনি গম্ভীর বিষয়কেও রঙ্গ-রসের গোলাপজলে সিক্ত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। প্রকাশ-ভঙ্গিতে, ভাষা-যোজনায়, ভাব-ভিত্তিতে, উপমা-নির্ব্বাচনে তাঁহার কবিতার মধ্য হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের যে মানসপরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে যে, কিছুকাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় একটি আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু খোসামুদী তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইত না, তাই চাকরি স্থায়ী হইত কিনা নিশ্চিত বলা যায় না।

৫॥ ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিপ্রধান মনোভাব : এই যুক্তিপ্রধান মনোভাব তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেও বিশেষভাবে প্রকট। ঈশ্বরচন্দ্র যে

যুগের কবি সে যুগের ঈশ্বরভক্তিতে যুক্তি-বিচার অপেক্ষা ভাব-উচ্ছ্বাসের প্রভাব-ই অধিকতর ক্রিয়াশীল। ঈশ্বরচন্দ্রের যুক্তিবাদী মন কিন্তু এই সংস্কার-বিশ্বাসের চোরাবালির উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তিবিচারের শক্ত-কঠিন ভূ-সংস্থানের উপর দাঁড়াইয়া জগৎ-জীব ও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছে। ইহাই তাঁহার কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ।

৬॥ ঐতিহাসিক-বোধ: এই ঐতিহাসিক-বোধ ঈশ্বরচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার শক্তিশালী কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যেও অবর্ত্তমান। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল ১৭৬০, পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে। কবির জীবৎকালের মধ্যে বাঙ্গালী তথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গেল। কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্রেই নয়, বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রেও ইহার পূর্ব্ব হইতেই পরিবর্ত্তনের ভাঙ্গন শুরু হইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের কোন তরঙ্গ ভারতচন্দ্রের কবি-মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; যে কবির সজীব কবি-প্রতিভা আছে তাঁহার পক্ষে সমসাময়িক এই গুরুতর রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লবের উপর সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম কবি যাঁহার মধ্যে সমাজ-সচেতনতা ও ঐতিহাসিক-বোধ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। ইহাও তাঁহার আধুনিকতার আর একটি লক্ষণ। ইহার কারণও আছে, ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি যিনি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত থাকায় সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাগুলি যেমন তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হইয়াছে, তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনা, বিশেষত যুদ্ধগুলি (শিখযুদ্ধ, দিল্লীর যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ প্রভৃতি) তাঁহার কবিতায় স্থান লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম বাঙ্গালী কবি যিনি সমসাময়িক যুদ্ধগুলিকেও কাব্যের বিষয় করিয়া লইয়াছেন।

৭॥ এইবার ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলির কয়েকটি গৌণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে—(ক) তাঁহার ভাষা-বৈশিষ্ট্য; ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ব্যাপক ভাবে বাঙ্গালীর মুখের ভাষাকে জাতে তুলিয়া সাহিত্যকে কৌলীন্য দান করিয়াছেন। (খ) তাঁহার উপমা-রূপক ও অনুপ্রাস-অলঙ্কারাদির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য। (গ) তাঁহার কবিতার নিরাভরণ ভঙ্গি। ইহা ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কবিতাগুলি যেন খনি হইতে সদ্য তোলা সোনা, আর্টের প্রক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য খনিজ ধাতু হইতে এই সোনাকে শোধন বা পরিচ্ছন্ন করা হয় নাই। তাঁহার কবিতায় সোনা হয়ত বহুমূল্য

রত্নাভরণে পরিণত হইয়া বঙ্গভারতীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে নাই, কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলি কবিহৃদয় ও পাঠকহৃদয়ের মধ্যে সহজ যোগসূত্র স্থাপিত করিয়াছে, কবির কথা ঋজুগতিতে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়াছে —আর্টের দৌত্য কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। (ঘ) তাঁহার বাক্-সংহতি ও প্রবচন সৃষ্টিক্ষমতা। (ঙ) তাঁহার কবিতার অশ্লীলতার দোষ।

এইবার ঈশ্বরচন্দ্রের প্রত্যেকটি বিষয়ের কবিতা আলোচনা করিবার সময় এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইবে এবং উপযুক্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলে এই সূত্রগুলি ও তাহাদের ব্যাখ্যা প্রমাণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলিকে বিষয়-অনুযায়ী এই কয়টি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—১. পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ক কবিতা; ২. সামাজিক ও ব্যঙ্গপ্রধান কবিতা; ৩. রসাত্মক কবিতা; ৪. যুদ্ধবিষয়ক কবিতা; ৫. ঋতু-বর্ণনাপ্রধান কবিতা; ৬. বিবিধ বিষয়ক কবিতা; ৭. শকুন্তলার কাহিনী লইয়া রচিত কবিতা; ৮. সারদা-মঙ্গল বা উমা-মেনকার প্রসঙ্গে কবিতা; ৯. কাব্য-কানন; ১০. রসলহরী; ১১. কবিতাগুচ্ছ। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র রচনা নয়, ইহা ছাড়া আরও বহু কবিতা আছে, যেগুলি অশ্লীলতা দোষের জন্য সংগ্রহ-গ্রন্থে সঙ্কলিত হইতে পারে নাই। এই বিস্তৃত ভাব-সূচী দেখিয়া সহজেই মনে হইবে কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়; ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-মন বিষয়-বৈচিত্র্যেও সমৃদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে এই সংখ্যাতীত কবিতার রচয়িতাকে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য কেবল ভাব-বৈচিত্র্য বা সংখ্যাভূয়িষ্ঠতা দেখিয়া কবির শ্রেণীবিচার করা চলে না। এবং প্রকৃত বিচারে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কবি নন। এ পর্য্যন্ত কেহই সে দাবী উত্থাপনও করেন নাই। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব ক্ষেত্রে তিনি সম্রাট, বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ, তাঁহার প্রাপ্য সেই কৃতিত্বগৌরব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা ঠিক হইবে না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার মধ্যে পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ক

কবিতা-ই সর্ব্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্করণে এই শ্রেণীর ছিয়ানব্বইটি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু এই কবিতাগুলি সম্পর্কে এক কথায় চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে গুপ্ত-কবির কবিতার সংখ্যা হইতে যদি ছিয়ানব্বইটি কবিতাই বাদ পড়িত, তাহা হইলে তাঁহার কবি-খ্যাতি কিছুমাত্র হ্রাস হইত না। একটু অসুবিধা এই হইত যে পাঠক-সমালোচক ধারণা করিতেন যে সমসাময়িক বিষয় ও ঘটনার উর্দ্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মন উঠিতে পারে না। এই কবিতাগুলি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার কবি-কল্পনা স্রষ্টার স্বরূপ ও সৃষ্টির রহস্য প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-মন যে কেবল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া রস-চক্র সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নয়; যাহা কিছু ইন্দ্রিয়াতীত, বস্তুতে নয় ব্যঞ্জনায় যাহার প্রকাশ, যাহা দেখিতে কেবল চোখের দৃষ্টি নয়, মনের ও ধ্যানের দৃষ্টির প্রয়োজন—ঈশ্বরচন্দ্র সেই ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শনকেও কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই শ্রেণীর কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রে সেই ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শন, সেই নেপথ্য-লোকের বাণী প্রকাশিত হইলেও কবিতা হিসাবে এগুলি তুচ্ছ রচনা। ভাবের দিক দিয়াও যে খুব উচ্চ তাহা বলা চলে না। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধ, এই কবিতাগুলিতে অতি সাধারণভাবে সেই জিজ্ঞাসা ও বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে। আবার কবিতাগুলি দেখিয়া এ সন্দেহও করা যায় যে এই জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের মধ্যে কোন গভীরতা বা তীব্রতার স্পর্শমাত্র নাই; ইহা যেন অতি সাধারণ ও মামুলী ধরনের কৌতূহল। কৌতুহল তীব্র হইলে কবিতায় প্রকাশরীতিতে যে আবেগ ও দীপ্তি আসে এই শ্রেণীর কবিতায় তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কবিতাগুলির মধ্যে এই ভাব দুইটি-ই ব্যক্ত হইয়াছে।

১॥ বিশ্বস্রষ্টার অনন্তলীলা মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়া বিচার করা যায় না—প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণকিরণস্পর্শে সমগ্র বিশ্ব স্বর্ণাভ হইয়া উঠে, কিন্তু "ক্রমে ক্রমে সে ভাবের হয় ভাবান্তর। খরতর-কর-কর হন দিবাকর।" আবার সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়েন পশ্চিমে; পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে অন্ধকারের বন্যা। সূর্য্যদেবের এই যে উদয়-বিলয়, এই আবর্ত্তন-চক্রের পশ্চাতে কোন চক্রী অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছেন। মানুষ যে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সংসার রঙ্গনাট্য-ভূমিতে অভিনয় করিয়া চলিয়াছে—এই বিশ্বনাট্যশালায় নেপথ্য-লোকে

একজন অদৃশ্য সূত্রধর আছেন—"অধিকারী একমাত্র অখিল পালক। আমরা সকলে তার যাত্রার বালক ॥ প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ শরীরেতে ল'য়ে। বহুরূপ সং সাজি বহুরূপী হয়ে ॥" সংসার নাট্যশালার এই অভিনয় ক্ষণটুকুই বর্ত্তমান—কিন্তু ইহা ত কালের মধ্যসীমা—ইহার ভূমিকা আছে, পরিশিষ্ট আছে। অভিনেতা কোথা হইতে সাজসজ্জা লইয়া আসে, অভিনয়-অন্তে কোথায়-ই বা যায়—

"কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি
কেন বা জীবিত আছি না হয় নির্ণয় ॥"

জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের যে মধ্য-তরঙ্গটি দেখিতেছি—যাহাকে বলি জীবন, তাহারও একটা উৎস, একটা মোহানা আছে—

"এই বলে হলো হলো, এই বলে মলো মলো
কেবা হ'লো, কেবা ম'লো সুধাইব কায় ?"

মানুষ জন্ম-মৃত্যু রহস্য লইয়া বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছে—ইহা "ঠিক যেন সম্ভাষণ কালায় কালায়।" বহু কবিতায় এই জিজ্ঞাসা ও সৃষ্টি-রহস্য ভেদে অক্ষমতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রথমত, ভাবের দিক দিয়া কবিতাগুলির মধ্যে এমন সূক্ষ্মতা নাই যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতার বিষয় হইতে পারে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলি প্রথমেই জাগে, এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে সেই প্রাথমিক প্রশ্নগুলিই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় গভীরতর অধ্যাত্মবোধ ও জীবন-জিজ্ঞাসায় ঈশ্বরচন্দ্রের মনন-কল্পনা প্রাথমিক স্তরের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় এই অধ্যাত্ম প্রশ্নগুলি প্রশ্নরূপেই সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়, যে কবির মনে সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করিবার ইচ্ছা জাগে, তাঁহার প্রশ্ন কেবল প্রশ্নরূপেই শেষ হয় না। তিনি হয় প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা-যুক্তি অভাবে সমাধানহীন সমস্যার পীড়নে নৈরাশ্যবাদী হন নতুবা সংস্কার-বিশ্বাস ও সাধনার বলে সামঞ্জস্য-সিদ্ধান্তের দ্বারা আশাবাদী হইয়া পড়েন। নৈরাশ্যবাদীর কবিতায় দ্বন্দ্ব-সংশয়, বিশ্বাসহীনতা ও পরিশেষে গভীর আর্ত্তি ও হতাশার সুর প্রধান হইয়া উঠে ; আশাবাদীর কবিতায় অধ্যাত্মবোধের উল্লাস, সাধনার জয়ঘোষণা ও ঈশ্বরের মহিমাব্যঞ্জক আনন্দময় রূপটি প্রকাশ পায়। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে এই দুই পরিণতির কোনটিই সংঘটিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান করা যায় যে তাঁহার এই অধ্যাত্ম প্রশ্নগুলি অতি সাধারণ শ্রেণীর কৌতূহল, ইহা

কবিকে গভীরভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই, পারিলে তাঁহার কবিতায় আবেগ ও অনুভূতি আরও গভীর ও তীব্রভাবে প্রকাশ পাইত। কবিও মধ্যপথে স্থির না থাকিয়া সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করিতেন।

২॥ (আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যেগুলির মধ্যে ভগবৎ-সাধনার প্রকৃষ্ট পথের নিশানা কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে আচার-সর্ব্বস্ব পরমার্থকামীদের উদ্দেশ্যে কবির তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্ব-নিখিলের যে দেবতা গৃহে খণ্ডরূপে আবদ্ধ, বাহিরে অখণ্ডরূপে তিনি ব্যক্ত। বিশ্বদেবতার এই মুক্ত অখণ্ড রূপ দেখিবার জন্য সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী হয়ে, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরসর্ব্বস্ব সন্ন্যাসীরা কেবলমাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধারণ মানুষের ভক্তি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। ইহাদের উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন—

"ঘরে ঘরে ফের যদি ঘর ছাড়া হ'য়ে
ঘরে ছেড়ে কিবা কাজ থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর ফল কিরে বাপু।")

কবি বুঝিয়াছেন ভগবৎ-সাধনার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন হৃদয়-পীঠকে পবিত্র করা; ভক্তের এই হৃদয়-দেউলেই বিশ্বদেবতার নিত্যপূজা। হৃদয়-তীর্থের পবিত্রতা সম্পাদন না করিয়া কেবল বাহ্য ধর্ম্মানুশাসন পালনে মুক্তি আসে না—

"ঠক্ ঠক্ শব্দ করি ঘুরাতেছ মালা।
ভাবিয়াছ দশের যশের তুমি শালা॥
চাল নাই, খুঁটি নাই, নাই গুণ লেশ।
কেমন হইবে শালা বল না বিশেষ॥
ঠক্ ঠক্ ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে!
কি হইবে মিছামিছি মালা ঘুরাইলে॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে॥
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে।"

ঈশ্বরচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে কবি ভক্তি, সাধনার পথে অধিক দূর অগ্রসর না হইলেও অধ্যাত্মসাধনার প্রকৃত পথটির

সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। এই পথে বহু মতের কণ্টক বিস্তৃত নাই, বহু নির্দ্দেশ অনুশাসনের খানা-গর্ত্ত নাই ; স্বচ্ছ সরল বিশ্বাস-ভক্তির আলো ধরিয়া এই পথে চলিলে পরিপূর্ণ সিদ্ধির স্বর্ণমন্দিরে পৌঁছাইতে অসুবিধা হইবে না। সংস্কার-প্রথা-নিয়ম, পূর্ব্ব-সংস্কার, ভগবৎ-সাধনার পথে এগুলি তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া ফেলে নাই ; ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাত্মবিষয়ক কবিতাগুলির এইটিই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যে মত ও পথের সহিত তাঁহার নিজের বুদ্ধি-যুক্তির পূর্ণ সমর্থন নাই সে মত ও পথকে তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী ভগবদ্‌নিষ্ঠা সে যুগের কবিদের মধ্যে দুর্ল্লভ। এইখানে ঈশ্বরচন্দ্রের আধুনিকতা ও ইহাই তাঁহার মৌলিকতা। তিনি-ই প্রথম অন্ধ-বিশ্বাসের ঠুলি খুলিয়া, সংস্কারের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া আপন হৃদয়ের আলোকে বিশ্বদেবতার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন।

পারমার্থিক কবিতা ছাড়াও এই বিভাগে নৈতিক বিষয়ক কতকগুলি কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশগুলি সাধারণ নীতিকথামূলক কবিতার পর্য্যায়ে রহিয়া গিয়াছে, কাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে এগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা না হউক, ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের মানসলোকটি বেশ পরিষ্কার দেখা যায় ; সে দিক দিয়া অর্থাৎ কবি-মানস বুঝিবার পক্ষে কবিতাগুলির গুরুত্ব আছে।

যে যুগ-সংকটকালে ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাব, তখন বাংলার সমাজ আদর্শ-ভ্রষ্টতা ও চারিত্র্য-দৈন্য-বিশেষভাবে প্রকট। আদর্শবাদী ঈশ্বরচন্দ্রের মনে ইহা প্রবল আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার নীতি-বিষয়ক কবিতাগুলি সেই প্রতিক্রিয়ার ফল—

"সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু এ কি বিপরীত
ভিতরেতে অভিমান ভরা।
বিদ্যার যে সারমর্ম্ম নাহি দেখি তার কর্ম্ম
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার॥"

ধর্ম্ম কেবল আচার-অনুশাসনে নয় ; ধর্ম্মসাধনায় যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নির্দ্দেশ থাকে দৈনন্দিন কর্ম্মব্যবস্থার সহিত সেই ধর্ম্মব্যবস্থার মিলনেই যথার্থ ধার্ম্মিকতা, অন্যথায় ধর্ম্ম বন্ধ্যা। ঈশ্বরচন্দ্র যে যুগের লোক সে যুগে সাধারণ বাঙ্গালীর কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যোগ ছিল না। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বেও কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না—

"সভ্য অভিমানী যারা মরি কিবা সভ্য তারা
সভ্যতার কি কব ব্যাভার।
কার্য্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার॥"

(কবি তাঁহার চারিপাশে যে সব মানুষ দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখিতে না পাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ; এমন কি তাঁহার মনে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ অম্লান ছিল নিজের ব্যবহারে-আচরণে-কর্ম্মেও সেই মনুষ্যত্বের প্রকাশ তিনি দেখিতে পান নাই—

"স্বরূপ মানুষ কই এমন মানুষ কই
আমি ত মানুষ নিজে নই॥")

ঈশ্বরচন্দ্রের এই কবিতাগুলিকে সেই যুগপরিবেশে স্থাপিত করিয়া পড়িলে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বোঝা সহজ হইবে। নতুবা, 'সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার' —এই উক্তি আধুনিক যুগে অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তাঁহার নীতি-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শাশ্বত-কালের চারিত্র-নীতি নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। একটা বিশেষকালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যাহা সত্য ও উপযোগী বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিতা হিসাবে যে এগুলি অতি সাধারণ স্তরের সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য বিষয়ের কবিতাগুলি পড়িবার পর এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রতি মুহূর্ত্তে পাঠকের মনে হইবে যে (কবির কাব্য-প্রতিভা প্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্র এটি নয়। এখানে কবি সাহস করিয়া স্বাভাবিকভাবে যেন মুখ খুলিতে পারিতেছেন না, কবিতার প্রতি ছত্রে ভাব প্রকাশের সঙ্কোচ ও দুর্ব্বলতার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। শব্দ, ছন্দ, প্রকাশ-রীতি কোনটির উপরই কবি পূর্ণ অধিকার আনিতে পারিতেছেন না ; ভীমের হাতে ধনুক বা অর্জ্জুনের হাতে গদা দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইলে তাঁহাদের যে অবস্থা হইত, পারমার্থিক বা নৈতিক বিষয়ক কবিতাগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রের সেই অবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—রঙ্গপ্রিয়তা ও লঘু চপলভঙ্গী, এই দুইটি বৈশিষ্ট্যই তাঁহার কাব্যকাননে বসন্ত ঋতু ও দক্ষিণ পবনের কাজ করিয়াছে ; ইহাদের অভাবে তাঁহার পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ক কবিতা-কুঞ্জে শীত-ঋতুর একাধিপত্য বিস্তারিত হইয়াছে।)

"সামাজিক ও ব্যঙ্গ' পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিশক্তির সম্যক্ প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি—রঙ্গপ্রিয়তা ও লঘু চপলভঙ্গী এই শ্রেণীর কবিতাগুলির পক্ষে বিশেষ উৎকর্ষের কারণ হইয়াছে। রসের মধুরালাপনের মধ্যে মধ্যে যেখানেই সামাজিক অনাচার-ব্যভিচার, যেখানেই চারিত্র-দৈন্য ও আদর্শহীনতা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই-খানেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হুল ফুটাইয়া তিনি বাঙ্গালীকে সজাগ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। নূতনত্বের অন্ধ আকর্ষণে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের ভারসাম্য যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা অনুকরণের নেশায় যখন বাঙ্গালী-চিত্ত অস্থির প্রলাপ বকিতেছিল, তখন কবিতার কশাঘাতে তিনি সেই মোহগ্রস্ত উন্মত্ত সমাজ-জীবনকে প্রকৃতিস্থ করিবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য সমাজ-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার সংরক্ষণশীল মনের পরিচয়-ই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের সংরক্ষণশীলতা সব ক্ষেত্রে অন্ধ গোঁড়ামি হইয়া উঠে নাই; নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে যেখানে শ্রীহীনতা, যেখানে অশোভনতা, সেইখানেই তিনি কবিতার সম্মার্জ্জনী নিক্ষেপ করিয়াছেন—এই কাজে তিনি প্রাচীন-নবীনের ভেদাভেদ বিচার করেন নাই।

সমাজ-সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশগুলিই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও ভাবধারার সহিত সংঘর্ষের ফলে প্রাচ্য ভাবধারার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। এইগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—

১॥ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিরোধিতা; ২॥ কৌলীন্য-প্রথার অপকারিতা; ৩॥ খ্রীষ্টান-ধর্ম্মের ব্যাপক প্রসারে আশঙ্কা; ৪॥ বাঙালীর সাহেবিয়ানা-অনুকরণপ্রিয়তা এবং দেশীয় আচার-প্রথা ও গুরুপুরোহিতে অবজ্ঞার জন্য ক্ষোভ; ৫॥ স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে সমাজে বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন স্ত্রী-ধর্ম্ম লোপ পাইবার আশঙ্কা; ৬॥ দেশে ব্যাপকভাবে গোহত্যা এবং সেই কারণে দুগ্ধাভাব; ৭॥ স্নানযাত্রা উপলক্ষে দেশীয় ধনী-জমিদারের অনাচার-ব্যভিচারের বর্ণনা; ৮॥ খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ; ৯॥ বাঙ্গালীদের প্রতি সাহেবদের উপেক্ষা; ১০॥ ইয়ং বেঙ্গলদের ক্রিয়াকলাপে অশ্রদ্ধা; ১১॥ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-অবিচার।

ব্যাপকভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের এই কবিতাগুলিকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধের সামাজিক ইতিহাস বলা যাইতে পারে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে বাঙ্গালীর সমাজ-দেহের যে যে অঙ্গগুলিতে কম্পনের তরঙ্গ জাগিয়াছে, যে অঙ্গগুলি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি-ই ঈশ্বরচন্দ্রের সামাজিক মনে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই শ্রেণীর সমাজ-সচেতন কবি ইতিপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছেন কিনা বলা শক্ত।

'বিধবা-বিবাহ আইন' নামক কবিতাটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বিদ্যাসাগরের প্রতিও বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন—

"সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ-ঘটন ॥"

ঈশ্বর গুপ্তের মতে শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া বিধবা-বিবাহ আইনটি পাস করা হইয়াছে—'শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে। দেশাচার, ব্যবহারে বাধো বাধো ঠেকে ॥'

ঈশ্বরচন্দ্রের রঙ্গপ্রিয় মন কোন বিষয়েই খুব গভীরে তলাইয়া দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না ; যে-কারণেই হউক কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিতে হইলে যে তন্ময়তা ও সমবেদনার প্রয়োজন হয়, ঈশ্বর গুপ্তের তাহা ছিল না। প্রাচীন সংস্কার ও আচার-ব্যবহার তাঁহার মনে স্থিরপ্রতিষ্ঠ একটি ধ্রুব আদর্শ গড়িয়া রাখিয়াছিল। সেই আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিয়া যেখানেই আদর্শচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, সেইখানেই তিনি কটূক্তিতে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। বস্তুত সামাজিক আচার-বিচারের শুভাশুভ বিচার করিতে গেলে এইরূপ কোন ধ্রুব-আদর্শকে মানদণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিলে সুবিচার পাইবার সম্ভাবনা কম। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রয়োজনানুযায়ী মানদণ্ডের পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রাচীন ভাবাদর্শকে নূতন ভাবালোকে পরিবর্ত্তিত বা শোধিত করিয়া লইবার উদারতা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সতী নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে একটা স্থির আদর্শ ছিল, তাই বিধবা-বিবাহ প্রথা যদি প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে 'বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে। সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে ?' যুগ যুগ ধরিয়া সতীত্বের মর্য্যাদা সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য অসহায় কত নারী আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার চমকপ্রদ কাহিনী তাঁহার মনে নারীর

সতীত্ব সম্পর্কে একটা গৌরব-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে, কোন গুরুতর কারণেও এই সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না। কিন্তু এই সতীত্ব-গৌরবের যূপকাষ্ঠে যে কত নারীর জীবন-যৌবন বলি পড়িতেছে, মহৎ আদর্শের এই করুণ দিকটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি সংকুচিত হইয়াছে। নারীর প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির অভাবই কি ইহার কারণ ?

অবশ্য প্রাচীনের প্রতি এইরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা যে একেবারেই অসঙ্গত ইহা মনে করা ভুল হইবে, পরন্তু এই সংরক্ষণশীলতা সে-যুগের প্রাচীনপন্থীদের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয়। কারণ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রভাবে এদেশের শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে যে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহার প্রত্যেকটি পরিবর্ত্তনই যে সমাজের কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া ঘটিতেছিল তাহা নয়। বিপরীতপক্ষে সাময়িকভাবে সমাজের অনাচার-ব্যভিচারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে উন্মত্ত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের অনুশাসন-শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখা গিয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা যখন সেই অনুশাসন-শৃঙ্খলকে শিথিল করিয়া দিল, তখন দীর্ঘ পুঞ্জীভূত উন্মত্ত প্রবৃত্তিগুলিই প্রথম বাহির হইয়া পড়িল। তাই যাঁহারা প্রাচীনপন্থী সংরক্ষণশীল কবি ও দেশকর্ম্মী তাঁহারা যে-কোন পরিবর্ত্তনের মধ্যেই অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া দেশীয় সমাজকে নূতন যুগের হাওয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য কম্বল মুড়ি দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন বিংশ শতাব্দীতে সেই কূর্ম্মপ্রবৃত্তিকে হাস্যকর ও অবাঞ্ছিত মনে করিলেও সে-যুগের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে ইহার মধ্যে অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলনও সমাজে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন সূচিত করিতেছিল। এই পরিবর্ত্তন বস্তুতই মঙ্গলের কি অমঙ্গলের, ইহা আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরাইবে বা দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিবে, সে বিচার করিবার মত দূরদৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল না ; তাই যে-কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনেই তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন। আরও একটি জিনিসের অভাব ছিল, সেটি আন্তরিকতা ও সমবেদনা। বাংলা দেশের বাল-বিধবাদের দুঃখ গদ্য-লেখক ঈশ্বরচন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু পদ্য-লেখক ঈশ্বরচন্দ্রকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—"যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট

পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ-ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই।" তিনি শৈশবে মাতার স্নেহ এবং যৌবনে স্ত্রীর প্রেম হইতে বঞ্চিত বলিয়া হৃদয়-ভাবের শিক্ষা তাঁহার হয় নাই। এবং ইহার অভাবে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকেও তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র একদিকে যেমন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিরোধিতা করিয়াছেন তেমনি আবার কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা দেখাইয়া বলিয়াছেন—'এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি।' একই লোকে মধ্যে এইরূপ প্রগতিশীল মনোভাব, একই লোক প্রাচীনকে অশ্রদ্ধা করিতেছেন আবার নবীনকে বাধা দিতেছেন—ইহার মধ্যে স্বভাবতই একটা বিরুদ্ধভাবের আভাস পাওয়া যায়। এবং যে কবি জানেন, 'শতেক বিধবা হয় একের মরণে।' তিনিই আবার বিধবা-বিবাহে বিরোধিতা করিতেছেন, এই দুইটিকে কোন একটি সাম্যসূত্রে গ্রথিত করা যায় না। কারণ, যে কারণে তিনি কৌলীন্য প্রথার উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন সেই কারণেই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তাঁহার সমর্থন থাকা উচিত ছিল। 'বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই। কোলের কুমারী ল'য়ে বিয়ে করে সেই॥' এ কথা যিনি জানেন বিধবা-বিবাহে বিরোধিতা করা তাঁহার শোভা পায় না।

ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে বিধবা-বিবাহ হউক বা কৌলীন্য প্রথা হউক—ইহার কোনটিই ঈশ্বরচন্দ্রকে গভীরভাবে অভিভূত করিতে পারে নাই। তাহা যদি পারিত তাহা হইলে এই সমস্যাগুলির উপর কেবল বিদ্রূপ কটাক্ষ নয়, একটা সামঞ্জস্যের সন্ধান দিবার চেষ্টা তিনি করিতেন। সাধারণভাবে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে 'হিউমারিস্ট' বা 'স্যাটায়ারিস্ট'-দের পক্ষে কোন বিষয় লইয়া খুব গভীরভাবে অভিভূত হইয়া পড়া সম্ভব নয়। বিষয়ের খুব গভীরে প্রবেশ করিলে বিদ্রূপ রসিকতা হাসি হইয়া ফোটে না, অশ্রু হইয়া ঝরে। ঈশ্বরচন্দ্রও এই সমস্যাগুলিকে বিদ্রূপ করিবার মত দূরত্ব রাখিয়া দেখিয়াছেন; সেই কারণে এই সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ের বর্ণনা বা চিত্রগুলি দূর হইতে কেবলমাত্র একটু রঙ্গরসের ফুলঝুরি দেখাইয়া নিঃশেষিত হইয়া যায়, পাঠক গভীরভাবে অভিভূত হয় না। কবির সহিত পাঠকেরও এই ধারণা জন্মে যে এইগুলি হাস্যরসের বিষয়, চিন্তা করিবার বিষয় নয়।

ঈশ্বরচন্দ্রের সংরক্ষণশীল মনের পরিচয় তাঁহার 'ছদ্ম-মিশনারী' কবিতায়ও বিশেষভাবে প্রকট। এই কবিতাটিতে তিনি ইংরাজ-মিশনারীদের

ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—'বাক্যের কুহক-যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে। যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে॥' ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-প্রচারকল্পে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল উনবিংশ শতকের বহুপূর্ব্ব হইতে; কিন্তু উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে রাষ্ট্র ও সমাজ-সঙ্কটের সময়েই তাঁহাদের প্রচারকার্য্য দ্রুত ও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে, কারণ ভিতরের সংহতি যখন শিথিল হইয়া আসে বাহিরের প্রভাব তখন প্রাধান্যলাভ করে। এই সব ধর্ম্মযাজকরা কেবল শিক্ষা-বিস্তারের নামে যে 'ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব' তাহা নয়, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে গিয়া তাঁহারা স্বভাবতই দেশীয় ধর্ম্মের ত্রুটি ও সংকীর্ণতা বড় করিয়া দেখাইতেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব জাগাইয়া দিতেন। ইহার ফলে এদেশীয় শিক্ষিত যুবকের মন এদেশীয় লোকের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিমুখ হইয়া উঠিত। এই কারণে যেমন রাষ্ট্রে, সমাজে তেমনি ধর্ম্মের মধ্যেও একটা ক্ষয় এবং ধ্বংসের লক্ষণ বৃহৎ হইয়া উঠিতেছিল। এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্রের 'ছদ্ম-মিশনারী' কবিতায় আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—'কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাঁচা। ওখানে জুজুর ভয় যেয়ো নারে বাছা॥ মূর্খ হয়ে ঘরে থাক ধর্ম্ম পথ ধরে॥' কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এইরূপ মনোভাবকে আত্মরক্ষা না বলিয়া আত্মসংকোচন প্রবৃত্তি বলাই ভাল। আত্মরক্ষা কার্য্যে কিছু পরিমাণ শক্তি ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়; সে শক্তি অর্জ্জনের কথা ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার নির্গলিতার্থ হইল—যেখানে শক্তির প্রয়োজন, যেখানে বিরোধী পক্ষের সহিত সংঘর্ষ, সেখান হইতে পিছু হটিয়া আপন বাস্তুভিটায় আশ্রয় লও। কিন্তু এইভাবে ক্রমশঃ শক্তির ক্ষেত্র এড়াইয়া যাইতে যাইতে যে ক্লীবত্বই অভ্যাস হইয়া যাইবে এবং একদিন বাস্তুভিটার নিরাপদ আশ্রয়টুকুও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়া দেখেন নাই। সঙ্কট-কালে অগ্রসর না হইয়া স্থির থাকা-ই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, সমুদ্রে দিগ্-ভ্রষ্ট জাহাজ ইতস্তত চলাফেরা না করিয়া সঙ্কটকালে নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া দিঙ্-নির্ণয়ের চেষ্টা করে। দিগ্ভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে যে ঈশ্বরচন্দ্র স্থির হইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন তাহার একটা অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু 'ওখানে জুজুর ভয় যেয়ো নাকো বাছা।'—এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তিনি বাঙ্গালীর স্ব-বলে আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম্মবিষয়ক কবিতাগুলি আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী। পূর্ব্বসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের উপর তাঁহার

আধ্যাত্মভক্তির মূল প্রোথিত নয়। যাহা প্রাচীন, কেবল প্রাচীন বলিয়াই যে তাহার টিকিয়া থাকিবার অধিকার আছে ঈশ্বরচন্দ্র সেরূপ অন্ধ গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নাই, তাই যেখানে ধর্ম্মের নামে বা ধর্ম্মোপলক্ষে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেখানে তিনি তাঁহার স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 'স্নান-যাত্রা' কবিতাটিতে এই ভাবের প্রকাশ আছে। মাহেশের স্নানযাত্রায় হিন্দুর একটা পবিত্র পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু কালক্রমে এই স্নানযাত্রায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া প্রমোদার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু ধনী নৌকাযোগে নটী-বাঈজী লইয়া আমোদ করিতে যাইতেন। সে-যুগের সামাজিক-নৈতিক ব্যভিচারের একটা চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় এই মাহেশের স্নানযাত্রায়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার একটি মনোমত বর্ণনা দিয়াছেন—

"চরণে বিলাতী জুতি পরিলেন ধোপ ধুতি।
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নবহরি
ঘস ঘস ঘসর ঘসর॥
ঘাটে গিয়া কত চোট সুখেতে সাজান বোট,
বাঁটে কোট তাহার ভিতরে।
দলে দলে গালাগালি দলে দলে দলাদলি।
বলাবলি হয় পরস্পর।
*** *** ***
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর
গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া॥"

মাহেশের স্নান-যাত্রীর মধ্যে এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যা-গরিষ্ঠ। কবিতাটির মধ্যে ঐ যুগের ধনীদের নৈতিক চরিত্রের একটি চমৎকার বর্ণনা যেমন পাওয়া যাইতেছে তেমনি আর একদিকে ইহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মনের সরলতা ও আধুনিকতার আভাসও পাইতেছি। যিনি বলেন, 'যায় যায় হি দুয়ানী আর নাহি থাকে,' তিনিই আবার বলেন, 'আমি যে অভাগা অতি স্বভাবত-ই ক্ষীণ মতি কোনকালে মাহেশে না যাই।' এই দুইটিকে মিলাইয়া লইলে উপরি উক্ত মন্তব্যের সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের তূণে যতগুলি বাণ ছিল তাহার অধিকাংশগুলিই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যে। সাহেবদের বড়দিন উৎসব অনুকারী বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্যে তিনি বিষোদ্গার করিয়াছেন এই বলিয়া—

"এ, বি পড়া ভবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেক্‌সের উপরে ॥"

* * *

ভাঙা এক টেবিলেতে ডিস্ সাজাইয়া ॥
ঈশুভাবে খানা খান বাহু বাজাইয়া ॥"

অন্যত্র, "হ'য়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসে চেলে
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে।
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
জুতো পায়ে দেখতে পাবে ॥"

স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা করিয়াও তিনি প্রাচীন-যুগের ভাবধারাকে নবীন-যুগের হাওয়া হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রতধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে ॥"

ঈশ্বর গুপ্তের উদ্দেশ্য ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর জাতি-চরিত্রের স্বরূপটি বাঙ্গালীর চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট করিয়া মেলিয়া ধরা। মানুষ নিজের মুখ নিজে দেখিতে পান না (আবার নেশায় মত্ত হইয়া থাকিলে মুখ তো দূরের কথা, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও চক্ষু-গোচর হয় না।) নিজের মুখ দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন। ঈশ্বরচন্দ্রের এই কবিতাগুলি দর্পণের কাজ করিয়াছে—এই কবিতা-মুকুরে আপন মুখের বিকৃত রূপটি দেখিয়া বাঙ্গালী নিজেকে সংশোধন করিতে পারিবে ইহাই হয়ত ঈশ্বরচন্দ্র আশা করিয়াছেন। নতুবা বাঙ্গালীকে লইয়া কেবল রঙ্গ-রস করা-ই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। বাঙ্গালীর জন্য তাঁহার পূর্ণ সমবেদনা ও আন্তরিকতা ছিল। বাঙ্গালীর উপর বিদ্রূপের সম্মার্জনী নিক্ষেপের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর উপর তাঁহার সহানুভূতি

ও আন্তরিকতার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। তাই আচার-ভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে তিনি যেমন গালাগালি দিয়াছেন তেমনি বিদেশী দ্বারা বাঙ্গালী যেখানে লাঞ্ছিত হইয়াছে, যেখানে বাঙ্গালীর আভিজাত্য-সম্ভ্রমের উপর বিদেশী হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেইখানেই বিদেশীর উদ্ধত মস্তকে তিনি আপন পাদুকা নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা। তিনি বাঙ্গালীকে তাঁহার আপন সম্মান দাবী করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নূতন কোন পথের ইঙ্গিত দিতে পারেন নাই, তিনি বাঙ্গালীকে সমস্যা-সঙ্কটের রণ-ভূমি হইতে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার অপ্রকৃতিস্থ ভাবটি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিয়াছেন।

॥ ৫ ॥

অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যের মত নিসর্গ-চেতনাও ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যাহা দ্বারা প্রাচীনযুগের কবিগোষ্ঠী হইতে তাঁহার পার্থক্য সূচিত হইতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার মনে স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাব উদ্দীপন ছাড়া নিসর্গের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমগুঞ্জনের মধ্যে কোথায়ও হয়ত একটু চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কখনও বা দক্ষিণ-বায়ু নায়িকার বসনাগ্রভাগ আন্দোলিত করিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দূর বনান্তরালে থাকিয়া কোকিল কুহুতান ধরিয়াছে ; আবার কোথাও দেখি কান্ত প্রবাসে, ক্লান্ত-আঁখি, বিগত-নিদ্র নায়িকা বর্ষারজনীর ঘনান্ধকারের প্রহর গণনায় রত—তখন ঝিল্লিরব সুরের ঐকতান সৃষ্টি করিয়াছে, মত্ত দাদুরি রহিয়া রহিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে। এইভাবে প্রাচীনযুগের কবিতায় নিসর্গ নেপথ্যলোকে থাকিয়া একটা সুরের ঐন্দ্রজালিক পটভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছে, কাব্য-রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। ঈশ্বরচন্দ্রই নিসর্গকে নেপথ্যলোকের অন্তরাল হইতে প্রত্যক্ষলোকে আনিয়া শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় ঋতু-রাণীর বিচিত্র রূপ-বৈভব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঋতু-বর্ণন পর্য্যায়ের কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্রের কুড়িটি বিভিন্ন ঋতু-বিষয়ক কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ঋতু-বর্ণন পর্য্যায়ের কবিতাগুলির উপর এতখানি গুরুত্ব

আরোপ করা হয়তো ঠিক হইবে না। প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের ফাঁকে ফাঁকে নয়, নিসর্গকেই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা কবিতায় একটা নূতন রীতি প্রবর্তন করিলেন সত্য—ইহা ছাড়া নিসর্গ-দর্শনে (Nature Philosophy) ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় আধুনিকত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় না। আধুনিকত্ব ত নয়ই, পরন্তু প্রাচীনযুগের কবিরা কাব্যে অপ্রধান রাখিয়াও নিসর্গ বর্ণনায় যে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, নিসর্গের সহিত মানবের গূঢ়-সঞ্চারী সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া মানব ও নিসর্গের মধ্যে যে একটা ভাবগত সম্পর্কসূত্র স্থাপিত করিয়াছেন, সূক্ষ্ম-সংযত বর্ণনায় নিসর্গকে পূর্ণ জীবন্ত করিয়া যেভাবে রক্তমাংসের চরিত্রের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন, নিসর্গের মধ্যে যে সাংকেতিক ও অনন্ত রহস্যময়তার আভাস আবিষ্কার করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় ইহার কোনটিই পাওয়া যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের ঋতু-বর্ণন পর্য্যায়ের কবিতায় ঋতু গৌণ, মানবের উপর ঋতুর প্রভাবই মুখ্য এবং কবিতাগুলি মনোযোগের সহিত পড়িয়াও এ ধারণা জন্মে না যে নিসর্গের রহস্যলীলা বর্ণনাই কবিতাগুলির প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে, পরন্তু দারুণ গ্রীষ্মে বা দারুণ শীতে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা, যে অবস্থা-বিপর্য্যয়, যে আচরণ-অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইগুলি লইয়া একটু লঘু হাস্যরসের অবতারণা করাই যেন কবির অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকৃতি-ই এইরূপ; যেখানে মানুষের 'হয়রানি', 'নাকানি-চুবানি', সেইখানেই তিনি কৌতুক রসের সন্ধান পান এবং কবিতায় সেই কৌতুক রসকে স্থায়িত্ব দেন। এক্ষেত্রেও সেই কৌতুক রস পরিবেশন ভিন্ন গভীরতর কোন উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

'গ্রীষ্ম' নামক কবিতাটিতে গ্রীষ্মের প্রবল প্রতাপের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মের এমন দুর্জ্জয় জ্বালা যে—

> "বাঘ হ'ল রাগহত ভাগ নাই তার।
> শিকার স্বীকার নাই শাকারে বিকার।
> ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
> তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী।"

এই ত পশুদের উপর গ্রীষ্মের প্রভাব, মানুষের উপর ইহার প্রভাব আরও ভয়াবহ। পুরোহিত পূজার আসনে বসিয়া মন্ত্র ভুলিয়া যায় এবং 'কোষা ধ'রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গলে।' ইহাদের অবস্থা ত তবু কল্পনা করা যায়, কিন্তু—

"একেবারে মারা যায় চাঁপ দেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজ খেকো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥"

মেয়েদের অবস্থা আরও মারাত্মক—

"সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলের অঞ্চলে না রাখে॥"

বসন্ত, হেমন্ত, শরৎ, মৃদুস্বভাবের প্রকৃতি; ইহারা দুর্জ্জয় গ্রীষ্ম ও শীতের আগমন সূচনা করে। ইহাদের প্রকাশ এমন-ই সলজ্জ ও সংকুচিত যে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন ভিন্ন অন্যে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে না। আবার ইহারা এমন-ই ক্ষণস্থায়ী যে ইহাদের প্রভাব উপলব্ধি করিতে না করিতে-ই রূঢ় প্রকৃতির শীত বা গ্রীষ্ম আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করে তাই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় গ্রীষ্ম ও শীতের প্রতাপে মানুষের দুরবস্থার চিত্র-ই অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু যে ঋতুর প্রভাব মানুষের বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের উপর নয়, মনের উপর, যে ঋতু শব্দের সমারোহের সহিত আসে না, অগোচরে গোপনে আসিয়া আমাদের মনের দরজায় মৃদু আঘাত করে, তেমন সলজ্জ-সংকুচিত প্রকৃতি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় নাই। শীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছেন—

"শীতের উঠেছে দাঁত কার সাধ্য দেয় হাত
আঁক ক'রে কেটে লয় বাপ।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস
জল নয় এ যে কালসাপ॥
ভুজঙ্গের কিসে ভয়, মন্ত্রে তার বিষ ক্ষয়
যত ভয় যেতে হয় জলে।"

'শরদ্বর্ণন' কবিতাটিতে শরৎ-প্রকৃতিকে খুঁজিয়া পাওয়া না। শরৎ বর্ণনা উপলক্ষে সেকালে দুর্গাপূজার আয়োজনের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে—যাজক-ব্রাহ্মণেরা চণ্ডীপাঠ শিখিয়া লইতেছে,—কবিওয়ালা যাত্রা-ওয়ালারা নূতন গান ও পালা বাঁধিয়া মহড়া দিতেছে, প্রবাসীরা গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, চণ্ডীমণ্ডপগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে—

চারিদিকে দুর্গা পূজার যে উদ্যোগ-আয়োজন তাহারই বিবরণ পাওয়া যায় 'শরদ্বর্ণন' কবিতাটিতে। এই বর্ণনাও এমন আবেগ-উত্তেজনাহীন ও যান্ত্রিক ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে তাহা দ্বারা বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয়-উৎসবের উপযুক্ত পটভূমি প্রস্তুত হইতে পারে নাই। এইগুলিকে ঠিক নিসর্গ-কবিতার পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, নিসর্গের উপলক্ষে নিসর্গের প্রভাব-বর্ণনই কবির লক্ষ্য।

বর্ষা-ঋতু বিষয়ক ঈশ্বরচন্দ্রের নয়টি কবিতা আছে; ইহার মধ্যে 'বর্ষা' নামীয় কবিতাটিতে কবি 'ঋতুপতি বর্ষারাজের' রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"গগনের সিংহাসনে বসিলেন হৃষ্ট মনে
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি, পূর্ব্বদিকে করে গতি
দিবা নিশা চামর ঢুলায়॥
... ...
সবুজ মেঘের দল ঢল ঢল ছল ছল
হতবল প্রবল অনিলে।
স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে॥
সোনার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
শেফালিকা প্রস্ফুটিত, অতিশয় সুশোভিত
জরির লপেটা লতা পায়॥"

ঝিল, বিল, নদীনদ, সরোবর-সিন্ধু এগুলি ঋতুরাজ বর্ষার পারিষদবৃন্দ। মহারাজের আগমনে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা—'প্রেমানন্দে দিয়ে কোল, পরস্পর করে আলিঙ্গনে।' তরুকুল বৃষ্টিভারে নত হইয়া যেন ঋতুরাজের উদ্দেশে নজর ধরিয়া প্রণিপাত করিতেছে। ভেকপাল রাজার কোতোয়াল, তাহারা 'জলে স্থলে কত সুখ লোটে।' চাতকেরা মহারাজের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া নকিবের কাজ করিতেছে। এইভাবে ঋতুরাজ বর্ষাকে সম্রাটের সহিত তুলনা করিয়া এবং বর্ষাগমনে সমগ্র পারিপার্শ্বিককে রাজাগমনের রীতি-পর্য্যায়ের সহিত রূপক-কল্পনা করিয়া বর্ষা বর্ণনায় কবি চমৎকার কবি-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বর্ষার সম্রাটোচিত আভিজাত্য-গৌরব যেমন সাংকেতিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে তেমনি বর্ষাগমনে খালবিল নদনদী

কেমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে,জলভরা-মন্থর মেঘগুলি কেমন ইতস্ততঃ বর্ষণ করিয়া যায়, সেই সজল মেঘগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ কেমন স্বর্ণহারের মত থাকিয়া থাকিয়া ঝলসিয়া উঠে,—এই সমস্তই একটি বৃহৎ চিত্রের মধ্যে একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাটির প্রথমাংশ ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিসর্গ-কবিতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

পরে আর একটি কবিতায় বর্ষার রাজ্যাভিষেক পর্ব্ব উদ্‌যাপনের বর্ণনা আছে—

"চাতক ময়ূর আর জলধর ভেক।
বরষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক॥
সেনাপতি জলধর শরবৃষ্টি করে।
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে॥
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তুরী।
আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর-ময়ূরী॥"

তবে বর্ষাকে এইভাবে রণবেশী সম্রাটরূপে কল্পনা করিবার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র কোন মৌলিকত্ব দাবী করিতে পারেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু জায়গায় এবং বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।১

আবার কেবল বর্ষা নয় শীত-বসন্তকেও ঈশ্বরচন্দ্র ঋতুরাজ বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

"সাজিলেন রাজা শীত ত্রিভুবন সশঙ্কিত
না জানি কাহার কিবা হয়॥"

আর একটি কবিতায় বসন্তকে রাজারূপে কল্পনা করিয়া কবি এইরূপ বন্দনা-গীত রচনা করিয়াছেন—

"সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ
নবপত্র রাজচ্ছত্র শোভা অপরূপ॥
গুণ গুণ স্বরে অলি রাজগুণ গায়।
মলয় পবন চক্র চামর ঢুলায়॥
রতিপতি সেনাপতি প্রিয় অতিশয়।
বিক্রমে করিল আসি সমুদয় জয়॥"

১। "বলাহকাশ্চাশনি-শব্দ মর্দলাঃ
সুরেন্দ্র-চাপং দধতস্তড়িদ্‌গুণম্।

বর্ষা-বর্ণনায় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রাচীন ঋতু-বর্ণনা রীতির অনুবর্ত্তন-ই দেখিতে পাই। বর্ষার সঙ্গে সেই ভেক, চাতক, ময়ূর, ময়ূরী আসিয়া ভিড় করিয়াছে; কেবল বিরহিণীর অভাব। এই কবিতাগুলিতে কবি যথাসম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং স্বভাব বর্ণনা কোথায়ও এক-একখানি সুদৃশ্য নিখুঁত চিত্রও আঁকিতে সক্ষম হইয়াছে।

বিস্তৃত বিশ্লেষণের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের ঋতু-বর্ণন পর্য্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে দুইটি শ্রেণী পাওয়া যাইতেছে। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে গ্রীষ্ম ও শীত এবং এই পর্য্যায়ের অন্যান্য কবিতা। এগুলিকে ঠিক নিসর্গ কবিতা বলা যায় না কারণ নিসর্গ এগুলিতে উপলক্ষ মাত্র। আর এক শ্রেণীতে বর্ষা এবং এই জাতীয় অন্যান্য কবিতা। এ-কবিতাগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের স্বভাব বর্ণনা ও কল্পনাশক্তির চমৎকারিত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহা প্রাচীন নিসর্গ বর্ণনা রীতিরই অনুবর্ত্তন মাত্র (এবং ইহাকে অক্ষম অনুকরণই বলিতে হইবে)। ইহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র কোনরূপ মৌলিকত্ব বা আধুনিকত্ব-গৌরব দাবী করিতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের বিভিন্ন ঋতু-বিষয়ক কবিতাগুলি দেখিয়া সাধারণ ভাবে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে নিসর্গ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে আধুনিকত্বের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র গুরুত্ব এইখানে যে কবিতায় তিনি

সুতীক্ষ্ণধারা-পতনোগ্র-শায়কৈ—
তুদন্ত চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্॥" ঋতু-সংহার॥

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পদে পাই—

"চড়ি রহু কুম্ভ কদম্ব-গজেন্দ্রহি
বাঙ্কল কেতকী-তুণ।
ধরি ধনু রাজ সাজ করি নীরদ
গরজন সমরে নিপুণ॥
ধরি খরশান তড়িত-অসি চঞ্চল
চমকই বারহি বার।
চাতকচয় জয় শব্দ-শরবকর
দেখি সুখি শিখি-পরিবার॥
মণ্ডুকগণ ঘন করু রণ-বাজন
সারস হংস বিষাণ।
পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ত
নব বক-পাঁতি নিশান॥"

নিসর্গকে প্রাধান্য দিয়াছেন—একমাত্র নিসর্গ-বর্ণনার জন্যই কবিতা রচনা করিয়াছেন।

নিসর্গ-কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য subjectivity বা আত্মলীনতা; ঈশ্বরচন্দ্রের নিসর্গ কবিতা objective বা বস্তুলীন। দারুণ গ্রীষ্মে বা দুর্জ্জয় শীতে মানুষের অবস্থা-বিপর্যায়ের দৃশ্যগুলি তিনি নিতান্ত বস্তুমূলকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব কবিতায় নিসর্গ বস্তুময় ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া মানুষের সহিত গভীর অন্তরঙ্গ-সম্পর্ক স্থাপিত করিতে পারে নাই। বস্তুলীন কবি-কল্পনাতেও চিত্ররীতির আশ্রয়ে নিসর্গকে সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় (কীট্স এবং রবীন্দ্রনাথ বস্তুলীন খণ্ড চিত্রের ভিতর দিয়া নিসর্গের অখণ্ড পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—'Ode to Autumn' কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের যে-কোন নিসর্গ-কবিতা দেখিলে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে)। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা ছিল না। তিনি বিষয়ের বর্ণনা দিতে পারেন, তাই তাঁহার কবিতা বর্ণনা-প্রধান, চিত্র-প্রধান নয়—বর্ণনা-রীতি ও চিত্র-রীতি এক নয়। চিত্র ছাড়া সঙ্গীতের মাধ্যমেও নিসর্গের স্বরূপ প্রকাশ করা যায়। চিত্র-ই বলি, আর সঙ্গীত-ই বলি, ইহার উদ্দেশ্য এক, মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়া। নিসর্গের মধ্যে রহিয়াছে অনন্তের আদর্শ; ব্যঞ্জনায়, কল্পনায়, রূপকে-উপমায়, চিত্রে-সঙ্গীতে সেই অনন্তের আভাস কবিতায় ফুটাইয়া তুলিলে তাহা বিষয়ের সঙ্কীর্ণতা হইতে মানুষের মনকে মুক্তি দেয়। কেবল পার্থিব সুখ-সুবিধা বা দুর্জ্জয় গ্রীষ্মে ও প্রচণ্ড শীতে মানুষের আচরণ-বৈষম্যের বর্ণনাই কবিতাকে নিসর্গ-কবিতার পর্য্যায়ে উন্নীত করে না। বস্তুত ঈশ্বরচন্দ্রের কল্পনা বস্তুধর্ম্মী, ব্যঞ্জনাধর্ম্মী নয়। যে ব্যঞ্জনাধর্ম্মী কবি-কল্পনা চিত্রে ও সঙ্গীতে মুক্তি পায় ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে সেই কবি-কল্পনার অভাব নাই বলিলেও চলে। বস্তুধর্ম্মী সরস কবি-কল্পনার জন্য সামাজিক ও ব্যঙ্গ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্রের অনন্য-সাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু যে শ্রেণীর কবিতায় বস্তু নয় ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, রসিকতা নয় গভীরতার প্রয়োজন, সে শ্রেণীর কবিতায় তাঁহার দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।

নিসর্গ বা পারমার্থিক-নৈতিক বিষয়ক কবিতাতে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিশক্তির সুষ্ঠু প্রকাশ নয়। তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর অথচ সুপরিচিত বিষয়সমূহ—যেগুলি এতদিন কাব্যের রাজদরবারে প্রবেশাধিকার পায় নাই—সেই বিষয়সমূহে কাব্যমহিমা আরোপ করাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। 'আনারস', 'এণ্ডাওয়ালা তপসা মাছ,' 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য,' 'পাঁঠা' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই অতুলনীয় শক্তি বাংলা সাহিত্যের অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক কবির মধ্যে দুর্ল্লভ। এই কবিতাগুলির অলৌকিক চমৎকারিত্বের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে শ্রেষ্ঠ কবিতা কেবল বিষয়-গৌরবের উপরই নির্ভর করে না, শক্তিশালী কবি অতি সাধারণ বিষয় লইয়াও প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করিতে পারেন। তবে সাধারণত দেখা যায় যাঁহারা তুচ্ছ বিষয় লইয়া কবিতা রচনা করেন তাঁহাদের কবিতার সুর শেষ পর্য্যন্ত লঘু-হাল্কা থাকে না, কবিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সুরের পরিবর্ত্তন ঘটে, কবির দৃষ্টিও তুচ্ছতা হইতে গভীরতায় প্রবেশ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ ইংরাজী-সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের লঘুচালের কতকগুলি কবিতা এবং বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের গদ্যরচনাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'ছুটি' নামে একটি কবিতা আছে, কবিতাটিতে বাস্তবজীবনের সাধারণ ছুটির কথা বলিতে বলিতে লেখক গভীরতর জীবন-দর্শনের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন এবং জীবনের বৃহত্তর ছুটির ইঙ্গিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কমলাকান্তের দপ্তরেও দেখি 'পতঙ্গ' 'বিড়াল' বা 'বড়বাজার' প্রভৃতি সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বিষয়সমূহের মধ্য হইতে লেখক এক গভীর ভাবোদ্দীপক চিন্তাশীল তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় কোনরূপ সুরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না, লঘু সুর শেষ পর্য্যন্ত লঘু-ই রহিয়া গিয়াছে, হাল্কা রসিকতা নীতিকথায় সমাপ্ত হয় নাই।

এই শ্রেণীর কবিতাগুলির উৎকর্ষের কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের নিরাভরণ ভাষা ও সহজ প্রকাশরীতি। কবিতাগুলির কোথায়ও 'সাহিত্যিক নির্ম্মিতির' চিহ্নটুকু নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা যেন সদ্য খনি হইতে তোলা সোনা। আর্টের প্রক্রিয়া দ্বারা এই সোনাকে শোধন করিয়া লওয়া হয় নাই। এই কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

যত সহজ ও সাধারণের বোধগম্য করিয়াই কবিতা রচনা করা যাক না কেন, কবিতার বিষয় যত লঘু ও হাল্কা হউক না কেন, কবিতা রচানকালে কবির চিত্তবীণা ভাবের এমন উচ্চগ্রামে বাঁধা হয় যে পাঠকের সহিত কবির একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য মুহূর্ত্ত মধ্যেই সৃষ্ট হইয়া যায়। কবি উচ্চভূমি হইতে বলিতেছেন এবং পাঠক নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছে, এই ভাবটি প্রায় প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট কবিতার মধ্যেই দেখা যায়। অবশ্য ছন্দ, ভাষ কল্পনা-উপমা এবং বিশেষ করিয়া 'tone' বা বর্ণনাভঙ্গী-ই এই ব্যবধানের-প্রাচীর গড়িয়া তোলে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা দেখিয়া মনে হয় তিনি, কবি ও পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধান-সীমা গড়িয়া তোলেন নাই; কবি পাঠকের সহিত একই ভূমিতে দাঁড়াইয়া পাঠককে তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন। এইটি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য। কবিতার মধ্যে এইরূপ সহজ অকৃত্রিমতার সুরটি অব্যাহত রাখা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। মনে হয়, এই বৈশিষ্ট্যটি তিনি কবিওয়ালাদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদাহরণ দিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে।

"রসভরা রসময় রসের ছাগল
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি গলে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে ঝোপ॥
* * * * * * * * *
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ শুঁকে
শুধু যায় পেট ভ'রে পাঁঠা রাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাকে বাঁধা॥
সাদা কালা কটারূপ বলিহারি গুণে।
শত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥"

কবিতাটিতে কেবল ছাগ-মাংসের প্রতি কবির লোলুপতার কথা প্রকাশ পায় নাই; পাঁঠার উপর কবির আসক্তি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঁঠার রূপ-মহিমা, অবয়ব-বিন্যাস, কণ্ঠস্বর সমস্তই চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই শ্রেণীর সমস্ত কবিতার মধ্যেই এই গুণটি দেখা যায়। 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' কবিতায় কবি কেবল বিবিধ খাদ্যের তালিকা ও তাহাদের প্রশস্তি-ই দেন নাই, মূলা-

লাউ-ফুলকপি-পাঙাস-শিম-পলাণ্ডু প্রভৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অভিনব রূপক-কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করিয়া কবি আমাদের চোখের সামনে ইহার এক-একখানি নিখুঁত ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন। এ ছবি আঁকিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর কবি-কল্পনার প্রয়োজন হয় না; সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং কিছুটা রসবোধ (যাহা দ্বারা রূপকের সাদৃশ্য-কল্পনা মনে জাগে) থাকিলেই ইহা সম্ভব হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে এই কবিতাগুলির চমৎকারিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করিতেছে অভিনব সাদৃশ্য-যোজনের উপর। যেমন, আনারসের চোখকে রূপসীর রক্তচক্ষুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে 'সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে। বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥' পলাণ্ডুকে যুদ্ধের লস্করের সহিত অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে 'পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর মুকুটের শর উড়ে মাথার উপর॥' ফুলকপিকে তুলনা করা হইয়াছে সাটিনের জামা গায় দেওয়া বাবুদের সহিত 'মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়। সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়॥' সাদৃশ্য যোজনার এই উদ্ভট মৌলিকত্বই এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

(আরও একটি কারণে কবিতাগুলির উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণত লাউ, মূলা, ফুলকপি এগুলি কবিতার বিষয়বস্তুরূপে কখনও গৃহীত হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র এইগুলিকে কেবল কবিতায় স্থান দেন নাই, ইহাদের সম্পর্কে সাধারণ বাঙালীর যে মনোভাব সেটি অবিকৃতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ফুলকপি, চিংড়ীমাছ, আনারস এই বিষয়গুলিকে ঈশ্বরচন্দ্র কবির দৃষ্টিতে না দেখিয়া সাধারণ বাঙালীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন—অর্থাৎ ইহাদের প্রতি বাঙালীর রসনার আকর্ষণের কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনি ইহাদের বহুমূল্যতার কথাও বলিয়াছেন। ফুলকপি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'সাহেবের প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা॥') আঙুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতরে। তুলার তোষক গদী করে থর থর॥ অথচ গলিয়া যায় এমন কোমল। রুচির রজত-রূপ করে ঝলমল॥' এ হেন উপাদেয় ফল যে আঙুর 'গরীবে জানে না নাম দূরে থাক মুট। দাম শুনে রাম ব'লে উঠে দেয় ছুট॥' দুর্দমনীয় লোভ অথচ মহার্ঘতার জন্য ইহা সাধারণ বাঙালীর ক্রয়-সীমার বাহিরে—(বাঙালীর মর্মের কথাটি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কবিতা-গুলি অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে।)

"যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে ?
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে ?

কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে ॥"

মাগুরের ঝোলের প্রতি, ভেটকী, বাটা, ভাঙন, গলদা চিংড়ী, হংসবীজের প্রতি বাঙালীর পূর্ণ আসক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিজ আসক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কবিতাগুলির সহিত বাঙালীর সহধর্ম্মিতা কোনকালেই লুপ্ত হইবার নয়। এই শ্রেণীর কবিতার সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার নয়—ইহার রস-গ্রহণের জন্য কবিতাগুলির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় থাকা দরকার।

'পৌষডার গীত' কবিতায় ভোজনবিলাসী ঈশ্বরচন্দ্র নিজেকে একেবারে অনাবৃত করিয়া মেলিয়া ধরিয়াছেন। দেশে দুর্ভিক্ষের জন্য অন্নাভাব, তার উপর কবির আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নয়। কবি আক্ষেপ করিয়া বলেন, "এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই জুটলো নাকো পুলি পিটে ॥" হতভাগ্য পেটুক কবি তাঁহার এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের করুণ কাহিনী চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"ঘরে গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা,
হাতে মাত্র দু'গাছা শাঁখা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে ॥
রুক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে,
কাছেতে দাঁড়ালে পরে
'ডাক্‌রা বুড়ো ন্যাকরা করিস্‌,'
ব'লে দেবে খ্যাংরা পিটে ॥"

এ-হেন গিন্নীর কাছে পিঠা-পুলি খাওয়াইবার আব্দার উৎসাহের সহিত সমর্থিত হইবে এমন আশা করা যায় না, তাই এবার 'পৌষ-পার্ব্বণ গেল সাদা। হ'ল নাকো বাউনি বাঁধা ॥' জ্ঞাতি-কুটুম্বদের আর্থিক অবস্থাও কবির-ই মত, তাই কোন উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াও সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কবিকে তাই ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়—

"যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে।

নানা মত গোড়ে তারা
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে ॥
মুখের পানে ছিলাম চেয়ে ;
দুখানা একখানা যাও না খেয়ে।
একটি বার এমন কথা
বল্লো না কেউ মুখটি ফুটে ॥"

এই সব দেখিয়া-শুনিয়া নিজ জাতিগৌরবের উপরও কবির বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে—

"হলে পরে মুচি হাড়ি
গিয়ে যত বাবুর বাড়ী
সাপুর সুপুর জুবড়ে দাড়ি
মেবে দিতাম পাৎড়া চেটে ॥"

উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেবলমাত্র পিঠা-পুলির জন্য হাড়ি-মুচির সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হওয়া সাধারণ শ্রেণীর ভোজনরসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিশ্চিতই শিখিয়াছেন উদরভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ড এবং তিনি-ই যখন তপ্‌সা মাছে তপস্বীর ভাব দেখিয়া বলেন, 'প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছা। ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা ॥' তখন আমরা বিস্মিত না হইয়া প্রথম শ্রেণীর ভোজনরসিকের উক্তি বলিয়া ইহাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করি।

যাহা হউক পিঠা-পুলির লোভে নগর পরিভ্রমণ করিয়াও কবি আশানুরূপ অভ্যর্থনা কোথাও পাইলেন না। কেবল এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে—

"পাতের এঁটো যাহা ছিল
একটি বামুন দিয়েছিল
ঘাঁটা ঘোঁটা কাঁটা চাটা
খেয়ে গেল বমি উঠে ॥"

'শাস্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী'তে প্রবেশ করিতে সাহসে কুলায় না ; কাহারও বাড়ী হইতে 'লুটেপুটে'ও আনা যায় না—'দেখতে পেলে চৌকীদারে, ধ'রে দিবে কারাগারে।' তাই কোন দিকে ভরসা না পাইয়া কবি অভিনব উপায় বাহির করিয়া সান্ত্বনা পান—

"নিমন্ত্রণে যাবে যারা,
আমার হ'য়ে খাবে তারা
মনকে আমি প্রবোধ দেবো
হাত বুলিয়ে তাদের পেটে ॥"

পিঠা-পুলির জন্য এইরূপ দুর্দ্দমনীয় লোভ, এইরূপ দুর্জ্জয় অভিযান-কল্পনা, উচ্চ-জাত্যাভিমানের প্রতি এইরূপ তীব্র অবজ্ঞা এবং দিন-মুজ্‌রি নগদা মুটের জীবনযাপনে এইরূপ চুম্বকীয় আকর্ষণ—এই সমস্তই পেটুক কবির অবস্থা-বিপর্য্যয়ের করুণ পটভূমিকায় এক অপরূপ মহিমা লাভ করিয়াছে। কবিতাটিকে ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে পরিগণিত করা যায়।

॥ ৭ ॥

স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা বোধ ঈশ্বরচন্দ্রের আধুনিকতার আর একটি লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে স্বাদেশিকতার স্ফুরণ বোধ হয় ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পর দেখা দিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করিয়া সুস্পষ্ট কোন ভাবাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আঞ্চলিক ভাবে কোথাও ইহার আভাস পাওয়া গেলেও বিদেশী ইংরাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষের ফলেই মাতৃভূমির সম্ভ্রম-গৌরব সম্পর্কে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে। এবং ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রথম ব্যাপকভাবে ইহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপ্রীতিকে এ যুগে যেন একটু অতিরঞ্জিত করিয়া দেখা হয় এবং সেই অতিরঞ্জনের ফলে তাঁহাকে দেশাত্ম-বোধের প্রথম উন্মেষক বলিয়াও ধরা হইয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রে এই গৌরব-আরোপ কতদূর সঙ্গত তাহা দেখা দরকার।

স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য্য যাহাই হউক, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার প্রকৃত বিরোধ ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তির সহিত নয়, ইংরাজের সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত। বিদেশীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া (কেবল আনুগত্য নয়, জয়গান গাহিয়া) দেশ-প্রীতির পরিচয় দেওয়া যায় কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। ইংরাজের শিক্ষা-সভ্যতার সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবল বিরোধের কথা তাঁহার সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্য্যায়ের কবিতা

গুলি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অবান্তর। এখানে ইংরাজের রাষ্ট্রানুগত্য ঈশ্বরচন্দ্র কেমন সহজ ও নির্ব্বিরোধে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা দেখা যাক্।

ইংরাজ বাংলা দেশের শাসনভার হস্তগত করিলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতব্যাপী অন্তর্বিদ্রোহ দমনকরিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে এই যুগের বিভিন্ন বিদ্রোহ যুদ্ধগুলি বর্ণিত হইয়াছে। কোন প্রকৃত দেশপ্রেমিক কবি যদি এই যুদ্ধগুলিকে তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কবিতাগুলির মধ্যে সুরের পার্থক্য দেখা যাইত। যে বীর সন্তানেরা মাতৃভূমিকে বণিকের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে; ঈশ্বরচন্দ্র যদি সত্যই দেশপ্রেমিক হইতেন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত কবি-শক্তি সেই দেশব্রতীদের জয়গাথা রচনায় নিঃশেষিত হইত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাহা করেন নাই। যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তিনি ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং ইংরাজ রক্তগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া যখন একটির পর একটি বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র তখন জয়োল্লাসে মেঘসন্দর্শনে উৎফুল্ল ময়ূরের মত নৃত্যচাপল্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

"রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাঁপ দেড়ে
গুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পরে নদী কূলে।
বুদ্ধিলোপ দাড়ী-গোঁফ সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে।
ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে॥

'দ্বিতীয়-যুদ্ধ' কবিতায় শিখদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছেন—

"ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত।
ডাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর॥
লাহোরের শিখ-সেনা শক্ত অতিশয়।
এখন আলস্য করা সমুচিত নয়॥"

'দিল্লীর যুদ্ধ' কবিতায় তিনি ভারতবাসীকে ব্রিটিশের জয়ে উল্লসিত হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন—

"ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়॥"

এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে চাটুকার ঈশ্বরচন্দ্রের ভাঁড়-নৃত্য ভবিষ্যৎ দেশবাসীর কাছে তাঁহার কলঙ্কিত রূপই উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। দেশাত্ম-বোধের আদর্শ স্থাপিত করিবার জন্য কবিকে বহু সময় কৃত্রিম আখ্যায়িকা সৃষ্টি করিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে জীবন্ত ঘটনা থাকা নত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় তাহার অপব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে দেশপ্রেমিক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে। সংরক্ষণশীল মনের দৃঢ় সংস্কারে যখন কম্পন লাগিয়াছে তখন ইংরাজের শিক্ষা-সভ্যতার উপর তিনি বিষোদ্গার করিয়াছেন, ইহা ছাড়া প্রকৃত দেশপ্রীতি ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল বলিয়া মনে হয় না।

॥ ৮ ॥

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাবলীর বিশ্লেষণমূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কোথায় কবির সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোভাবের প্রকাশ, কোথায় প্রাচীন কবি-গোষ্ঠী হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য সূচিত হইয়াছে, কোথায় তাঁহার কবিশক্তির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, কোথায় তাঁহার দুর্ব্বলতা, প্রসঙ্গক্রমে এগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। এইবার ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আলোচনা সমাপ্ত করা যাইবে। প্রশ্নটি এই—ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি যুগসমাপ্তির কবি বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধুনিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া ধরিতে হয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি যুগস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করা হয়, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মধ্যে তাহা হইলে প্রাচীন কাব্যধারার সমাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহা মানিয়া লইতে হয়। এখন দুইটি বিপরীত মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং যুক্তি-প্রতিষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

সমাজের এবং রাষ্ট্রের এক-একটি গুরুতর পরিবর্ত্তনকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্য-প্রবাহ যুগে যুগে নূতন পথে গতি পরিবর্ত্তন করে। এই গতি পরিবর্ত্তনে

সাহিত্যের ভাব ও রূপে যে নূতনত্বের স্পর্শ লাগে, সেই নূতনত্বের লক্ষণগুলি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সাহিত্য-ধারাকে একটি বিশেষ খণ্ডযুগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু সাহিত্যের কোন যুগ-বিভাগেই অলাচল• ভেদ-কল্পনা সম্ভব নয়; কারণ সাহিত্য জৈব-দেহের ন্যায় বিবর্ত্তনধর্ম্মানুসারী। মানবদেহে শৈশবের সহিত কৈশোরের এবং কৈশোরের সহিত যৌবনের মধ্যে যেমন একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে, আবার ইহার কোন একটি স্তরকেও যেমন স্বতন্ত্র করিয়া দেখা সম্ভব নয়, সাহিত্যের যুগ-বিভাগও অনেকখানি ঐরূপ। তাই ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তটিতে প্রবাহে একটা নূতন তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল, কোন্ শুভলক্ষণটিতে সাহিত্য প্রাচীনত্বের খোলস ত্যাগ করিয়া নূতন প্রাণ-শক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, ক্ষণকালের মধ্যে তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। আজ সাহিত্যের যে রূপটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে ঠিক আজিকার সৃষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, বহুদিনের পলিমাটিসঞ্চয় একত্র হইয়া আজিকার এই উর্ব্বর ক্ষেত্রের সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই নবযুগের সূত্রপাত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় বা রঙ্গলালের কবিতায়—তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। সাহিত্যে মিলনধর্ম্মী সৃষ্টি, বহুর সাধনা একত্রেই ইহার পুষ্টি, তাই কোন একজন কবি-সাহিত্যিককে কোন একটি বিশেষ যুগের স্রষ্টার কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। হয়ত কাহারও রচনায় ভাবীযুগের সম্ভাবনা থাকে বীজাকারে এবং সেই বীজ-ই পরবর্ত্তীকালের কবির মধ্যে যখন বিকশিত হইয়া উঠে, তখন সেই কবিকেই যুগস্রষ্টা আখ্যা দেওয়া হয়। তাই রঙ্গলালকে যদি আধুনিক যুগের স্রষ্টা বলি, তাহা হইলে ঈশ্বরচন্দ্রকে এই আধুনিক যুগের নকিব বলিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে নকিব না বলিয়া তাঁহাকেই যুগস্রষ্টা বলা যায় কিনা তাহা দেখা যাক।

প্রথমত, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবৎকাল পর্য্যন্তও (১৮১২-১৮৫৯) বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের বিশৃঙ্খল ও অব্যবস্থার যুগ। এই যুগ-সংকটকালে কোন গভীর-ভাবোদ্দীপক গঠনমূলক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। তখনও ভাবে নয়, ভঙ্গীর চমৎকারিত্বে পাঠকের চক্ষু ভুলাইবার দিকে প্রেরণা প্রবল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের উপাদান বিরল।

ঈশ্বরচন্দ্র সংঘর্ষ যুগের কবি। দুইটি বিরোধী সভ্যতার প্রাথমিক পরিচয় সংঘর্ষের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। বাংলা দেশেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রাচ্য সংস্কার-সভ্যতায় মিলন সংঘর্ষের মধ্যে; ইহাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত।

কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উগ্রতা যখন কিছুটা নম্র হইয়াছে, উচ্ছৃঙ্খলতা যখন দীর্ঘ পুনরাবৃত্তিতে মাদকতাহীন হইয়াছে এবং প্রাচ্য সভ্যতাও যখন নবজাগ্রত চেতনার আঘাতের সংস্কারের ভিত্তিভূমি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, সংঘর্ষের মধ্যেই যখন এই দুই সভ্যতা বৈরত্ব বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দ্দ্যে উভয়কে গ্রহণ করিয়াছে, তখনই এই বিরোধের মধ্যে মঙ্গল ও কল্যাণ, গঠন ও সৃষ্টির সূচনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু ইহা সময়-সাপেক্ষ। প্রাচ্যকে তাহার সংস্কার-বিশ্বাসের অচলায়তন হইতে বাহিরে আসিয়া নবচেতনার মুক্তধারায় মুক্তিস্নান করিতে হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্যকেও তাহার গতিকে মন্থর করিয়া প্রাচ্যের সহিত একটা সমন্বয়ের কথা ভাবিতে হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত এই সমন্বয়ের নির্দ্দেশ দেন নাই, পরন্তু নিজেকে একটি পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সভ্যতা-দ্বন্দ্বে একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীনযুগের সংরক্ষণশীল কবিদের পর্য্যায়েই পড়িবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যুগেরই সৃষ্টি, তিনি যুগস্রষ্টা নন। যে কবি যুগস্রষ্টা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব একটি দর্শন থাকে ; ইহা দ্বারাই তিনি প্রাচীন-যুগের কবিগোষ্ঠী হইতে আপন স্বাতন্ত্র্য সূচিত করিয়া নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় কোন 'message' নাই। তাঁহার মধ্যে আধুনিকতার যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ঐ যুগেরই লক্ষণ, ঈশ্বরচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। তাঁহার মানব প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা যায় তিনি প্রাচীনপন্থী সংরক্ষণশীল কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। যে কবি আধুনিক যুগের সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন করিবেন, তিনি নবীন ভাবধারাকেও অভ্যর্থনা করিয়া আনিবেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নবীন ভাবধারার মধ্যে সৃষ্টির অঙ্কুর দেখিতে পান নাই, তিনি ইহার মধ্যে ধ্বংসের বীজ দেখিয়াছেন। আধুনিক যুগ সম্পর্কে যে কবির এইরূপ মনোভাব, যে-কবি আধুনিক ভাবধারার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া প্রাচীন ভগ্ন দেউলের মধ্যে দেবী-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহশীল, তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কোচ হয়। তাই ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক যুগের স্রষ্টা নন, আধুনিক যুগের নকিব।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

সাহিত্য-সমালোচকের আদর্শ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হয় যে সমালোচকের রাজকর কি শ্রেষ্ঠ কবির স্তবগানেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইবে; অথবা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহাদের আসন সঙ্কীর্ণ, কবিসমাজে যাঁহারা মধ্যবিত্ত, তাঁহাদের কবিকৃতি বিশ্লেষণের জন্যও কিছুটা অবশিষ্ট থাকিবে? এই প্রশ্নটিকেই বিপরীতভাবে উপস্থাপিত করিলে দাঁড়াইবে যে সাহিত্য-বিচারে রসের তুলাদণ্ডই কি একমাত্র আদর্শ এবং সেই আদর্শ অনুসারে যে কবির বচনা রসের ওজনে কিছু হাল্কা তাঁহাব উপব সম্মার্জ্জনী নিক্ষেপ করাই কি সমালোচকের ধর্ম্ম? কাব্যের মূল লক্ষ্য রস—ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাধারণভাবে মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত রসিকের জন্য; সমালোচকের জন্য নয়। সাহিত্য-রসিক রসের কষ্টিপাথর ঠেকাইয়া রসোত্তীর্ণ কাব্যগুলিকে বাছাই করিয়া দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচকের দায়িত্ব আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী। সাহিত্য-সমালোচক রসিক হইবেন, কিন্তু রসবিলাসী হইলে চলিবে না। চিকিৎসকের কাছে যেমন মানুষের আকৃতিগত সৌন্দর্য্যই প্রধান নয়, তাহাকে যেমন মানব-দেহের অভ্যন্তরস্থিত জটিল দেহ-তত্ত্বের রহস্য অনুসন্ধান করিতে হয়, ইহার প্রতিটি শিরা-উপশিরার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সজ্ঞান থাকিতে হয়, সাহিত্য-সমালোচককে তেমনি সাহিত্যরসিকের ন্যায় কেবল রস-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ থাকিলে চলে না; তাঁহাকে একদিকে যেমন রসোত্তীর্ণ রচনার প্রতিটি স্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়, তেমনি আর একদিকে রসের পরীক্ষায় যে রচনা পাসমার্ক পায় নাই, তেমন রচনাকেও যত্ন-সহানুভূতির সহিত বিশ্লেষণ করিয়া মূল্য ও শ্রেণী-বিচার করিতে হয়। সমালোচকের উদার দৃষ্টিতে কোন রচনাই তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় নয়।

সাহিত্য-সমালোচনার এই উদার নীতি বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেণীর সমালোচকের দ্বারা সমর্থিত হয় বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী প্রাচীন কবির রচনা-বিশ্লেষণ একমাত্র সাহিত্যের ইতিহাসে ভিন্ন অন্য কোন সমালোচনা গ্রন্থে সাধারণত গৃহীত হইতে দেখা যায় না। কাহারও কৃপণ দৃষ্টি ইঁহাদের উপর পড়িলেও তাঁহাদের সমালোচনায় শ্রদ্ধাহীন

উপেক্ষার ভাব-ই প্রবল হইয়া উঠে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীর একজন কবি, যিনি সমালোচকের নিকট হইতে কোমল হৃদয়ভাবের পরিবর্তে ধিক্কার ও উপহাস-ই বেশি পাইয়াছেন। একজন রস-বিলাসী সমালোচক রঙ্গলালের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, "ইংরাজী ছাঁচে ঢালাই না করিয়া, অন্য জাতে জাত না দিয়া, বাংলা কবিতার চিরন্তন রূপটি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া উৎকৃষ্ট কাব্যরচনা করা যায়—ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় আপনার কৃতিত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।"

রঙ্গলালের কবি-কৃতিত্ব যতই নগণ্য হউক, এইরূপ শ্রদ্ধাহীন উক্তি কবির উপর সমালোচকের ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা ও বিরাগের আভাস-ই সূচিত করে। উপরি-উদ্ধৃত এই উক্তিটির মধ্যে কবির রচনার যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ও আপন কৃতিত্ব-গৌরব-মুগ্ধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা কোন কবির পক্ষে দূষ্য ও গৌরবহানিকর হইতে পারে, ইহা কোন দেশের অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা নীতিতেও স্বীকৃত হইবে না। কবি যাহা দিতে পারেন নাই তাহার হিসাব লওয়া আর মরা ঘোড়ার উপর চাবুক মারা একই কাজ। রঙ্গলাল কেন মধুসূদন হইতে পারিলেন না ইহার সদুত্তর রঙ্গলালের নিকট হইতে আশা করা যায় না। ইংরাজীতে শক্তিশালী কবিকেও প্রথম আত্মপ্রকাশকালে সমসাময়িক সমালোচকের রক্তচক্ষু সহ্য করিতে হয়, কিন্তু শত বৎসরের প্রাচীন কবির এইরূপ শ্রদ্ধাহীন সমালোচনা একমাত্র বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে দেখা গেল।

এই সমালোচকের বিশ্লেষণ-ভঙ্গীর উন্নাসিকতা দেখিয়া মনে হয়, কবি হিসাবে রঙ্গলাল আত্মপ্রকাশ না করিলেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত উপকার সাধিত হইত। তিনি 'মৃৎপিণ্ড', তাঁহার উপর সাময়িক শক্তিশালী কবির প্রতিবিম্ব পড়ে নাই। তিনি 'প্রতারক', "নবীন ভাবধারার সহিত নামমাত্র সন্ধিস্থাপন করিয়া তিনি প্রাচীনকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন,...Scott, Byron প্রভৃতি কবিদিগের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তকে কার্যতঃ কাব্যগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।" এই আলোচনা হইতে একটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে যে রঙ্গলালের কোথায়ও কোন অসাধারণত্ব নাই ; তিনি নিতান্তই সাধারণ পর্য্যায়ের কবি। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে রঙ্গলালের ন্যায় সাধারণ শ্রেণীর কবির সংখ্যাই বেশি ; মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ বা সেক্সপীয়ার, শেলি, কীটসের মত

কবি সচরাচর দেখা যায় না—কোটিকে গোটিক হয়। এবং সাধারণ কবির তুচ্ছ রচনা জমিয়া জমিয়া যে পলিমাটি সৃষ্টি করে, সেই উর্ব্বর জমিতেই অসাধারণ কবির অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয়। উষর মরুভূমিতে যেমন গাছ জন্মিতে পারে না তেমনি সাধারণ কবির দীর্ঘসঞ্চিত রচনার সার না পাইলে শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয় না। তাই কাব্য-রসিক, যিনি কেবল কাব্যের বাহ্যিক শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন, তিনি দুর্ব্বল কবিদের তুচ্ছ রচনাগুলির উপর বিরূপ থাকিতে পারেন ; কিন্তু সাহিত্য-সমালোচক, যিনি কেবল বাহ্যিক শোভা নয়, মূলের রহস্য সন্ধান করেন, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সর্ব্বশ্রেণীর কবিকেই সাহিত্যের আঙ্গিনায় সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে হয়।

॥ ২ ॥

নিরপেক্ষ সমালোচকের ধর্ম্মানুযায়ী রঙ্গলালকে যেমন এইরূপ উপেক্ষা দেখানো উচিত নয়, তেমনি অপরপক্ষে তিনি সাধারণ শ্রেণীর কবি হইলেও তাঁহার সাধারণত্বকেও ঠিক এতখানি লঘু করিয়া দেখা ঠিক নয়। কবি হিসেবে তাঁহার স্থান হয়ত ঈশ্বর গুপ্তেরও নীচে, তথাপ আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে তাঁহার একখানি স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে বাংলাসাহিত্যের যে বিশেষ যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, সে-যুগের প্রত্যক্ষ স্রষ্টা বা প্রবর্ত্তকরূপে কোন একজন কবির নামোল্লেখ করা ঠিক হইবে না। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরা এত সামান্যকালের ব্যবধানের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন যে মনে হয়, দীর্ঘকালসঞ্চিত প্রাণশক্তি যেন আকস্মিকভাবে অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া আতসবাজীর মত নিমেষের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই যুগের উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলির প্রকাশ-কাল লক্ষ্য করিলেই এই কথা সহজে প্রমাণিত হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু ১৮৫৯।

১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)
(ক) পদ্মিনী-উপাখ্যান—১৮৫৮ (খ) কর্ম্মদেবী—১৮৬২ (গ) শূর-সুন্দরী—১৮৬৮ (ঘ) কাঞ্চী কাবেরী—১৮৭৯।

২। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

(ক) তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—১৮৫৯ (খ) মেঘনাদবধ কাব্য—১৮৬১।

(গ) ব্রজাঙ্গনা-কাব্য—১৮৬১ (ঘ) বীরাঙ্গনা-কাব্য—১৮৬২।

৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

(ক) চিন্তাতরঙ্গিণী—১৮৬১ (খ) বীরবাহু কাব্য—১৮৬৪ (গ) বৃত্র-সংহার—১৮৭৫-৭৮ (ঘ) আশাকানন—১৮৭৬ (ঙ) ছায়াময়ী—১৮৮০ (চ) দশমহাবিদ্যা—১৮৮২।

৪। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

(ক) অবকাশ রঞ্জিনী—১৮৭১ (খ) পলাশীর যুদ্ধ—১৮৭৫ (গ) রঙ্গমতী—১৮৮০ (ঘ) রৈবতক—১৮৮৬ (ঙ) কুরুক্ষেত্র—১৮৯৩ (চ) প্রভাস—১৮৯৬।

খ্রীষ্টোত্তর ১৮৫৮ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের পর্ব্বকে বাঙ্গালা কাব্যের বীরযুগ (Heroic age) আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে ধরা পড়িবে, এই যুগের প্রথম কবি রঙ্গলালের শেষ কাব্য প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পূর্ব্বে এই যুগের শেষ কবি নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্রের এবং মধুসূদনের কাব্যগুলিও প্রায় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তবে, হেমচন্দ্রের কাব্য সংখ্যায় বেশি বলিয়া কালব্যাপ্তিও বেশি।

এই বিস্তৃত ও সুরম্য কাব্য-কাননের বীজ যে ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলালের কবিতায় নিহিত ছিল—এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে না। নবীনযুগের কাব্য-ধারার সহিত রঙ্গলালের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন, "তিনি অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন—ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত এবং ইংরাজ কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজী কাব্যরীতি ও ইংরাজী কাব্যের আদর্শকে তিনি বিজাতীয় কাব্য বলিয়া মনে করিতেন—বাংলা কাব্যের পুরাতন আদর্শটিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।" আধুনিক কবি হিসাবে তাঁহাকে একটা স্বতন্ত্র আসন দেওয়া যায় না। ঈশ্বর গুপ্তকে প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে; তাঁহার কবিতাবলীর সাক্ষ্যেও এ কথা প্রমাণিত যে সময়ের দিক দিয়া তিনি যতখানি এ-কালীন, মানসিকতার দিক হইতে তিনি ততখানি সে-কালীন। সুতরাং সমস্যা দাঁড়ায় রঙ্গলালকে লইয়া। নবীনযুগের কবিকুলে তাঁহার ঠাঁই হইতেছে না, আবার প্রাচীন কাব্যধারার

সিংহদ্বার ত ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—তবে রঙ্গলালের স্থান কোন্ যুগে? প্রাচীন যুগের পাদপূরণ যে ঈশ্বর গুপ্তই করিয়াছেন সে সম্পর্কে কোন দ্বিধা নাই, সুতরাং ঐ যুগের অনুবৃত্তি রঙ্গলাল পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। রঙ্গলালকে নবীন যুগেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তাঁহার মধ্যে এমন কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যাহা দ্বারা তাঁহাকে কেবলমাত্র নবীন যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যেই যে এক পঙ্‌ক্তিতে আসন দেওয়া যায় তাহা নয়, তাঁহার উপর যুগের স্রষ্টার আংশিক কৃতিত্ব-গৌরবও আরোপ করা যায়।

এইবার সেই লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাইবে। তবে রঙ্গলালের উপর নবীন কাব্যধারার স্রষ্টার গৌরব অর্পণ করিতে হইলে তাঁহার প্রথম কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যানকেই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ দ্বিতীয় কাব্য কর্ম্মদেবী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মধুসূদনের কাছে তিনি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন।

॥ ৩ ॥

উনবিংশ শতকে বাংলার রাষ্ট্রিক-সামাজিক গোলযোগ কিছু প্রশমিত হইবার পর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা দেশের মধ্যে যে নূতন শক্তি ও প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহার সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছিল গঠনমূলক কার্য্যে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধকে সে-বিচারে গঠনযুগ আখ্যা দেওয়া যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গঠন-প্রচেষ্টার নিদর্শন রহিয়াছে গদ্য-চর্চ্চায়। ১৮০০ হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তকে বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য কোন কবির আবির্ভাব এই যুগে ঘটে নাই। এই যুগের যাঁহারা শক্তিশালী লেখক তাঁহারা সকলেই গদ্য রচনায় তাঁহাদের সামগ্রিক শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নাম করা যায়। পদ্যের খাতে যে জাতীয় প্রাণশক্তির অপব্যয় ঘটিতেছিল, ইঁহারা সকলেই যেন প্রয়োজনমূলক গদ্যের খাতে সেই প্রাণশক্তিকে প্রবাহিত করিয়া দেশের চিত্তভূমিকে রসসিক্ত নয়, জ্ঞানসিক্ত করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত এই সাধারণ নিয়মের মধ্যে না পড়িলেও তাঁহাকে ব্যতিক্রম বলা যায় না। কারণ, কবি হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের গোত্র-সম্পর্ক পূর্ব্ববর্তী ভারতচন্দ্র

বা পরবর্ত্তী রঙ্গলালের সহিত নয়; তিনি নেপথ্যলোক-বাসী কবিওয়ালা সম্প্রদায়েরই উত্তরসাধক। সেই কারণেই ঈশ্বর গুপ্তকে স্বভাব-কবিদের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ভালো হউক বা মন্দ হউক, ভারতচন্দ্র-রঙ্গলালের কবিতায় শিল্পসৃষ্টির একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রতিভা সৃষ্টিধর্ম্মী নয়। কবি হিসাবে তাঁহার স্থান রঙ্গলালের উপরে, তথাপি রঙ্গলালের কবিতায় সৃষ্টির যে সচেষ্টতা আছে, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় তাহা নাই। তাই তাঁহাকে ভিন্ন জাতের কবি বলিয়া ধরিতে হইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের নাম স্মরণ রাখিয়াও তাই বলা যায়, যে বাংলা সাহিত্যের ধারাকে রঙ্গলাল-ই প্রথম গদ্যের নীরস ভূমি হইতে বাঁক ফিরাইয়া আবার পদ্যের ভূমিতে লইয়া আসিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পর হইতে যে কাব্যভূমি পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রঙ্গলাল সেই দীর্ঘ অব্যবহারে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সৃষ্টির অঙ্কুর বপন করিয়াছেন। সে কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কর্ম্মদেবী কাব্যের ভূমিকায় কবি স্বয়ং এই কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন—"এক্ষণে পরম আহ্লাদ-সহকারে বক্তব্য এই যে, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য-কুসুম (পদ্মিনী-উপাখ্যান) বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসরত্রয়ের মধ্যে আমাদের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু, যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাই সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা সালঙ্কৃতা এবং বহুলীকৃতকরণার্থ কবিতার ন্যায় গদ্যের উপযোগিতা নহে, অতএব সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎ-কবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

দ্বিতীয়ত, কবি যে 'বিশুদ্ধ প্রণালীতে' 'এক অভিনব কাব্য' প্রণয়ন করিয়াছেন সে কথা পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের ভূমিকায় কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেদিক দিয়াও নবীন যুগের কাব্যধারা প্রবর্ত্তনের গুরুত্ব রঙ্গলালকেও কিছু দিতে হয়।

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রঙ্গলাল যে গদ্যের কঠিন ভূ-সংস্থানের মধ্যে সরল কাব্যতরুর বীজ উপ্ত করিলেন, ইহার পিছনে তাঁহার কি মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখা

দরকার। রঙ্গলালের কাব্যগুলি পড়িয়া অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে কল্পনাদেবীর প্রসন্ন দক্ষিণহস্তের আশীর্ব্বাদ তাঁহার ললাট স্পর্শ করে নাই। আক্ষেপ করিয়া তাই তিনি বলিয়াছেন—

"কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিণী॥"

রঙ্গলালের কাব্য রচনার প্রেরণাও ঠিক বিশুদ্ধ সৃষ্টিপ্রেরণা নয়। কাব্য-রচনার উৎস আদিকবি বাল্মীকি যে ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তরুণ গরুড়-সম সে মহৎ ক্ষুধার আবেগ কবিকে কাব্যরচনায় উজ্জীবিত করিয়া তোলে, সে দৈব-প্রেরণা হয়ত সাধারণ কবিদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু সৃষ্টির একটা প্রচণ্ড তাগিদ যে অতি সাধারণ শ্রেণীর কবিদেরও অস্থির করিয়া তোলে তাহা অস্বীকার করা যায় না। রঙ্গলালের কোন কাব্য পড়িয়া এ ধারণা জন্মে না যে প্রবল অনুভূতি প্রকাশের বেদনা কোথাও স্ফুটনোন্মুখ কোরকের ন্যায় কবিকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছে। রঙ্গলালের মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নাই, কবি-কল্পনারও অভাব, এইরূপ হৃদয়ভাবহীন সাধারণ মানুষের কাব্যরচনার দিকে কেন আগ্রহ জন্মিল তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের ভূমিকায় কবি তাঁহার কাব্যরচনার কারণ সম্পর্কে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে ধারণা হয়, সৃষ্টির তাগিদ নয়, প্রকাশের বেদনা নয়, দৈব প্রেরণা নয়, রঙ্গলালের কাব্যরচনার প্রেরণা স্বতন্ত্র। ঊনবিংশ শতকে জাতীয় জাগরণের যে সাড়া পড়িয়াছিল, সেই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ-ই রঙ্গলালের কাব্যরচনার প্রধান প্রেরণাস্বরূপ কাজ করিয়াছে। দেশীয় ভাষাকে উন্নত করিতে হইবে, দেশীয় সাহিত্যকে বহু বর্ণাভরণে ভূষিত করিতে হইবে, এই আদর্শ ও প্রেরণাই রঙ্গলালকে সাহিত্যচর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতকের সংগঠন-যজ্ঞে কাব্যধারা অবহেলিত হইয়াছিল, কিন্তু জাতির সামগ্রিক পরিচয়ে কাব্যকে যে উপেক্ষা করা যায় না, জাতীয় মহিমা সম্বন্ধে উন্মুখ সচেতনতার যুগে কাব্যকেও যে অন্তেবাসী করিয়া রাখা চলে না, জাতির গৌরব-যুগে কাব্যেরও স্বর্ণযুগ না আসিলে যে এই গৌরব-যুগের অঙ্গহানি হয়, রঙ্গলাল তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই সংগঠন-পরিকল্পনায় কাব্যশাখা উন্নয়নের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলালের এই প্রেরণা বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা নয়: এই কারণে তাঁহার কাব্যগুলি দেশাত্মবোধের উচ্ছ্বাসবহুল বক্তৃতার সমষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত কবির কাব্যে দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ যেমন কাব্যের চরিত্রের

মর্ম্মমূল হইতে উৎসারিত হইয়া তাহার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে, রঙ্গলালের সৃষ্ট কোন চরিত্রে তাহা দেখা যায় না। তাহা দেখাইতে জন্মগত শিল্প-অধিকার থাকা দরকার—রঙ্গলালের মধ্যে তাহার অভাব। রঙ্গলালের কাব্যমালা তাই বাংলাসাহিত্যের স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। কিন্তু তিনি যে প্রেরণা-নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, যে জনশূন্য পথে প্রথম পদচারণ করিয়াছিলেন, সে পথ পরবর্ত্তীকালে বহু কৃতী-পথিকের পদচিহ্নে ধন্য হইয়াছে। রঙ্গলালের কাব্যের কোন প্রভাব পরবর্ত্তী বাংলাসাহিত্যের উপর পড়ে নাই, ইহা আংশিক সত্য। মেঘনাদ-বধের উপর পদ্মিনী-উপাখ্যানের প্রভাব বিচার করিতে গেলে সে চেষ্টা প্রদীপ জ্বালিয়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্য দেখাইবার ন্যায় হাস্যকর হইবে, কিন্তু রঙ্গলাল যে প্রেরণার বীজ বপন করিয়াছিলেন, মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যে সেই প্রেরণায়ই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন (একটু ঘুরাইয়া বলিলেই বোধ হয় ভালো হয়, মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যধারা যে প্রেরণা-প্রসূত, রঙ্গলালের মধ্যে সেই প্রেরণা প্রথম স্ফুরিত হইয়াছে। মহাকাব্য রচনা দ্বারাই ভাষার শক্তির অগ্নি-পরীক্ষা হয়, মধুসূদন সেই উদ্দেশ্যেই মহাকাব্য রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন) এ কথা অস্বীকার করিলে অন্যায় হইবে। পঙ্কে-ই পঙ্কজ জন্মে, পঙ্কজের মূল্যের সেই পঙ্ককে অস্বীকার করিলে পঙ্কজ আকাশ-কুসুম হইয়া উঠে।

আবার রঙ্গলাল সাহিত্যের ধারাকে যে গদ্য হইতে পদ্যের দিকে মোড় ফিরাইলেন, সেইটিই বড় কথা নয়। মোড় ফিরাইয়া আবার বাংলা কাব্যকে কালিন্দীতীরের লীলাকুঞ্জে বা বিদ্যাসুন্দরের গোপন সুড়ঙ্গের দিকে প্রবাহিত করেন নাই, মহিমাজ্ঞাপক অতীত ইতিহাসের সিংহদ্বারের দিকে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহাতে রঙ্গলালের যে কৃতিত্ব, সে কৃতিত্ব যে সাহিত্য-সমালোচক লঘু করিয়া দেখেন সাহিত্য-সমালোচনার মূলনীতি হইতে তিনি ভ্রষ্ট।

মধুসূদনের পথ-প্রদর্শক রঙ্গলাল; ইহা সহজে স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বাংলাসাহিত্যের বীরযুগ (Heroic age) তো কেবলমাত্র মধুসূদনকে লইয়া নয়। তা ছাড়া মধুসূদনকে বা রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যগুলির সহিত হয়ত বিহারীলালের সাদৃশ্য দেখানো যাইতে পারে, কিন্তু মধুসূদনের কাব্যমালা সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যের উর্দ্ধে। মধুসূদন এমন-ই একটি উল্কা, যাঁহার সহিত পূর্ব্ব ও পশ্চাতের কোন যোগ নাই। বাংলাসাহিত্যের ভূগোলে মধুসূদনের স্থান নির্দ্দেশ করা খুবই শক্ত। সুতরাং মধুসূদন এই

বীরযুগের প্রধান কবি হইলেও গোত্র সম্পর্কে তিনি এ-যুগের অন্যান্য কবি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই যদি হয় তাহা হইলে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে যোগসূত্রটি খুব দুর্লক্ষ্য হইবে না এবং এই যুগের প্রবর্ত্তন হিসাবে রঙ্গলালের নাম করিতেও বিশেষ সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা থাকিবে না।

এইবার পদ্মিনী-উপাখ্যানকাব্যে রঙ্গলালের কবি-ভাবনার নূতনত্ব কোথায় সে লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১॥ রঙ্গলাল বাংলা কাব্যকে আদি-রস হইতে মুক্ত করিয়াছেন। রঙ্গলাল তাঁহার "বাংলাসাহিত্য বিষয়ক" প্রবন্ধ নামক পুস্তিকায় অবশ্য প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে বাংলাসাহিত্য কোনদিন আদি-রসের পঙ্কিলতায় মগ্ন ছিল না। সে তুলনায় ইংরাজী-সাহিত্য দেহবিলাসের পরিচয়মুখর। কিন্তু সে হইল তর্কের কথা বা তুলনামূলক বিচার; সাধারণভাবে নিরাসক্ত চিত্তে বিচার করিতে গেলে ভারতচন্দ্রকে খুব উন্নত নৈতিক সমাজের কবি বলিয়া সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। ভারতচন্দ্রের পর হইতে রঙ্গলাল পর্য্যন্ত এই যুগটিতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবি সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল— তাঁহাদের রচনায়ও খুব সুরুচির পরিচয় ছিল না; থাকিতে পারেও না। সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙ্গন-যুগে নৈতিক ও সামাজিক বন্ধন যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন রুচি-বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী এবং সাহিত্যেও তাহার প্রভাব খুবই প্রত্যাশিত। শুধু বাংলাদেশে নয়, সব দেশেই ইহা হইয়া থাকে। বাংলাসাহিত্যে ইহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হইয়া সংগঠন যুগ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। এই যুগ সম্পর্কে একজন মন্তব্য করিয়াছেন—"প্রভাকরের"সম্পাদক এবং 'ভাস্করের' সম্পাদক নিভাঁজ খেউড় গাইতেন; ধাপার মাঠে ছাড়া আর কুত্রাপি ঐ সকল লেখার জায়গা হইতে পারে না। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টচায্যি যে 'রসরাজ' রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপাঠ্য। কিন্তু সে সময়ে ধনীর আসরে, বিষয়ী লোকের বৈঠকখানায় এই সকল রচনা পঠিত হইত। বিকৃত-রুচি সমাজের মধ্যে এই সকল রচনা উপভোগ্য হইয়াছিল॥" (পুরাতন প্রসঙ্গ)

এ অবস্থায় প্রকৃতই সাহিত্যের মধ্য দিয়া নীতি-রুচির রাশ একটু শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিবার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রঙ্গলাল যে তাঁহার গুরু-নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর না হইয়া সজ্ঞানে অন্য পথে পদচারণা করিয়াছিলেন, বাংলাসাহিত্যের পক্ষে তাহা কল্যাণের হইয়াছিল।

২॥ রঙ্গলাল কাব্যে দেশ-প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রঙ্গলালের

পূর্ব্ববর্তী 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—কবি ঈশ্বরচন্দ্রের এই লাইনটিকে ভিত্তি করিয়া বলা হইয়া থাকে, তিনি দেশ-প্রেমের প্রথম ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সমস্ত কবিতা মনোযোগ দিয়া পড়িলে এই ধারণা জন্মিবে যে তাঁহার জাতীয়তাবোধ সমাজ ও নীতি-গত। ইংরাজ শাসনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সমাজে কুরুচি ও ব্যভিচারের উপর তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন; ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত বিরোধ রাষ্ট্র-শাসক ইংরাজদের সহিত নয়, ইংরাজ-অনুকারী বিভ্রান্ত বাঙালীর সহিত। পরাধীনতার গ্লানি ঈশ্বরচন্দ্রকে স্পর্শ করে নাই, তাঁহার কবিতায়ও প্রকাশ পায় নাই। পরন্তু তিনি ইংরাজ রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য বিবিধ বিদ্রোহ-যুদ্ধে দেশবাসীকে ইংরাজের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। রঙ্গলালের কবিতাতেই একদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতির মর্ম্মান্তিক লজ্জা আর একদিকে স্বাধীনতার মহিমা প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' যতই উচ্ছ্বাসবহুল হউক, কাব্যে ইহার মূল্য যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, ইঁহার মধ্যে বাঙালীর মর্ম্মের মন্ত্র যে প্রথম বাণীরূপ পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩। প্রাচীন যুগের বীরত্ব ও ঐতিহ্য-জ্ঞাপক ইতিকথাকে কাব্যের কথা-বস্তু রূপে গ্রহণ করিয়া রঙ্গলাল বাংলাসাহিত্যের একটা নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। প্রাচীন-অতীতের গৌরবকাহিনী একদিকে যেমন সহজেই পাঠককে বিমোহিত করিয়া জাতীয়তাবোধে প্রেরণা দেয়, তেমনি অতীতের ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত এই কাহিনীগুলি এক অপরূপ রোমান্‌স্-রস পরিবেশন করিয়া চিত্তকে রসাবিষ্ট করে। প্রাচীনযুগের সেই বিরাট হর্ম্ম্যের অলিন্দে যে হাসি-কান্নার তুফান, যে শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রকাশ, যে ছলনা-চক্রান্তের কূটচক্রজাল, যে বিভ্রম, ভোগাকাঙ্ক্ষা ও দেহবিলাস—ইহার সমস্তই কবির তুলির এক-একটি টানে কালের মৌন যবনিকা অপসারিত করিয়া পাঠকের হৃদয়তীর্থে ঘনীভূত হয়। রঙ্গলাল বাংলাসাহিত্যে যে বিচিত্র রোমান্‌স্-রসের উৎসমুখ অনাবৃত করিয়া দিলেন, পরবর্ত্তী যুগে শক্তিশালী শিল্পীর রচনায় তাহা সার্থকভাবে উৎসারিত হইয়াছে।

৪॥ মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাহিনীগুলিতে যুগোপযোগী ব্যঞ্জনা আরোপ করিয়া, প্রাচীন কাহিনীর চরিত্রগুলিকে নবীন ভাবধারার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যে কাব্যরচনা করিয়াছেন তাহার নির্দ্দেশও রঙ্গলালের কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে।

৫॥ রঙ্গলালের অপর কৃতিত্ব অলৌকিকত্ব বর্জ্জন করিয়া বাংলা কাব্যের প্রতি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী যুবকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার প্রথম প্রভাব বাঙালীর মনে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। এই যুক্তি-প্রধান মনোভাবের জন্য প্রাচীন ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রতি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিতদের বিরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রাচীন সাহিত্য মাত্রই ধর্ম্মমূলক সাহিত্য এবং ধর্ম্মপ্রধান সাহিত্য অর্থে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ। এইজন্যই দেশীয় ধর্ম্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় সাহিত্যের প্রতিও পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত জনগণের বিতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। রঙ্গলাল বাংলাসাহিত্যের ধর্ম্মমূলক কাহিনী বর্জ্জন করিয়া ঐতিহাসিক কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। (কাব্যে অলৌকিকত্ব বর্জ্জন অর্থে রঙ্গলাল দেব-প্রাধান্য-মূলক কাহিনী বর্জ্জন বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, নতুবা তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কাব্যেই কিছু কিছু অলৌকিকত্বের স্পর্শ আছে। ভক্তিভাবও যে নাই তাহা নয়, তবে গৌণ।)

প্রধানত এই কয়েকটি কারণেই রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যানের অভিনবত্ব দাবী করিয়াছিলেন। তবে রঙ্গলালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয়তা এই লক্ষণগুলির মধ্যে নয়। রঙ্গলালের শেষ কাব্য 'কাঞ্চী-কাবেরী'তে সে শক্তির স্ফুরণ দেখা গিয়াছে। সে হইল—একটি দেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও পৌরাণিক সত্তাকে কাব্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার দুর্ল্লভ ক্ষমতা। এই শ্রেণীর কাব্য বাংলাসাহিত্যে পূর্ব্বে বা পরে আর রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সে বিচারে কাঞ্চী-কাবেরীর অনন্যসাধারণত্ব স্বীকৃত হইতে পারে।

এইবার আখ্যায়িকা-কবি হিসাবে রঙ্গলালের কৃতিত্ব কতখানি তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার। সে বিচারে পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী ও কাঞ্চী-কাবেরী—এই প্রধান চারিখানি কাব্যের স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

রঙ্গলালের প্রথম কাব্য পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা-সাহিত্যে রঙ্গলালের যাহা কিছু খ্যাতি তাহা মূলতঃ এই কাব্যখানির জন্য। কবির নামের সহিত এই কাব্যখানি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং পদ্মিনী-উপাখ্যানকে রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু কাব্য হিসাবে কাঞ্চী-কাবেরী-ই রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ রচনা, সে কাব্যখানির সহিত সাধারণ পাঠকের পরিচয় খুবই অল্প।

পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের মূল আখ্যানভাগ টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন—ইহাই পদ্মিনী-উপাখ্যানের মূল কথা-বস্তু। কিন্তু ইহার ঠিক কোন্ অংশটি আখ্যায়িকা-কাব্যের নাতিবৃহৎ পরিসরে সংহত করিয়া কবি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংশয় রহিয়া যায়। পদ্মিনীর সতীত্ব ও বীরত্ব-গরিমা এবং আলাউদ্দীনের চিতোর-জয় ও সেই উপলক্ষে রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য্য-আত্মত্যাগের উজ্জ্বল বর্ণনা—এই দুইটি বিষয়ই যথাক্রমে কাব্যের প্রথমাংশে ও শেষাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হয়ত মূলসূত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিয়া পদ্মিনী এই দুইটি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি সম্পর্ক-বন্ধন স্থাপিত করিয়াছে, এবং রাজপুত জাতির বীরত্ব ও স্বাদেশিকতা বর্ণনার ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে এই খণ্ডপ্রসঙ্গ দুইটিও বিশেষ তাৎপর্য্য-মণ্ডিত হইয়া কাব্যের অচ্ছেদ্য অংশরূপে মূল কথা-বস্তুর সহিত দানা বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু কাব্যের ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-বিশ্লেষণকে সূক্ষ্মভাবে অনুসরণ করিলে এ ধারণা জন্মিবে না যে এইরূপ কোন ব্যাপক কাব্য-উদ্দেশ্য কবির মনে ছিল। তথাপি যদি মানিয়া লওয়া হয় যে একটি সাধারণ ঘটনার মুকুরে তিনি সমগ্র রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্য্য ও স্বদেশপ্রেমকে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, কবি সে কার্য্যে সফল হইতে পারেন নাই। কাব্যের প্রথমাংশে সমগ্র রাজপুত জাতির কোন পরিচয় আছে বলিয়া মনে

হয় না ; পদ্মিনীর আচার-ব্যবহার, কথোপকথন যে কোন উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপনের অনুকূল বা রাজপুত জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার পক্ষে উপযোগী, এমন মনে করিবার হেতু নাই। কাব্যের শেষাংশে রাজপুত সৈন্যদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র আছে বটে, কিন্তু কোন্ মহৎ আদর্শের প্রেরণা যে এই সৈন্যদের রণোল্লাসে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, সমগ্র যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে সেই আদর্শ ক্ষীণভাবেও উপস্থিত না থাকায় এই যুদ্ধ-বর্ণনা কোন জাতীয়-যুদ্ধের প্রতীক না হইয়া সাধারণ যুদ্ধের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে রাজপুত জাতির দেশপ্রেমের কোন আদর্শ-ই নিষ্কাশিত করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সমগ্র রাজপুত জাতি কবি-ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। পদ্মিনী-উপাখ্যানের মূল আখ্যানাংশের ফাঁকে ফাঁকে রাজপুত সৈন্যের যুদ্ধ-বর্ণনার প্রসঙ্গে কবি দেশ-প্রেমের বাণী ঘোষণা করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে কোন স্থির লক্ষ্য না থাকায় মূল কাহিনী দুইটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আখ্যায়িকা-কাব্যে কাহিনীর বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতাও মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া ফেলে। এই শ্রেণীর কাব্যের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি কবিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেটি হইল—কাহিনীর প্রতি পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্য্যন্ত উদ্দীপ্ত করিয়া রাখা। এই কারণে কাহিনী-কাব্যের কবি মূল ঘটনার সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত এইরূপ আরও এক বা একাধিক উপকাহিনী সৃষ্টি করিয়া আখ্যানবস্তুর জটিলতা বাড়াইয়া কাহিনীর প্রতি পাঠকের আগ্রহ বাড়াইয়া তোলেন। একই কাহিনীর দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি বড় একঘেয়ে লাগে, উহা আর পাঠকের চেতনায় আঘাত করে না, তাই পাঠকের চেতনা সজাগ রাখিবার জন্যই সাধারণত উপকাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। সে বিচারে ইংরাজী-সাহিত্যের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলির চমৎকারিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রঙ্গলাল সেদিক দিয়া কোন কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন না। পদ্মিনী-উপাখ্যানের মূল কাহিনীর পরিপোষক কোন উপকাহিনী তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রধান ঘটনাগুলির মধ্যবর্ত্তী ফাঁকও তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই। একেবারে শেষের দিকে বাদল নামীয় একটি দ্বাদশবর্ষীয় কিশোরের যে বর্ণনা আছে, তাহাকে উপকাহিনীর মর্য্যাদা তো দেওয়া যায়-ই না, পরন্তু তাহা কাব্যের পক্ষে অপকর্ষের কারণ হইয়াছে। বাদলকে কবি অভিমন্যুর রাজপুত সংস্করণ করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহার মুখের উচ্ছ্বাসবহুল উক্তিগুলির

উপর বক্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ না পড়ায় সেগুলিও সাজানো এবং কবিরই যোজনা বলিয়া মনে হইয়াছে।

মূল কাহিনী-বিন্যাসেও কবির কৃতিত্ব অতি নগণ্য। প্রথমত, সূচনা-পর্ব্বে সমগ্র কাহিনীর সার-সঙ্কলন করিয়া ঘটনার অগ্রগতি ও পরিণতি সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহকে তিনি শিথিল করিয়া ফেলিয়াছেন। কাহিনীর পরিণতি যদি পাঠক পূর্ব্বেই জানিয়া ফেলে তাহা হইলে স্বতন্ত্রভাবে কাহিনীর কোন অংশের উপরই তাহার তীব্র কৌতূহল থাকিতে পারে না এবং অতি চমকপ্রদ পরিণতিও ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। পূর্ব্বে নাটকে বীজাকারে মূল কথা-বস্তুর একটা খুব অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইত। পরবর্ত্তীকালে এই রীতিকেও ঐ একই কারণে বর্জ্জন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নাটকে যাহা সম্ভব, কাব্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। নাটক দৃশ্যকাব্য, তাহার কাহিনী-ই প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় নয়; দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত প্রভৃতি আরও বহুদিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের বহু উপাদান রহিয়াছে। কিন্তু কাব্যে, যেখানে মূল কাহিনীর জালেই পাঠকের মনকে বাঁধিতে হইবে, সেখানে সূচনায় সমগ্র কাহিনীর সারাংশ বিস্তৃত করা আর জাল ফেলিয়াই তাহার একাংশ উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখা এক কথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাহিনীর ভারকেন্দ্র দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া মূল কাহিনীকে দুইটি অংশে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার ফলে কাহিনীর মূল কেন্দ্রবিন্দু (centre of interest) কোন্‌টি তাহা সহজে বোঝা যায় না। 'সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ বাক্য' এবং 'আলাউদ্দীনের চিতোর জয়'—এই দুইটি পরিণতির কোন্‌টি কবির প্রতিপাদ্য তাহা বিচারসাপেক্ষ। 'সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ বাক্য'—এই অংশে জহর-ব্রত অবলম্বন করিয়া পদ্মিনী তাহার সখিগণের সহিত অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করিতেছে, এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই বর্ণনা এমনই ম্লান ও বর্ণহীন যে ইহা পদ্মিনীর অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশের বর্ণনা বা তাহার স্নানলীলা বর্ণনা ইহা বুঝিতে কষ্ট হয়। এই অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ ঘটনার মধ্যে যে করুণ ট্রাজেডির ব্যঞ্জনা আছে, যে দুঃসাহসিক আত্মত্যাগের মহিমা আছে, সতীত্বের মর্য্যাদা ও শুচিতার প্রতি রাজপুত রমণীর যে সম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা উত্তাপ ও আবেগহীন বর্ণনার জন্য একেবারে নিভিয়া গিয়াছে। এইভাবে কাব্যের চূড়ান্ত-মুহূর্ত্ত দুইটি অংশে বিভক্ত হওয়ায় আখ্যানভাগ যেমন একটি নির্দ্দিষ্টপরিণতি লাভ করিতেপারে নাই, তেমনি কেন্দ্রীয় ঘটনাগুলিওযান্ত্রিক ও আবেগহীন বর্ণনার জন্য পাঠকের অনুভূতি আকর্ষণ

করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার জন্য কাব্যের সামগ্রিক-মূল্য অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে।

আবার পাঠকের মানস-প্রস্তুতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এমন দ্রুতগতিতে সময় সময় ঘটনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে যে তাহাও কাব্যের অপকর্ষের কারণ হইয়াছে। কাব্যের আরম্ভেই পদ্মিনীর অতিপল্লবিত রূপ বর্ণনার পর একটি লাইনে পদ্মিনীর প্রতি দিল্লীশ্বরের আকর্ষণের ইঙ্গিত দিয়া চিতোর আক্রমণের যুদ্ধ-বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে। পাঠক মুগ্ধ হইয়া পদ্মিনীর রূপ-লাবণ্যের বিস্তৃত বর্ণনা শুনিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে সে রূপ-জগৎ হইতে একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ইহার মধ্যে কালের ব্যবধান অতি সঙ্কীর্ণ, নাই বলিলেও চলে; যেটুকু আছে তাহা যথেষ্ট নয়। একটি বিষয় হইতে আর একটি বিষয়ে তন্ময়তা লাভ করিতে সময় লাগে, কবিকে সেই সময়ের ফাঁকটুকু প্রাসঙ্গিক বর্ণনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। রঙ্গলাল তাহা না করিয়া অযথা পাঠকের চেতনার উপর অত্যাচার করিয়াছেন। বার বার যদি এইরূপ আকস্মিকভাবে পাঠকের চেতনাকে পীড়ন করা হয়, তাহা হইলে ঘুম-চটিয়া যাওয়া চোখে যেমন সহজে আর ঘুম আসিতে চায় না তেমনি কাহিনীতে পাঠকের তন্ময়তাও আর সহজে জমিতে চায় না; ইহা আখ্যায়িকা-কাব্যের পক্ষে বিশেষ অপকর্ষের কারণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের আরও কয়েক জায়গায় আছে, যেমন 'বিগ্রহ ও সন্ধির মন্ত্রণা' নামক অংশটিতে আলাউদ্দীনের যুদ্ধে বিরাগ ও সন্ধির জন্য ব্যাকুলতা, ভীমসিংহের নিকট সন্ধিপত্র প্রেরণ এবং ভীমসিংহ কর্ত্তৃক সন্ধির সর্ত অবগত হইয়া বিমর্ষভাব ধারণ—এতগুলি ঘটনা মাত্র দশ লাইনের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

আখ্যায়িকা-কাব্যে কাহিনী-ই মুখ্য, চরিত্র গৌণ। নূতন নূতন বৈচিত্র্যময় ঘটনার সমাবেশে কাহিনীর বর্ণাঢ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই আখ্যায়িকা-কাব্যে চরিত্র-চিত্রণের অক্ষমতা বিশেষ ত্রুটি বলিয়া সাধারণত ধরা হয় না; এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান লক্ষ্য ঘটনা সমাবেশে যৌক্তিকতা ও কাহিনীর অগ্রগতি। অবান্তর ঘটনা কাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিলে তাহা অপকর্ষের কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। পদ্মিনী-উপাখ্যানে দেশাত্মবোধের উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা, নায়ক-নায়িকার বিস্তৃত আত্ম-চিন্তার বিবরণ, কাহিনীর অগ্রগতির পথে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ভীমসিংহের আত্ম-চিন্তা একদিকে তাঁহার চরিত্রকে যেমন শিশুসুলভ দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করিয়াছে তেমনি

ইহা কাহিনীর গতিকেও অযথা বিলম্বিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাজার উচ্ছ্বসিত প্রণয়-সম্ভাষণ এবং কারাগারে তাঁহার আত্ম-চিন্তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। মাতৃভূমি যখন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে দুর্গের এক-একটি বুরুজ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তখন সেই জাতীয় সঙ্কট-মুহূর্তে রাজা-রাণীর দীর্ঘ প্রেমালাপ অত্যন্ত বিসদৃশ এবং কাহিনী-কাব্যের পক্ষে অবাঞ্ছিতও বটে ('রাজ-দম্পতির কথোপকথন' নামক অংশটি দ্রষ্টব্য)। অনুরূপ অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে 'ভীমসিংহের পরিত্রাণ' নামক অংশের প্রথম দিকে।

আবার মূল আখ্যানাংশের মধ্যে মধ্যে যবনের প্রতি কবির বিদ্বেষভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে যবনেরা কেমন করিয়া হিন্দুর সংঘশক্তির অভাবের সুযোগ লইয়া এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল তাহার বর্ণনা বিশেষ যুগোপযোগী হইলেও কাব্যের ক্ষতিকর হইয়াছে।

কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল ঘোষণা করিয়াছেন যে এই কাব্যে অলৌকিকত্ব বর্জ্জন করা হইয়াছে, কিন্তু কাব্যের মধ্যে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব এবং দৈববাণী শ্রবণ প্রভৃতি এমন কয়েকটি ঘটনা আছে যাহার বর্ণনায় পাঠকের অলৌকিকত্ব বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভীমসিংহকে সঙ্গে করিয়া শত্রু-শিবির হইতে পদ্মিনীর পলায়নের মধ্যে অলৌকিকত্ব না থাকিলেও কিছু ভোজবাজীর প্রভাব আছে; নতুবা পদ্মিনী কহিলেন, 'এস নাথ শত্রু-হস্তে মুক্ত করি আগে,' তৎক্ষণাৎ রাজ-দম্পতি নিরাপদে শত্রু-এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঠান-শিবির সৈন্যশূন্য না থাকিলে ইহা যে কোন্ উপায়ে সম্ভব হইল তাহার বর্ণনা দিতে কবি কার্পণ্য করিয়াছেন। তাই ইহাতেও অলৌকিকত্বের প্রভাব অনুমান করি। কারণ, 'দেবী-অংশে অবতীর্ণ পদ্মিনী আমার। যবন-দানবকুল করিতে সংহার।'—কাহিনীর মধ্যে এইরূপ দু-একটি দুর্ব্বলতাও যে নাই তাহা নয়।

আরও একটি কারণে পদ্মিনী-উপাখ্যানের কাহিনী একঘেয়ে ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সেটি হইল—কাহিনী-বিন্যাসে নাটকীয় উপস্থাপন-রীতি অনুসরণ না করা। আখ্যায়িকা-কাব্যের বিন্যাস-ভঙ্গীতে কিছু নাটকীয়ত্ব থাকে, ইহা কাহিনীতে বৈচিত্র্য সঞ্চারে সহায়ক হয়। কেবল পদ্মিনী-উপাখ্যানে নয়—কোন কাব্যেই রঙ্গলাল এই নাটকীয় উপস্থাপন-ভঙ্গী অনুসরণ করেন নাই, সেই কারণে তাঁহার সমস্ত কাব্যই বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব-হীন

হইয়া পড়িয়াছে।

চরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়াও রঙ্গলাল বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন না। পদ্মিনী-উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র দুইটি—পদ্মিনী ও ভীমসিংহ। ইঁহাদের কাহাকেও রঙ্গলাল ঠিক রক্ত-মাংসের জীব করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই।

রঙ্গলালের হয়ত ধারণা ছিল রাজপুত জাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিকতর বীর্য্যবতী, এই কারণে চরিত্রের দৃঢ়তা এবং শৌর্য্য-বীর্য্যের যাহা কিছু পরিচয় তাহা তিনি পদ্মিনী-চরিত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু পদ্মিনী বা অন্যান্য রাজপুত-রমণীর ঐতিহাসিক প্রাসদ্ধি সতীত্ব-মর্য্যাদায় এবং সতীত্ব ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে যে-কোন দুঃসাহসিক কর্ম্ম এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিবার অটল-অনমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্পে। রঙ্গলাল কিন্তু পদ্মিনীর সতীত্ব-নিষ্ঠা অপেক্ষা তাহার দূরদৃষ্টি, নির্ভীক, বলিষ্ঠ চরিত্র এবং কূট বিচক্ষণ রাজনৈতিক বুদ্ধিশীলতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহার জন্য পদ্মিনীর স্বামী ভীমসিংহ ভীরু-দুর্ব্বল মেষশাবকের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে, প্রকৃত রাজচরিত্র অঙ্কনে রঙ্গলাল সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

ভীমসিংহের ন্যায় দুর্ব্বল এবং ভীম চরিত্র কোন বীরত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাব্যের নায়ক হইতে পারে না। রণদামামা ও অস্ত্রের ঝনৎকারের মধ্যে ভীমসিংহের মত চরিত্র একেবারেই বেমানান হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখে গদ্‌গদ প্রেমসম্ভাষণ তবু খানিকটা সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের 'সাজ সাজ' রব যেন ভয়-পাওয়া ব্যক্তির উক্তির মত জড়তায় অস্পষ্ট। আলাউদ্দীন যখন পদ্মিনীর দর্শন প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট পত্র পাঠাইলেন তখন ভীমসিংহের আচরণ কন্যাদায়গ্রস্ত নিঃস্ব বৃদ্ধ বাঙ্গালী বিপ্রের ন্যায়—

"এত ভাবি ম্লান মুখে সজল নয়নে।
ধীরে ধীরে যায় রায় পদ্মিনী সদনে॥
একবার অগ্রসর পুনঃ চায় ফিরে।
করাঘাত কাতরেতে করে কভু শিরে॥"

কোন রাজপুত-রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে এরূপ আচরণ যে শোভন নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আলাউদ্দীনের পত্র পাইবার পর ভীমসিংহের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটির উপর যেন অতিরিক্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। রাজা পত্নী-প্রেমকে সর্ব্বজ্ঞ-জ্ঞান

করিয়া কহিতেছেন—

"যাক্ রাজ্যধন, নাহি প্রয়োজন
হই হব দুঃখভাগী।"

রাণী তখন রাজাকে সাহস দিয়া রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন করেন—

"দুর্জ্জয় দলন সুজন পালন
এই তো রাজার নীতি॥"

এইভাবে রাণীর আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া রাণীর পরামর্শানুযায়ী স্থির হইল, আলাউদ্দীন দর্পণের উপর প্রতিবিম্বিত পদ্মিনীকে প্রত্যক্ষ করিবেন, কিন্তু রাজার ভয় তাহাতেও যায় না—

"মুকুরে আকৃতি হেরিতে স্বীকৃতি
পাবে কি সে দুরাচার।"

এখানেও রাজার বুদ্ধিতে রাণীর ফুৎকারের প্রয়োজন হইয়াছে। এইভাবে রঙ্গলাল ভীমসিংহকে পদে পদে স্ত্রী-বুদ্ধি নির্ভর, ব্যক্তিত্বহীন, জড়পুত্তলির মত অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত রাণীর বুদ্ধির প্রখরতা রঞ্জিত হইয়াছে কিন্তু একটি চরিত্রের ছায়ায় আর একটি চরিত্র যে একেবারেই ঢাকা পড়িয়া কাব্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে, কবি সেদিকে লক্ষ্য দেন নাই।

যবন শিবিরে বন্দী অবস্থায় পদ্মিনীর প্রেমে সংশয় প্রকাশ করিয়া ভীমসিংহ যে দীর্ঘ আত্ম-চিন্তার বর্ণনা দিয়াছেন তাহা কাহিনীর পক্ষে যেমন ক্ষতিকর হইয়াছে, উহাতে ভীমসিংহের চিত্তের দুর্ব্বলতাও তেমনি প্রকাশ পাইয়াছে। কোন প্রকৃত বীর-যোদ্ধা বা কোন বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর নায়কের পক্ষে প্রণয়-ব্যাপারে এইরূপ সংশয়-ব্যাকুলতা মোটেই শোভন নয়; ইহা রোম্যাণ্টিক নায়কের বৈশিষ্ট্য। ভীমসিংহের বাহ্যিক রাজবেশ খুলিয়া ফেলিলে তাঁহার প্রণয়-মুগ্ধ রোম্যাণ্টিক নায়কের চেহারাটি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। শত্রু-শিবিরে পদ্মিনীকে দেখিয়া তাঁহার প্রণয়-জ্ঞাপন-ইচ্ছা এবং পদ্মিনীর প্রত্যাখ্যান-উক্তি ('অনুরাগ এ সোহাগ কালে ভালো লাগে। চল নাথ শত্রু হস্তে মুক্ত করি আগে') উপরের মন্তব্যকে সমর্থন করিবে। শেষবারের মত যুদ্ধযাত্রাকালে পদ্মিনীর নিকট হইতে ভীমসিংহের বিদায়-গ্রহণ দৃশ্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট হইতে বীর যোদ্ধার বিদায় গ্রহণের দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে অতি চমৎকারভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অ্যাণ্ড্রম্যাকির নিকট হইতে হেক্টরের বিদায়-দৃশ্যে প্রেম ও বীর্য্য, বীর-রস ও মধুর রস এবং ইহাদের পটভূমিকাস্বরূপ প্রচ্ছন্ন কারণ-রস যুগপৎ উৎসারিত হইয়া পাঠক-চিত্তকে

রোমাঞ্চিত করে। তাঁহারাও স্ত্রীকে প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু সে প্রণয়ের পিছনে কর্ত্তব্যের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হইয়া সে প্রেম-ব্যাপারের মধ্যে একটা সার্ব্বভৌম ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু ভীমসিংহের বিদায় গ্রহণ দৃশ্য কাঁদুনী প্রধান হইয়াছে, কোন মহিমা-ব্যাপকতা বা উচ্চ আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই—

"এ বিদায় জন্মশোধ প্রণয়-পঙ্কজ-রোধ
ইহলোকে তোমার আমার
যদি পুরে মনস্কাম প্রাপ্ত হ'য়ে যোগ্য ধাম
মিলন হইবে পুনর্ব্বার।"

কোন বীর যোদ্ধা যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারে না। অতি সঙ্কটকালে যুদ্ধে যাইতে হইলেও দৃঢ় মনোবল ও প্রবল জয়লিপ্সা কখনও সৈনিকহৃদয়কে ত্যাগ করে না। ভীমসিংহের মধ্যে কিন্তু বিপরীত ভাব-ই লক্ষ্য করি।

আবার বিদায়গ্রহণ কালে পদ্মিনী-বিচ্ছেদ-বেদনা ভীমসিংহের চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু যে মহান জাতীয় আদর্শের যূপকাষ্ঠে এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ব্যক্তিগত প্রণয় বলি দিতে হইতেছে সে আদর্শের প্রেরণায় বীরচিত্ত উল্লসিত হইবার কথা—অথচ ভীমসিংহের মধ্যে উল্লাস বা প্রেরণার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তাই ভীমসিংহ বীরত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনীকাব্যের নায়কের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই। কবি তাঁহাকে জলমগ্ন নিরুপায় ব্যক্তির ন্যায় অঙ্কিত করিয়াছেন। যবনের যুদ্ধ-হুঙ্কারে যে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, আমরা সহজেই তাহা বুঝিতে পারি। কবিও উপমার সাহায্যে তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করেন নাই—

"তথায় বুরুজ ভাঙ্গি যবন উঠায়ে চাঙ্গী
নগরেতে করিল প্রবেশ।
শুনি ভীমসিংহ রায় দাবদগ্ধ মৃতপ্রায়
নিরাশায় পূর্ণ বক্ষদেশ॥"

পুত্রদিগের প্রতি ভীমসিংহের যে উৎসাহ-বাক্য তাহাও মুমূর্ষুর অন্তিম প্রার্থনার ন্যায় অসহায় ও আবেগ-কম্পিত—

"কুলধর্ম্ম রাখিতে জীবন যদি যায়
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?

কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্র হ'য়ে ?
রাজপুত-সুতা যাবে যবন আলয়ে ?"

ভীমসিংহ-চরিত্র চিত্রণে এই ক্রটি পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের একটি কেন্দ্রীয় দুর্ব্বলতা।

ভীমসিংহের পর উল্লেখযোগ্য পদ্মিনী-চরিত্র। কবি পদ্মিনীকে হয়ত সমগ্র রাজপুত স্ত্রী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করাইবার জন্য তাহার চরিত্রের অসমসাহসিকতা এবং অটল দৃঢ়তার দিকটির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। পদ্মিনী নারী হইয়াও শত্রু-শিবিরে বন্দী স্বামীকে কৌশলে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, যুদ্ধ-ব্যাপারে স্বামীকে পরামর্শ দিয়াছে, পরিশেষে স্বামীর পরাজয়ে অসহায় অবস্থায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে। এক দিকে বীরত্ব ও সাহসিকতা আর এক দিকে সতীত্ব—এই দুইটি দিক-ই পদ্মিনী-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

কিন্তু নানা কারণে কবির উদ্দিষ্ট ভাবটি ঠিক ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রথমত, ভীমসিংহের মত একটা ভীরু কাপুরুষ চরিত্রের পার্শ্বে পদ্মিনীর বীরত্ব ও সাহসিকতা যথার্থভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভীমসিংহ ও পদ্মিনী উভয়ের চরিত্র অনমনীয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ হইলে একটা বীরত্বপূর্ণ জাতীয় ভাবোদ্দীপক পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু ভীমসিংহের চরিত্রের মধ্যে তেজ-অংশ কবি এত অল্প পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়াছেন যে এক পদ্মিনীর চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া ঐরূপ একটি পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। বাস্তবক্ষেত্রে একের দুর্ব্বলতা অপরের শক্তিমত্তা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা যায়, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতাই; কোন আবরণে তাহা ঢাকিয়া রাখা যায় না। দ্বিতীয়ত, রঙ্গলাল সব জায়গায় পদ্মিনীর অসমসাহসিকা-রূপটি বজায় রাখিতেও পারেন নাই। রাজপুতরমণী পদ্মিনীর বীরত্ব-ব্যঞ্জক রূপের অন্তরাল হইতে মাঝে মাঝে অসহায় রমণীর বিলাপ-ধ্বনি শোনা গিয়াছে। যবন-শিবিরে ভীমসিংহের বন্দী হইবার সংবাদে রানীর বিলাপ যেন মদনভস্মে রতির বিলাপের ন্যায়। যে দুঃসাহসিকা রমণী যবন-শিবির হইতে বন্দী স্বামীকে সুকৌশলে মুক্ত করিবে, তাহার কণ্ঠে অসহায়ের বিলাপ-ধ্বনি শোভন হয় নাই। পদ্মিনী বিলাপ করেন এই বলিয়া—

"কোথা হে প্রাণের পতি রহিলে এখন ?
কি হবে আমার গতি কে করে রক্ষণ ?"

এইরূপ বিলাপের পর 'বারেক ভাবেন মনে সঙ্গে লয়ে সেনাগণে রণক্ষেত্রে হইব উদয় ॥' কিন্তু আবার বিপরীত আশঙ্কায় পিছাইয়া আসেন—'কিবা হয় নাহি জানি কপালেতে কি আছে লিখন।' যে নারী সৈন্যসজ্জা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কল্পনাও করিতে পারেন, তিনি-ই আবার কপালের লিখনের দোহাই দিয়া পিছু হটিয়া আসিতেছেন, ইহার মধ্যে একটা হাস্যকর অসঙ্গতি রহিয়াছে।

প্রথমাংশে পদ্মিনীর কিছুটা প্রাধান্য থাকিলেও পরে যুদ্ধ-বর্ণনার চাপে পদ্মিনীর গুরুত্ব লঘু হইয়া গিয়াছে। তাই পদ্মিনী-চরিত্রের সামান্য ত্রুটি-অসঙ্গতি কাব্যের বিশেষ অপকর্ষের কারণ হইত না, কবির যদি সৃষ্টি-ক্ষমতা থাকিত। কিন্তু কবি কোথাও পাঠকের মনের বাসনা-অনুভূতিকে জাগ্রত করিতে পারেন নাই। অথচ এরূপ সুযোগ কবির ভাগ্যে বহুবার জুটিয়াছে। পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের মধ্যে যে চমৎকার কাব্য-সম্ভাবনা ছিল শক্তিশালী কবির হাতে পড়িলে তাহা মেঘনাদ-বধ অপেক্ষা উন্নত কাব্যে রূপলাভ করিতে পারিত।

মেঘনাদ-বধ কাব্যে রাবণের চরিত্রের ভিতর দিয়া যে ট্র্যাজিক সুরটি পরিস্ফুট হইয়াছে এবং লঙ্কাবাসীদের যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্য হইতে যে স্বাজাত্যবোধের আদর্শ নিষ্কাশিত হইয়াছে পদ্মিনী-উপাখ্যানের কথা-বস্তু হইতে ইহা অপেক্ষা উন্নত ট্র্যাজিক-রস এবং স্বাজাত্যবোধের বাণী প্রচার করিবার সম্ভাবনা ছিল। রাবণ অন্যায়ভাবে বনবাসী রামের স্ত্রীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল; তাই রাম যখন পতিব্রতা স্ত্রীকে উদ্ধার করিবার জন্য লঙ্কা অবরোধ করিলেন, তখন রামের বানের সৈন্যের বিপক্ষে লঙ্কার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য লঙ্কাবাসীকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার ঠিক যথার্থ উৎসাহ-বাণী রাবণের মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। এবং এই যুদ্ধে রাবণের একটির পর একটি পুত্র যখন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে তখন রাবণের পিতৃহৃদয়ে যে আলোড়ন সে আলোড়ন পাঠকের হৃদয়কেও তেমন গভীরভাবে অভিভূত করিতে পারে না। অন্যায়কারীর উপযুক্ত প্রতিফল মনে করিয়া রাবণের সে করুণ বিলাপের মধ্যে কিছু তৃপ্তির আমেজ মিশাইয়া পাঠক তাহা উপভোগ করে। রাম-রাবণের যুদ্ধ অন্যায় ও দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভিযান প্রতীক। মধুসূদন অবশ্য রাবণকে কৃত্রিমভাবে সমর্থন করিয়া, তাহার উপর কবির করুণাবারি সমস্তটুকু ঢালিয়া দিয়া, তাহাকে আদর্শ ট্র্যাজিক নায়ক-রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। মধুসূদনের অসাধারণ কবি-শক্তির প্রভাবে এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে,

প্রকৃতপক্ষে রাবণের চরিত্রের মধ্যে এরূপ ট্রাজেডির সম্ভাবনা ছিল না। ট্রয়-অবরোধ-কাহিনী ঠিক মেঘনাদবধ-কাহিনীরই মত। প্যারিস যখন গ্রীক-সুন্দরী হেলেনকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রীক-সৈন্য যদি ট্রয়নগর অবরোধ করে তাহা হইলে ট্রয়বাসীদের উৎসাহিত করিবার কি মন্ত্র ট্রয়-নায়ক প্রচার করিতে পারেন? এই দুই পক্ষের যুদ্ধে এক গ্রীক-সৈন্যই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে, ট্রোজান-সৈনিকদের সম্মুখে সেরূপ কোন মহান আদর্শ উপস্থাপিত হইতে পারে না। ভীমসিংহ এবং রাজপুত-সৈন্যদের অবস্থা হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। যবন-সৈন্য চিতোর অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, তাহার দাবী রাজপুত জাতির মান- সম্ভ্রম—রাণী পদ্মিনীকে তাহার পায়ে উপহার দিতে হইবে। একাদশ পুত্রের পিতা ভীমসিংহ এক-একটি করিয়া তাঁহার সমস্ত পুত্রকেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়াছেন,অসংখ্য রাজপুত সৈন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া জাতি-গৌরব,কুল-গৌরব, দেশ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে না। যবন-সৈন্যের জয়োল্লাসে রাজপুত জাতির বুকে পাষাণ চাপা পড়িতেছে। অন্তঃপুরে, রাজসভায় ভীমসিংহ শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় জাতির অপমানে, মাতৃভূমির লাঞ্ছনায়, দশটি পুত্রের শোকে অস্থির হইয়া পদচারণা করিতেছেন। ভীমসিংহের এই ট্র্যাজিক-রূপ ফুটাইয়া তুলিতে কবিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না এবং হস্তপদবদ্ধ ভীমসিংহ রাজপুত-সৈন্যকে যুদ্ধেউৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিলে সে উৎসাহের মধ্যে প্রকৃত জাতীয়ভাবোদ্দীপনা সহজেই উৎসারিত হইতে পারিত। রঙ্গলাল কিন্তু এই মহৎ কাব্য-সম্ভাবনাকে এড়াইয়া গিয়া পদ্মিনীর সতীত্ব ও বীরত্ব বর্ণনা করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সেই প্রসঙ্গে সুলভ দেশপ্রেমের বাগাড়ম্বর করিয়াছেন। যে ঘটনাটির মধ্যে একটি বৃহৎ কাব্যের সম্ভাবনা ছিল, তাহা পদ্মিনী-উপাখ্যানের অতি গৌণ অংশ। রঙ্গলাল ইহার বর্ণনা দিয়াছেন এইভাবে—

"হেথা ভীমসিংহ রায় কদম্ব কুসুম প্রায়,
লোমাঞ্চ শরীর বীরবর।
প্রবেশিয়ে অন্তপুরে, নয়ন-নীরদ ঝুরে
নীরস হইল বিম্বাধর॥
উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপসী যথা
সখী সহ করেন রোদন।

বিমুক্ত কুন্তল-জাল, অশ্রু-ধারা মুক্তামাল,
সুশোভিত পূর্ণেন্দু-বদন ॥
নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে।
জিজ্ঞাসেন মৃদুভাসে বসিয়ে রাজার পাশে,
"আজি হে উদয় কি কারণে ?
দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া,
ছায়া প্রায় ছিল হে তোমার ?
রণশায়ী পুত্রগণ আছে মাত্র একজন,
প্রিয় শিশু অজয় কুমার ॥
আর কেন হে রাজন, যদি দিবে সেই ধন,
বাল্য মাতা রাক্ষসীর পায় ?
পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল,
বাপ্পারাও বংশ লোপ প্রায়।
ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি,
আর পাঠায়ো না সে সন্তানে।
তুমি যাও রণস্থলে আমি স্বীয় দলে বলে,
অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ॥"

রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান যে একসময় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এই কাব্যের দেশাত্মবোধক উচ্ছ্বাস-সর্ব্বস্ব বক্তৃতাগুলিই ইহার কারণ, নতুবা কাব্য হিসাব ইহা অতি তুচ্ছ রচনা। এই সুলভ জাতীয় ভাব প্রচার রঙ্গলালের একটা মুদ্রাদোষ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য বহু কাব্য-সম্ভাবনা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের ভাবে মৌলিকত্ব দাবী করিতে পারিলেও রচনা-রীতির দিক দিয়া তিনি প্রাচীন ধারারই অনুবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পদ্মিনীর রূপবর্ণনার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, মৃগপতি, যূথপতি, দ্বিজপতি, গজপতি প্রভৃতি উপমা 'নব কবিজনের বাঞ্ছিত নয়', তথাপি তাঁহার কাব্যে গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতারই অনুবর্তন দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অপ্রস্তুত বিষয়ের অপকর্ষ দেখাইয়া প্রস্তুত বিষয়ের উৎকর্ষ করিবার রীতি প্রাচীন যুগের কবিদের মধ্যেই দেখা

যায়, বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রে। রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানের বহু বহু জায়গায় এই রীতির অনুবর্ত্তন দেখা যায়—

"জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি প্রখর ভাস্কর ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাজি গজ মুক্তা ফল রাজি
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?
সেইরূপ ভূপজার রূপ গুণ চমৎকার
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন ॥'

অনুপ্রাসের বাহুল্য বহু জায়গায় হাস্যকর হইয়াছে—

"তেজোহীন জনগণ যেন সব শব।"
"ঢল ঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল।"
"বল বল বলে ধরাতলে
লোকবল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলী বলবান্ কারে বলি
যদি বল প্রকাশে কৌশলে ॥"
"ভয়ানক ভাব আবির্ভাব হয় তাহে।"

স্থানে স্থানে একেবারে গদ্যাত্মক রচনা রঙ্গলালের ক্ষীণ কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়—

"এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া ?
বাদশাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া ?
এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর ?
নিপট লম্পট শট কুনীতি-আকর ॥"

রঙ্গলালের কতকগুলি উক্তি প্রবচন বাক্যরূপে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রবচন সৃষ্টির ক্ষমতা তিনি কাব্যগুরু ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়—

"যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর ॥"
"অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যেদিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায় ॥"
"কুকুর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা ?"

প্রকাশভঙ্গীর জড়তা এবং অদ্ভুত গদ্যাত্মক শব্দ-চয়নের দ্বারা তাঁহার কল্পনা-

দৈন্য প্রমাণিত হইলেও পদ্মিনী-উপাখ্যানের কয়েকটি উপমায় এবং কয়েক জায়গায় বর্ণনার সাবলীলতায় রঙ্গলালের কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

"কোন স্থলে মৃদু স্বর করি নিরন্তর।
উপরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হ'য়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানু করে করে অনিবার॥"

॥ ৫ ॥

পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যখানি মধুসূদনের কোন কাব্য প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাই রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা এই কাব্যখানির গুরুত্ব কিছু বেশি। সেই কারণে পদ্মিনী উপাখ্যানের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা গেল। রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্যগুলি সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য কর্ম্মদেবী প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার পূর্ব্বে মধুসূদনের প্রায় সমস্ত কাব্যগুলি প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অনিবার্য্যভাবেই মধুসূদন-রীতির কিছু প্রভাব এই কাব্যে এবং রঙ্গলালের পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে পড়িয়াছে। তবে সে প্রভাবও আংশিক, মূল কাব্য-পরিকল্পনায় নয়। কর্ম্মদেবীতে পূর্ব্ববর্ত্তী-কাব্য পদ্মিনী-উপাখ্যান অপেক্ষা উপমা প্রয়োগে বা বস্তু বর্ণনায় কবি-শক্তির সামান্য স্ফুরণ ঘটিয়াছে।

যেমন, "ভাবভরে কেঁপে ওঠে মানস-কমল।
প্রভাত সমীরে যথা ফুল্ল শতদল॥"

কিংবা "আরম্ভিলা সন্ধ্যারাগে কর্ম্মদেবী কথা।
প্রদোষেতে পদ্মকোষে ভৃঙ্গনাদ যথা॥"

অথবা, "শুনি কর্ম্মদেবী নাম, ভূদেব নয়নে,
গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সঘনে,—
উদয় হইবামাত্র ঘনীভূত হয়,
যথা নীহারের বিন্দু হেমন্ত সময় ॥"

কর্ম্মদেবীর স্থানে স্থানে এইরূপ ভাবসমৃদ্ধ সূক্ষ্ম উপমা-প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়! তবে ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র-রূপায়ণ ও কাহিনী-পরিকল্পনার অভিনবত্বে মূল কাব্যের সামগ্রিকভাবে কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। সেই শিথিল-অবিন্যস্ত উপস্থাপন-ভঙ্গী, সেই দুর্ব্বল চরিত্র-চিত্রণ, সেই নীরস ঘটনা-বিন্যাস, সেই উচ্ছ্বাস-সর্ব্বস্ব জাতীয়-ভাবোদ্দীপক বক্তৃতামালা কাব্যকে অতি সাধারণ স্তরে নামাইয়া লইয়া আসিয়াছে। পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের কাহিনীর খুব ঘন-একত্ব না থাকিলেও অতি দূর-অন্বিত বা অসংলগ্ন ঘটনা সে কাব্যে স্থান পায় নাই, কিন্তু কর্ম্মদেবীতে ঘটনার অসংলগ্নতা এবং কাব্যের মূল লক্ষ্যের অনির্দ্দিষ্টতা বড় বেশি। প্রথম সর্গে ব্যবসায়ী যবনদের উপর সাধুর আক্রমণ ব্যাপার যে কোন অদৃশ্য বন্ধন-সূত্রে মূল কথা-বস্তুর সহিত আবদ্ধ হইয়াছে তাহা আবিষ্কার করা দুরূহ। এই সর্গের একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই, 'ব্যবসা-চ্ছলে কত জাতি এসে করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানা দেশে।' সুতরাং 'স্বাধীন স্বদেশ ধনী হ'ক এই চাই।' ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু কাব্য মধ্যে ইহার উপযোগিতা কতখানি সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যায়। এই সঙ্গে যবন আনীত ফল ও মেওয়ার (ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাবিত) যে বিস্তৃত বর্ণনা করি দিয়াছেন, আখ্যায়িকা-কাব্যের বর্ণবহুল ঘটনাসমাবেশের মধ্যে তাহার প্রয়োজন কতখানি তাহাও বিচারসাপেক্ষ।

পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক ও বীরত্ব-মণ্ডিত। সেই কারণে এই কাব্যের মূল কাহিনীর ফাঁকে দেশপ্রেমের যে মুখর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা অনেকখানি বক্তৃতার মত শোনাইলেও মূল ভাবভিত্তির সহিত গূঢ় সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত থাকায় সেগুলির একটা তাৎপর্য্য আছে বলিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মদেবী কাব্যের এই জাতীয় বক্তৃতাগুলি একান্তই শূন্যগর্ভ এবং অসংলগ্ন বলিয়া মনে হয়।

কর্ম্মদেবী কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয় জাতীয়-ভাব নয়, প্রেম-ভাব। সংস্কৃত কাব্য-নাটকের নায়ক-নায়িকা ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনুসরণে রঙ্গলাল সাধু ও কর্ম্মদেবীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং মধ্যযুগীয়

ইংরাজি সাহিত্যের নারীস্বার্থ-সম্পর্কিত দ্বৈত-সমর বর্ণনার আভাসে সাধু ও অরণ্যকমলের বিরোধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রণয় এবং প্রণয়-যুদ্ধকে জাতীয় বা স্বাদেশিক ভাবের পটভূমিকায় বর্ণনার একটা ব্যর্থ চেষ্টা কাব্যখানির সাধারণ প্রেমকাব্য হইয়া উঠিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রঙ্গলালের কাব্যপ্রেরণার উৎসে আছে জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয়তাবোধের এই দুরারোগ্য উৎকট ব্যাধি তাঁহার সহজ-স্বাভাবিক দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া তাঁহার প্রায় প্রত্যেকখানি কাব্যকেই ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছে।

দর্শনজনিত পূর্ব্বরাগ, পূর্ব্বরাগ হইতে প্রবল মিলন-উৎকণ্ঠা, মিলন-উৎকণ্ঠায় নায়িকার মূর্চ্ছা, ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার প্রেম পর্য্যায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রঙ্গলালের কর্ম্মদেবী কাব্যের নায়িকার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধিকা এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যার ব্যর্থ সমীকরণ চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

"নয়ন মুদিলে নিরখি যারে।
প্রকাশিলে পুন নেহারি তারে॥
অনঙ্গ-নন্দন অনঙ্গ সম,
ক্ষণেক না ছাড়ে মানস মম॥"

বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা রাধিকার ন্যায় এই প্রেমাকুলতার মধ্যে আবার বিদ্যার চতুর শ্লেষোক্তি আছে—

"যেইরূপ গোত্র রটে সেইরূপ প্রকৃতি বটে
মোহিল রে মানস আমার॥
দেখি নাই হেন নীতি সাধু হ'য়ে চোর-রীতি
নাম সাধু কার্য্যকালে চোর।"

নায়কের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় প্রমোদ-উদ্যানে নায়িকার মূর্চ্ছা এবং সেইখানে নায়কের উপস্থিতি বহু সংস্কৃত নাটকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই কাব্যের তৃতীয় সর্গে এবং আরও বহু জায়গায় মেঘনাদবধ-কাব্যের অনুসরণে মূল আখ্যানভাগের মধ্যে মধ্যে বিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা কাব্যের গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা আছে।

"অপূর্ব্ব হইল শোভা প্রভাত সময়।
বলিচক্রে উপনীত বহু লোকচয়॥

কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
সমধিক অবস্থিত চরণ নির্ভরে॥
একাধারে মঞ্চোপরে পুরনারিগণ।
জিনিয়া কুসুম কুঞ্জ অপূর্ব্ব শোভন॥
বিকচ কমলদল-গর্ব্ব খর্ব্ব করি।
হাস্যমুখে সুখে বসি সকল সুন্দরী॥"

এই বর্ণনার উপর মধুসূদনের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। পূর্ব্ববর্তী কাব্য পদ্মিনী-উপাখ্যানে এই রীতি রঙ্গলালের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যায়িকা-কাব্যকেও তিনি মঙ্গল কাব্য ও পাঁচালী কাব্যের ছাঁচে ঢালিয়াছিলেন; কিন্তু এই কাব্যে মধুসূদনের অনুসরণে একটা গভীর ভাব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেও কর্ম্মদেবীর অনুরাগ ও প্রেমাকুলতার অতি বিস্তৃত বর্ণনা, সাধু ও কর্ম্মদেবীর বিবাহ ও পিতৃগৃহ হইতে কর্ম্মদেবীর বিদায়গ্রহণ দৃশ্যের (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ) অতি পল্লবিত বিস্তার, অরণ্যকমল কর্ত্তৃক সাধুর পথ অবরুদ্ধ হইলে অমঙ্গল পরিণতির আশঙ্কায় কর্ম্মদেবীর দীর্ঘ হতাশ-উক্তি, এই গম্ভীর ভাব ফুটাইয়া উঠিবার পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছে। কর্ম্মদেবী একবার বলিয়াছেন—

"বীরের নন্দিনী আমি,
বীরবর মম স্বামী
বীর প্রসবিণী হব শেষ॥"

পরেই আবার খেদ করিয়াছেন এইভাবে—

"কি হবে আমার দশা,
কোথা রবে এ ভরসা,
কোথা রবে আশা মনোহারী।"

রঙ্গলাল কর্ম্মদেবী ও সাধুর-প্রণয় সম্পর্কের মধ্যে একটা বীরভাবের আভাস আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কর্ম্মদেবী সাধুর বীরত্ব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিল। কর্ম্মদেবী ও সাধুর বিবাহে একদিকে সাধু তাহার বীরত্বের জয়মাল্যের সহিত বরমাল্য লাভ করিল, আর একদিকে কর্ম্মদেবীর বীর স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। ইহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে কর্ম্মদেবী বীরত্বেরই পূজারিণী। কিন্তু এই কর্ম্মদেবীর মুখেই আবার শোনা যায়—



"তুমি নিদ্রা গেলে সখে মম নিদ্রা নাই।
তাহে শত্রু নিকটেতে মনে ভয় পাই॥
কি জানি নিশীথকাল বুঝিয়ে সময়।
ছলে বলে আসি যদি তব প্রাণ লয়॥"

রঙ্গলাল তাঁহার অধিকাংশ কাব্যেই বীরত্বের বৃথা আড়ম্বর দেখাইয়াছেন এবং প্রত্যেক বীরের বীরত্বকে তুচ্ছ-ক্ষুদ্র প্রণয়ের নিকট বলি দিয়াছেন। ভীমসিংহ তো বীর-ই নয়, প্রেমিক। সাধুর উপরও ভীমসিংহের সেই প্রেম-ব্যাধি বিস্তারিত হইয়াছে। সাধু যখন কর্ম্মদেবীর নিকট যুদ্ধ-যাত্রাকালে বিদায় লইতে আসিয়াছে, তখন তাহার সে-যাত্রা যে অন্তিম যাত্রা ইহা স্থির জানিয়াই যেন সাধু কহিতেছে—

"দেহত্যাগে পুনরায়
মিলন হইবে সূর্য্যলোকে হে।
আর না ভুগিতে হইবে
বিরহ ঘোর শোক হে॥"

সাধুর মৃত্যুতে সাধুর সৈন্যরাও যেভাবে বিলাপ করিয়াছে তাহা অকালবিধবার করুণ বিলাপের সহিত তুলনীয়—

"কি হইল কি হইল মুখে মাত্র সবাকার।
আমাদের সবে ফেলে, কোথা সাধু কোথা গেলে,
বিষম শোকাগ্নি জ্বেলে করিলে হে ছারখার॥"

॥ ৬ ॥

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য শূরসুন্দরীর আখ্যানভাগ নগণ্য। প্রথম কয়েকটি সর্গে খুবই অস্পষ্টভাবে মোগলদের সহিত পাঠানদের যুদ্ধের অতি দীর্ঘ ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে যাওয়ায় কাহিনী জট পাকাইয়া গিয়াছে এবং এই অংশে প্রতাপের সহিত মোগলের হলদীঘাটের যুদ্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া স্বাদেশিকতার ভাব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরে ছদ্মবেশী আকবর কর্তৃক নৌরোজা-উৎসবে পৃথ্বীসিংহের পত্নীকে অপহরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া দিল্লীর রাজসভা এবং নৌরোজা-উৎসবের

বর্ণনাকেই কাব্যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শূরসুন্দরী বর্ণনা-প্রধান কাব্য হইলেও পদ্মিনী ও কর্ম্মদেবীর মধ্যে রঙ্গলাল রাজপুত নারীর যে তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি আঁকিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন, খুব অল্পের মধ্যে পৃথ্বীসিংহের পত্নীর চরিত্রে তাহা তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। বর্ণনার স্বচ্ছ সাবলীল গতি দেখিয়া মনে হয় প্রকাশভঙ্গীতে রঙ্গলালের অধিকার কিছু পাকা হইয়াছে।

"শিরে ধরে জটাভার ধরণী চুম্বিত।
পরিহিত মৃগচর্ম্ম আজানুলম্বিত ॥
ভস্ম বিভূষিত কায় তুষার-বরণ।
প্রচুর রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে আভরণ ॥
ললাটে ত্রিশূল-চিহ্ন লোলিত চন্দনে।
মুখে ধ্রুবপদ গীত ত্র্যম্বক-বদনে ॥
করেতে ত্রিতন্ত্রী বীণা বিনোদ ঝঙ্কার।
নানা সন্ধ্যা রাগিণীতে হয় অবতার।"

দিল্লীর প্রাসাদ-অভ্যন্তরে এবং রাজসভার বর্ণনাতেও কবি অনুরূপ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন।

॥ ৭ ॥

কাঞ্চী-কাবেরী রঙ্গলালের শেষ কাব্য। ইহার প্রকাশকাল ১৮৭৯। এই কাব্যেই রঙ্গলালের কবিপ্রতিভা স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই কারণেই কাঞ্চী-কাবেরী রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। কোন চমকপ্রদ ঘটনা নয়, কোন জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাহিনী নয়, কোন উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্র নয়, এই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় একটি দেশ এবং তাহার কিংবদন্তী। প্রাচীন উৎকল দেশের ভৌগোলিক সত্তা,রাজতন্ত্রের পরিচয় পৌরাণিক ও লৌকিক কিংবদন্তী সমস্ত কিছুকেই রঙ্গলাল একখানি বৃহৎ কাব্য-মানচিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের বহু প্রসারিত মূল-উপমূলের ন্যায় প্রাচীন উৎকল দেশের পৌরাণিক ঐতিহাসিক পরিচয় যে বিভিন্ন কাব্য-পুরাণ-লোক-স্মৃতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কবি রঙ্গলাল প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সেই কাহিনীকে কোথাও বিস্তৃত বর্ণনায়, কোথায়ও সামান্য একটুখানি

ইঙ্গিতের সাহায্যে এই কাব্যের মধ্যে সংহত রূপ দিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে হস্তী, গণ্ডার, বৃষভ প্রভৃতি হিংস্র পশু-অধ্যুষিত অরণ্যময় উৎকল দেশে কি করিয়া মনুষ্যবাস সম্ভব হইল, শাল-অর্জ্জুন-হরিতকী-গিরিমল্লী-জয়ন্তী-কেশর প্রভৃতি বিশাল অরণ্য উৎপাটিত করিয়া কি করিয়া সেখানে লোকালয় ও নগরসৌধ গড়িয়া উঠিল, অরণ্য হইতে সভ্যযুগে বিবর্ত্তনের এই স্তর-পর্য্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ বর্ণনার মধ্যে রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা একদিকে তাঁহার সূক্ষ্ম কবি-দৃষ্টি অপর দিকে প্রখর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির একত্র সার্থক সমাবেশের ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

এই কাব্যে মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া কৃত্রিমভাবে গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা নাই; সার্থক সুনির্ব্বাচিত শব্দে, সরল স্বচ্ছন্দ বর্ণনাভঙ্গীতে এবং বিষয়-গৌরবে এই কাব্যের মহিমা ও সমুন্নতি প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা রঙ্গলালের পূর্ব্ববর্তী কাব্যগুলিকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। এই কাব্যে ভাষার উপরেও যেন কবির পূর্ণ অধিকার আসিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ দুর্ব্বল, অর্থহীন, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ এ কাব্যে নাই বলিলেও চলে। পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলিতে ভাবপ্রকাশের মধ্যে কৃত্রিম সচেষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়াছে, কিন্তু কাঞ্চী-কাবেরীতে কবির নিজেকে যেন লিখিতে হয় নাই—কলম আপনি লিখিয়া গিয়াছে। ইহাতেই অনুমান করিতে পারি কাঞ্চী-কাবেরীতে কবির সহিত কবীর লেখনীর সহজ যোগাযোগ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ব্বর্ত্তী কাব্যগুলিতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাই কাঞ্চী-কাবেরী স্বাভাবিক সৃষ্টি এবং সেই কারণেই ইহা কবির শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় রচনা।

এই কাব্যের কাহিনীও অন্যান্য কাব্যের ন্যায় দুর্ব্বল ও নীরস নয়। কাঞ্চীরাজ ও গজপতির বিরোধের একটা প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আছে এবং তাহাদের যুদ্ধের ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ বীর-রস পরিবেশিত হইয়াছে। পদ্মাবতীর প্রতি গজপতির পূর্ব্বরাগও খুবই সংযম ও শালীনতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে এবং পরিশেষে মন্ত্রীর সহায়তায় তাহাদের মিলনও কাহিনীর দিক দিয়া অপরূপ চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব্বর্ত্তী কাব্যগুলিতে প্রেমের অতি মাদকতা লৌকিক বর্ণনায় প্রেমের মহিমা ও গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের সংযত প্রেম-বর্ণনা কাব্যের পটভূমিকার সহিত গভীরভাবে অন্বিত হইয়া রস-স্ফুরণে সহায়তা করিয়াছে। এই কাব্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় মধুসূদনের প্রভাব পড়িলেও ইহার মধ্যে কবীর স্বকীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মণিকা গোয়ালিনীর কাহিনী মূল আখ্যায়িকার সহিত অতি ক্ষীণ সূত্রে বিধৃতসূ

থাকিলেও এই কাহিনীটির একটা স্বতন্ত্র কাব্য-মূল্য রহিয়াছে। যে কবি যুদ্ধ-বর্ণনাতেই সিদ্ধহস্ত তিনি মণিকা গোয়ালিনীর মত চরিত্রের ভিতর দিয়া যে শুদ্ধ ভক্তিভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অতি সূক্ষ্ম তুলিকায় যে শান্ত চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়।

ঈশ্বর গুপ্ত এবং মধুসূদন উভয়ের প্রভাব-ই এই কাব্যে পড়িয়াছে। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে নিদাঘ-ঋতু বর্ণনায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং যুদ্ধ ও রাজসভার বর্ণনায় মধুসূদনকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

"লৌহময় কপাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে।
শৃঙ্খলে উঠিছে অগ্নি ইরম্মদাকারে॥"
"নির্ম্মিত চন্দন-কাষ্ঠে অপূর্ব্ব স্যন্দন।
হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন॥"
"প্রক্ষেড়ন ঘন ঘন ক্রবণ কুঠার।
করে বধ, পরশ্বধ বিষম প্রহার॥"

গজপতি-শিবির বর্ণনায়ও রাবণের রাজসভা বর্ণনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

"রত্ন সিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির।
বার দিয়া বসিয়াছে গজপতি বীর॥
শ্বেতছত্রে জ্বলে কত মণিময় তার।
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমতি ঝার॥
হীরার কলস উর্দ্ধে দিতেছে চমক।
দণ্ডে হীরা মণি পান্না করে ঝকমক॥"

এই কাব্যে কবি তাঁহার স্বভাব-সুলভ জাতীয়তাবাদের বক্তৃতার প্রভাবমুক্ত হওয়ায় ইহার কাব্যমূল্য আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

রঙ্গলালের কাব্যগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিবার পর এখন যদি তাঁহার কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বিস্তৃত কাব্যালোচনার পটভূমিকায় এই সাধারণ মন্তব্যগুলি যুক্তি-প্রতিষ্ঠা হইবে।

১ ॥ রঙ্গলালের কাব্যের বিষয়-বস্তুতে কিছু নূতনত্ব থাকিলেও কাব্যের রূপগঠন ও বর্ণনাভঙ্গীতে তিনি প্রাচীনপন্থী। তাঁহার কাব্যগুলির উপর ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব-ই বেশী ; প্রকাশভঙ্গীতেও তিনি স্বকীয়তা দাবী করিতে পারেন না। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রকাশভঙ্গীই তিনি মোটামুটিভাবে যথাশক্তি অনুসরণ করিয়াছেন।

২ ॥ দেশ-প্রেম প্রচারের মোহ, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য-কীর্ত্তি-কলাপের দীর্ঘ বর্ণনা দিবার লোভ, রাজপুত জাতির বীরত্ব-আত্মত্যাগের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিবার আকাঙ্ক্ষা মূল কাব্যপরিকল্পনার উৎকর্ষ বিধানের প্রতি কবিকে উদাসীন করিয়াছে। দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বোধিত করিতে হইলে কেবল শূন্যগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতাই যে যথেষ্ট নয়, কাব্যের চরিত্রে দেশপ্রেমের অঙ্কুর উপ্ত করিয়া পরে চরিত্র-বিকাশের স্তর-পরম্পরার ভিতর দিয়া ইহা শিল্প-প্রক্রিয়ার আনুকূল্যে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, রঙ্গলাল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অথবা সেইভাবে চরিত্র-রূপায়ণ করিবার ক্ষমতা হয়ত তাঁহার ছিল না। তাই চরিত্রের ভিতর দিয়া তিনি যাহা ফুটাইতে পারেন নাই বক্তৃতার মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতাগুলি যেন তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের পরিপূরক। বক্তৃতাগুলি ও চরিত্রগুলি যদি পাঠক একত্রিত করিয়া লইতে পারে তাহা হইলেই রঙ্গলালের উদ্দিষ্ট চরিত্র সৃষ্ট হইতে পারে। বক্তৃতাগুলি প্রাণ, চরিত্রগুলি দেহ, বাণীগুলি তত্ত্ব, প্রাণীগুলি সত্য—উভয়কে মিলাইলে প্রাণের এবং দেহের, তত্ত্বের এবং সত্যের মিলন হইবে। যেমন হইয়াছে মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যে।

৩ ॥ রঙ্গলালের কবি-প্রকৃতি কোন সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশের উপযোগী নয়—সে দেশ-ভাবই হউক, আর প্রেম-ভাবই হউক। ইহা কবির ত্রুটি নয়—বৈশিষ্ট্য। কোন কবি গন্ধমাদন পর্ব্বতটিকে কাব্যে উপস্থিত করেন ; আবার কেহ কেবলমাত্র বিশল্যকরণীটিকেই হাজির করেন। রঙ্গলাল প্রথম পর্য্যায়ের কবি ; তিনি বস্তুর বোঝা বহন করিতে পারেন, বস্তু হইতে ভাবসত্য বাছিয়া লইবার

ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাই তাঁহার কবিশক্তি সেইখানেই যথার্থভাবে স্ফুরিত হইয়াছে যেখানে রাজবংশের দীর্ঘ বর্ণনা দিতে হইবে অথবা যেখানে ঐতিহাসিক পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়া একটি দেশের সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থাপিত করিতে হইবে। তিনি ভাবের কবি নন, বস্তুর কবি। তিনি concrete বিষয়ের বর্ণনা দিতে পারেন, abstract ভাবের ব্যঞ্জনা দিতে পারেন না। কবি তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। তাই পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগুলিতে গভীর জলের তল খুঁজিবার ব্যর্থ চেষ্টার লক্ষণ প্রকট; কিন্তু তাঁহার শেষ কাব্য কাঞ্চী-কাবেরীতে আসিয়া তিনি সত্যই ভূমি স্পর্শ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এত শেষ মুহূর্ত্তে পাওয়া গিয়াছে যে তাহা না পাওয়ারই সমান হইয়াছে। কাব্য রচনার উদ্যোগ-পর্ব্বেই যদি তিনি তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতেন তাহা হইলে রঙ্গলাল মধুগ্রহের আলোকদীপ্তিতে একেবারেই নিষ্প্রভ না হইয়া গিয়া বাংলা সাহিত্যের এক প্রান্ত ক্ষীণ আলোকেও আলোকিত করিতে পারিতেন।

মধুসূদন দত্ত

॥ ১ ॥

ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত এবং ঈশ্বর গুপ্ত হইতে রঙ্গলাল পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যপ্রবাহ যেন পল্লীর ছোট নদীটির ন্যায় কূলের জনপদের সহিত মিতালি পাতাইয়া বাঙ্গালীর জীবন-সংসারের তটপ্রান্ত দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার তরঙ্গ-বক্ষ কখন রাজসভার মদির-বিহ্বল কলহাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, কখন সমাজ-শাসকের রোষহুঙ্কারে আতঙ্ক-পাণ্ডুর শীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে, আবার কখন অতীত ইতিহাসের গৌরব-কাহিনীতে উদ্বেলিত তরঙ্গ-বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া গিয়াছে। তটপ্রান্তের জনপদবাসীর হাসিকান্না-বিরহ-মিলনপূর্ণ জীবন প্রতিবিম্বিত (বাংলা কাব্যের এই সঙ্কীর্ণ রোম্যাণ্টিক ধারা মধুসূদনের ক্লাসিক-কাব্যের অমৃতসাগরে সীমাহীন অকূলতার মধ্যে আসিয়া নিঃশেষিত হইয়াছে।) বাংলা কাব্যপ্রবাহের নূপুরশিঞ্জিত নৃত্যচপল মৃদু কুলুকুলুধ্বনি মহাসমুদ্রের প্রবল জলকল্লোলের মধ্যে স্তব্ধ

হইয়াছে। দুই তীরের শ্যামল বনশ্রেণীর যবনিকার উপর অঙ্কিত পল্লীর জীবন-চিত্র দিগ্‌বলয়ের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে বিলীন হইয়াছে।

মধুসূদন-ই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ক্লাসিক-কবি। মেঘনাদ-বধ কাব্যের দ্বিসহস্রাধিক শ্লোকের মধ্য হইতেই মহাকাব্যের সেই উদাত্ত-গম্ভীর সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যে সুর মেঘের গর্জ্জনের ন্যায়, সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায়, প্রলয়কালের ঝটিকার ন্যায়। কিন্তু মধুসূদনের এই ক্লাসিক কবি-ভাবনার দিকটি তাঁহার কাব্য-সমালোচকদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধুসূদনের কাব্যে মননে-কল্পনায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অসীম নীরদমালার মধ্য হইতে চকিতের বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় যে রোম্যান্টিক কবি-ভাবনার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়াছে, তাঁহার কাব্য-সমালোচকদের তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টির সমগ্র শক্তি সেই বিদ্যুৎ-আলোকের সন্ধানেই নিঃশেষিত হইয়াছে, তাই আষাঢ়ের জলভার-মন্থর মেঘরাজির গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। মধুসূদনের বিজাতীয় পোশাকের বাহ্যাবরণের অন্তরালে ধুতি-উত্তরীয় আবৃত বাঙ্গালী প্রাণটি আবিষ্কার করিবার দিকে তাঁহার জীবনীকারেরা যেমন দীর্ঘকাল বহু শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, মধুসূদনের কাব্য-সমালোচকেরাও তেমনি দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার ক্লাসিকধর্ম্মী কাব্যের মধ্যে রোম্যান্টিক কল্পনার প্রভাব সন্ধান করিয়াছেন। রোম্যান্টিক গীতিকবিতাই বাংলা কাব্যের প্রধান ধারা। সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল কল্পনায়, প্রগাঢ় অনুভূতিতে, ললিতমধুর সুরঝঙ্কারে, বাংলা গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ হইয়াছে মধুসূদনের পূর্ব্বে ও পরে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা রোম্যান্টিক সুরসৃষ্টিতে নয়, ক্লাসিক কবিভাবনায়। তাই বাংলা রোম্যান্টিক কাব্যধারায় মৃদু-কলসঙ্গীতের ঐকতানের মধ্যে যদি কেহ বজ্র-গম্ভীর সুর সৃষ্টি করিতে পারেন, ক্ষুদ্র ভাবনা-কামনায় জীবন-সংসারের মধ্যে যদি কেহ মহাকাব্যের উদাত্ত গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, যে কাব্যবীণায় কেবল ললিত সাধনা হইয়াছে সেই কাব্য-তন্ত্রীতে যদি বিশ্বের অনাহত মহাসঙ্গীতের গাম্ভীর্য্য সৃষ্টির সাধনা কেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কবি-প্রতিভার সেই মৌলিকতার দিকটিতেই তাঁহার কাব্য-সমালোচকদের প্রথম সজাগ দৃষ্টি পড়া উচিত। যাহা প্রাচীন, যাহা সনাতন, যাহা অভ্যাসে জীর্ণ, যে বিশেষ সুরে বাংলা কাব্যের গভীরতম প্রাণ-পরিচয়, সেই সহজ অভ্যাসের উর্দ্ধে যাঁহার সাধনা উঠিয়াছে, যে স্বাতন্ত্র্যের জন্য তিনি বহুর মধ্যে বিশেষ, মধুসূদনের কবিপ্রতিভার সেই প্রধানতম বৈশিষ্ট্যটি—তাঁহার ক্লাসিক কবি-মানস—বিস্তৃতভাবে

আলোচনার যোগ্য।

ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক—কবি-কল্পনার দুইটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। ক্লাসিক কবি-কল্পনা আদিম মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, রোম্যান্টিক কবি-কল্পনা পরিণত যুগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। যুগের বিবর্ত্তনে, সমাজ-পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনে মানুষের শক্তি-রুচি রূপান্তরে, ক্লাসিক-কাব্যাদর্শ ক্রমশঃ রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বাহুবল হইতে বুদ্ধিবল, বিশালতা হইতে সূক্ষ্মতা, সরলতা হইতে জটিলতায় বিবর্ত্তনের ইতিহাস। ক্লাসিক কল্পনা-ভঙ্গীও ঠিক অনুরূপভাবে মানবসভ্যতার বিবর্ত্তনের স্তর-পরম্পরা অনুসরণ করিয়া রোম্যান্টিক কল্পনাবৈশিষ্ট্যে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানুষের দৃষ্টি যখন বহির্লোক হইতে অন্তর্লোকে গিয়াছে, সহজ সরল নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার উপরে যখন চিন্তাশীলতার বহু-বঙ্কিম কুটিল রেখাপাত হইয়াছে, জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত প্রাথমিক জিজ্ঞাসাগুলি যখন ব্যাপকতর ও সূক্ষ্মতর জীবন-জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে, মানুষের সমাজ-জীবনের অখণ্ডতা যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, তখন সাহিত্যের ইতিহাসে রোম্যান্টিক কল্পনার সূত্রপাত। মানবসভ্যতা বিবর্ত্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসই ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক কবি-কল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টির কারণ।

ক্লাসিক-কল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য—সরলতা ও প্রত্যক্ষতা। ইহা সমুদ্র-বক্ষোত্থিত শুচিস্নাত কুমারী পৃথিবীর ন্যায় অপরূপ সরলতার তপঃজ্যোতিতে আবৃত। ক্লাসিক-কাব্য যেন সমুদ্র-পর্ব্বত-অরণ্যানীর নৈসর্গিক সারল্যসুষমা-মণ্ডিত নিসর্গের সহিত একই ছন্দে অম্বিত। তাই যে সরল অনুভূতিগুলি সহজেই মানুষের উপলব্ধিগম্য হয়, যে স্থূল অনুভূতিগুলি অতি সাধারণ মানুষও জন্মাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়, সেই আদিম অনুভূতিগুলি ক্লাসিক কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। ক্লাসিক-কাব্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার গৌরব-সমুন্নতি বা sublimity। তাই যাহা বৃহৎ ও মহৎ, যাহা কল্পনা-অনুভূতিকে সহজেই ভাবের উচ্চগ্রামে তুলিতে পারে, যে জীবনের গৌরবোজ্জ্বল বিকাশ পর্ব্বতের ন্যায় অভ্রভেদী, সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শী, ঝড়ের ন্যায় প্রলয়ঙ্কর, সেই জীবনের বিকাশ-ই ক্লাসিক-কবির কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে। এই কারণে ক্লাসিক-কবি এমন একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কল্পনার জাল বিস্তার করেন যে-কাহিনীর কেন্দ্রস্থ ঘটনা একটি বীরত্ব উদ্দীপনাপূর্ণ যুদ্ধ

এবং একজন অসমসাহসিক বীর নায়ক যে কাহিনীর কেন্দ্রস্থ চরিত্র। ক্লাসিক কাব্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহার গঠন-রীতি। ক্লাসিক-কাব্যের গঠন স্থাপত্যধর্ম্মী, রোম্যাণ্টিক-কাব্য চিত্রধর্ম্মী। স্পষ্টতা-ঋজুতাই ক্লাসিক কল্পনার বৈশিষ্ট্য। ক্লাসিক-কাব্যের অনুভূতিগুলি যেমন সরল তাহার প্রকাশও তেমনি স্পষ্ট। রোম্যাণ্টিক-কাব্য কিছু বলে ভাষায়, কিছু বলে আভাসে। ক্লাসিক-কাব্য বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা রাখে না, পাঠকের কল্পনার উপর তাহার নির্ভরতা নয়, সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মতাকে সে পরিহার করিয়া চলে। ক্লাসিক-কাব্যের গতি নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষে, রোম্যাণ্টিক-কাব্যের গতি বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষে। তাই রোম্যাণ্টিক কবির অবলম্বন শব্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা-শক্তি, ক্লাসিক কবির অবলম্বন শব্দের বাচ্যার্থের ধ্বনি-গৌরব। প্রথমটির উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য উদাত্ত-গাম্ভীর্য্য (sublimity) সৃষ্টি। একটিতে কল্পনার সূক্ষ্মতা, অনুভূতির বিচিত্র লীলা, আর একটিতে কল্পনার ঐশ্বর্য্য-সমারোহ ও ব্যাপকতা।

ক্লাসিক-কল্পনার বাহন নাটক ও মহাকাব্য। তবে আধুনিক নাটক অনেকখানি রোম্যাণ্টিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিলেও মহাকাব্যে এই শ্রেণীর কবি-কল্পনা মধ্যযুগ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আধুনিক যুগ বিশেষভাবেই রোম্যাণ্টিক। আধুনিক যুগের মানুষের ব্যক্তি-সচেতনতা এমন উগ্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে ক্লাসিক-কাব্যের গঠন-সৌকুমার্য্য ও ঐশ্বর্য্য-সমারোহের দিকে কবির দৃষ্টি আর প্রলুব্ধ হয় না। বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এই ক্লাসিক কবি-ভাবনা একবার মাত্র দেখা গিয়াছিল মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যে।

মহাকাব্যই বোধ হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। প্রত্যেক প্রাচীন দেশে-ই সাহিত্যের প্রত্যুষ-যুগে এই শ্রেণীর মহাকাব্যের ভিতর দিয়াই জাতীয় সাহিত্যের অরুণোদয়-ক্ষণ সূচিত হইয়াছে। সুপ্রাচীনকাল হইতে যে বিভিন্ন লোকগাথা, কিম্বদন্তী, নীতিগল্প, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী দেশের আকাশে বাতাসে ধূলিকণায় অস্পষ্ট নীহারিকার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইত, সেই গল্পকথার নীহারিকাগুলি একদিন সংহত হইয়া মহাকাব্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দীপ্তি পাইয়াছে। Iliad, Odyssey, Bewulf, The Song of Roland প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি এইরূপ দেশ-পরিব্যাপ্ত গল্প-নীহারিকার সংহত রূপ। এইগুলিকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্য (authentic epic) বলা হয়। পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্যিক মহাকাব্যের (literary epic) সহিত এই শ্রেণীর

মহাকাব্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিচিত পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যগুলি সকলের কাছেই পরিচিত, তথাপি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের কিছু প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে।

স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্য অনেকখানি নিসর্গধর্ম্মী। তাহা হ্রদের ন্যায়, নদীর ন্যায়—যেন প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তের রচনা। সচেতন মানব-শিল্পীর স্থূল হস্তাবলেপ-চিহ্ন ইহার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। ইহার রচয়িতা বৃহত্তর যুগমানস; নির্দ্দিষ্ট কবি-মানস হইতে ইহার উদ্ভব নয়। সাহিত্যিক মহাকাব্য সচেতন-শিল্পীর রচনা, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের ন্যায় মৌখিক (oral) কাব্য নয়, লেখ্য (written) কাব্য। শ্রুতকাব্য ও পাঠ্যকাব্যের গঠনভঙ্গীতে যে পার্থক্য এই দুই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে সেইরূপ পার্থক্য বর্ত্তমান। প্রথম শ্রেণীর গঠন কিছু অবিন্যস্ত, শিথিল ও পারম্পর্য্যহীন। কোথায়ও কাহিনীর সূত্র হয়ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অন্তরালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, প্রাসঙ্গিক বিষয়-গুলিও হয়ত মূল ভাবভিত্তির সহিত অখণ্ড তাৎপর্য্যসূত্রে গ্রথিত হয় নাই। শ্রোতার উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্য এই শ্রেণীর কাব্যে বিস্তৃত পটভূমিকায় বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়। প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা বিশৃঙ্খলা, একটা নিয়মানুগত্যহীন, পরিপাট্যহীন বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যেও সেইরূপ একটা কেন্দ্র সংহতির অভাব স্পষ্টই ধরা পড়ে। ইহার তুলনায় সাহিত্যিক মহাকাব্যের গঠন সূচ্যগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ-সুনির্দ্দিষ্ট। ইহাতে স্তম্ভস্বরূপ প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলির উপর মূল ভাবটি অবলম্বিত থাকে এবং কাব্যাভ্যন্তরস্থিত সমগ্র আয়োজন-ভূমিকা সমস্ত আড়ম্বর-সমারোহ একটা সুনির্দ্দিষ্ট উৎসব-রাত্রিতে আতস-বাজির ন্যায় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবার জন্য অপেক্ষা করে। ইহার প্রত্যেকটি সুচিন্তিত শব্দ-যোজনা, প্রত্যেকটি সুনির্ব্বাচিত অলঙ্কার-প্রয়োগের পশ্চাতে সচেতন-শিল্পীর তীক্ষ্ণ-সজাগ দৃষ্টির প্রভাব অনুভব করা যায়। এই সুদৃঢ় কাব্যহর্ম্মের কোন গোপন-অলক্ষ্যের বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা কাব্যের অংশবিশেষে বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে না—ইহা সমগ্র কাব্য-সৌধকে তাসের ঘরের ন্যায় ভূমিস্যাৎ করে। মহাকাব্য সৃষ্টিতে তাই কবির শক্তির অগ্নিপরীক্ষা। রোম্যান্টিক কবির ভাণ্ডারে কিছু শব্দ-সম্পদ ও কিছু ভাব-সম্পদ থাকিলে তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অগ্রসরে সাহসী হইতে পারেন; কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির প্রতিস্পর্দ্ধী আর একটি জগৎ-সৃষ্টির শক্তি—কেবল শক্তি নয়,

অটুট মনোবল থাকিলে তবেই মহাকাব্য রচনায় কবি সাহসী হইতে পারেন।

গঠন-বিন্যাস ছাড়া ভাব-ভিত্তিতেও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও একটা পার্থক্য আছে। (উভয় শ্রেণীর মহা-কাব্যেরই আখ্যানাংশ একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ও একটি বীর-নায়ক চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যে এই বীরকাহিনী এক অপরূপ সরলতা ও স্বাভাবিকতার সহিত বর্ণনা করা হইয়া থাকে, কারণ বীরভাব সেই যুগের সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ। সে-যুগে মানব-মহিমার চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল বিজয়ীর সম্মান ও জয়মাল্য অধিকারে। শক্তিশালী বীর নায়ক ত্যাগ-আদর্শে নয়, বৈরাগ্য-অধ্যাত্মসাধনায় নয়, চারিত্র-গৌরবে নয়—শৌর্য্য-বীর্য্যের অগ্নিপরীক্ষার দ্বারাই সাধারণের হৃদয় জয় করিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। সেই শক্তিধর পুরুষ-সিংহের কাছে ধর্ম্ম, চরিত্র-নীতি, সমাজ-নীতি মস্তক অবনত করিত। এই বীরত্ব-সম্মানের কেন্দ্রানুগ সমাজ-জীবন হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের উদ্ভব। কিন্তু কালের বিবর্ত্তনে মানব-শক্তির একটা স্বতন্ত্র মহিমা আবিষ্কৃত হইল, মানুষের শৌর্য্য-বীর্য্য ও অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে কেবলমাত্র শূন্য সাধুবাদ ও ক্ষণস্থায়ী জয়মাল্যের দ্বারা অভ্যর্থনা না করিয়া এই শক্তির একটা বাস্তব-তাৎপর্য্য ও কল্যাণকর রূপান্তর সাধনের দিকে মানুষের সচেতনতা দেখা গেল। সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলিতে এই নূতনতর মহিমা ও তাৎপর্য্যের স্ফুরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীনযুগের বীর-নায়কদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও আত্মত্যাগের অম্লান গৌরব-দীপ্তি সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে দেশাত্ম-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে। যে শক্তি-চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল নায়ক-গৌরব, সেই সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিক উদ্দেশ্য দেশ ও জাতির মঙ্গলকর ব্যাপক উদ্দেশ্যে লীন হইয়া অধিকতর গৌরব-দীপ্ত হইয়াছে। তাই সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলি কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়, ইহা জাতীয়-কাব্য। ইহার নায়কও সাধারণ বীর নয়, জাতীয়-বীর। তাঁহাদের বীরত্ব কেবল দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মান আকর্ষণ করিয়া-ই নিঃশেষিত হয় নাই, বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গল-ব্রতে ব্যয়িত হইয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রাবণকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের নায়কের সহিত তুলনা করা যায়, মেঘনাদ সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক-গৌরব লাভ করিতে পারে। পরে ইহাদের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে পুনরায় ভাবিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে।

যুগ-পরিবেশ সাহিত্যিক মহাকাব্য আবির্ভাবের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে একটি জাতির একটি বিশেষ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখের কাহিনী বাণীরূপ পায়। সাহিত্যিক মহাকাব্যের কবি তাঁহার সমসাময়িক যুগের সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করেন, মহাকবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যুগ-মানসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যের আবির্ভাব তাই যুগ-প্রতিবেশের প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। রোম্যাণ্টিক কবির রচনা তাঁহার আপন খেয়াল খুশির রচনা, সে রচনা কল্পনার মুক্তপক্ষ আশ্রয় করিয়া যুগ ও কালের ব্যবধান সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। রোম্যাণ্টিক কবি যুগ-স্রষ্টা, ক্লাসিক কবি যুগেরই সৃষ্টি। যুগমানস ও কবিমানসের পরিপূর্ণ একীভবন না হইলে, কবির ব্যক্তি-সত্তা ব্যাপকতর সমাজ-সত্তায় পরিব্যাপ্ত না হইলে, কবির সহিত সেই যুগের প্রবৃত্তি-সংঘাতগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্য-সমর্থনসূত্রে বিধৃত না হইলে, সাহিত্যিক মহাকাব্যের উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে না। একটি বিশেষ-যুগে সমাজের সমস্ত বিরোধ-সংঘাত যখন একটা অখণ্ড ভাব-ঐক্যের মধ্যে বিরাম লাভ করে, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা-প্রেরণা যখন একটি বৃহত্তর আদর্শ-লক্ষ্যে শরবৎ ঋজু গতিতে ধাবিত হয়, তখনই সাহিত্যিক মহাকাব্যের আবির্ভাবের পক্ষে শুভক্ষণ।

এইরূপ শান্ত, বিরোধী-তরঙ্গহীন যুগ-পরিবেশ জাতীয়-জীবনের গৌরবোজ্জ্বল যুগে সম্ভব হইতে পারে না; সাহিত্যিক মহাকাব্য তাই জাতীয়-জীবনের গৌরবযুগে আবির্ভূত হয় না। অবশ্য ইহার মূলে অন্য গুরুতর কারণও ক্রিয়াশীল। সাহিত্যিক মহাকাব্যে জাতির সঞ্চিত ভাবসম্পদের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণ-শক্তির পরীক্ষা বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু রাজ্য-জয়ে, বাণিজ্য-বিস্তারে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারে বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রী দিয়া যে অর্থ-সম্পদ ও ভাব-সম্পদ দেশের ও জাতির মর্ম্মকোষে সঞ্চিত হয়, তাহার কতটুকু স্থায়ী ভাব-সম্পদরূপে জাতির সংস্কৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে পারিবে, কতটুকু উদ্গীরণে অপব্যয়িত হইবে, সে বিচারের জন্য কবির নির্লিপ্ত-নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির প্রয়োজন; কালের দূরত্বের আবরণ ভিন্ন তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আহার্য্য মানব-দেহের শক্তির উৎস হইলেও আহার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায় না; স্থূলপরিমাণ আহার্য্যের বিন্দুপরিমাণ নির্য্যাসই দেহ-কোষে সঞ্চিত হইয়া শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সেইরূপ জাতির গৌরব-যুগের জোয়ার-উচ্ছ্বাসে যাহা কিছু ভাসিয়া আসে তাহাকেই জাতির স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য করা যায় না। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস ভাঁটার টানে যখন শীর্ণ হয়, তখন

যে অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে সেইটুকু-ই জাতির স্থায়ী সম্পদ। তাই গৌরব-যুগের জলোচ্ছ্বাস ভাঁটার টানে শীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সাহিত্যিক মহাকাব্যের আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে না। একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক তাই বলিয়াছেন, "Literary epic, if we judge by its best eaxmples, flourishes not in the hey-day of a nation or of a cause but in its last days or in its aftermath···Periclean Athens, Elizabethan England, France under Louis XIV, had their own superb literature but not literary epic." মনে হয় এই কারণে বাংলাকাব্যে মহাকাব্যের অন্তঃপ্রেরণা অতি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং যে মহাকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যেও বিশুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ মহাকাব্য রচনার পক্ষে অনুকূল ছিল না।[১]

মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যে সাহিত্যিক মহাকাব্যের আদর্শ-ই অনুসৃত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের দুই-একটি বৈশিষ্ট্যও হয়ত গ্রীক সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁহার কাব্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, যথাস্থানে তাহার আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে। এখানে সাধারণভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে মধুসূদন মহাকাব্যের প্রেরণার (epic-inspiration) জন্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের কাছে ঋণী। তাঁহার কাব্যে তিনি দেশীয় ভাবকেই জয়যুক্ত করিয়াছেন এ কথা যেমন সত্য, অনুরূপ সত্য এই যে তাঁহার কাব্যের মূল আদর্শ-পটভূমি বৈদেশিক।

পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যগুলির যে spirit, কোন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে সে spirit থাকিতে পারে না। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যের সহিত ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় একটা হাস্যকর অসঙ্গতি দেখা যাইবে। স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যগুলির মধ্যে বীরত্ব-কাহিনী যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সে কাব্যের বীর-নায়ক-চরিত্রগুলি যে-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারতের কোন ঘটনা বা চরিত্রের সহিত তাহার মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। রামায়ণ-মহাভারতে বীর-চরিত্র আছে, সে কাব্যেও রাম-রাবণের ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু সে

১. C. M. Bowra, From Virgil to Milton, সাহিত্যিক মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এই বই-এর প্রথম অধ্যায়টি 'Some Characteristics of Literary Epic' হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

কাব্য-যুগলের মূল সুর যুদ্ধের তূর্য্যনিনাদ ও কোদণ্ড-টঙ্কারের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় নাই, সে সুর যুদ্ধের ঘনঘটা, বীরের বীরত্ব-আত্মত্যাগ, শৌর্য্য-বীর্য্যের মহিমাকে ছাপাইয়া জীবনের উন্নততর তাৎপর্য্যকে ব্যঞ্জিত করিয়াছে। সে-কাব্যের চরিত্রগুলিও বীরত্ব-গৌরবের সম্মানকে তুচ্ছ করিয়া, বীরের জয়মাল্যকে উপেক্ষা করিয়া, জীবনের মহত্তর সার্থকতার সন্ধান করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ বীরত্ব-প্রদর্শনের যুদ্ধ নয়—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ন্যায়-ধর্ম্মের যুদ্ধ।

রামায়ণ-মহাভারতকে বাদ দিলে অন্যান্য সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির সহিতও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলির মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলির মধ্যে যে জাতীয় সুর (national spirit) আছে, দেশ ও জাতি একটা অখণ্ড ভাবাদর্শরূপে সে কাব্যের চিত্র-গুলির চিন্তা ও কর্ম্মকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ভারতীয় মহাকাব্যগুলির চরিত্রের মধ্যে সেরূপ জাতীয় সচেতনতা দেখা যায় না। ভারতীয় কবি মর্ত্ত্যের মানুষের মধ্যে দেবদুর্ল্লভ মহত্ত্ব-মহিমার বিকাশ দেখিয়াছেন কিন্তু যে-কারণেই হউক জাতীয়তাবোধ তাঁহাদের মনন-কল্পনাকে কখনও অধিকার করে নাই। হয়ত ইহার কারণ ভারতীয় দৃষ্টির অখণ্ডতা। জাতীয়তাবোধের মধ্যে কিছু খণ্ডতা আছে, তাহা সকলকে এক করে না, বহুকে গ্রহণ করে না। জাতীয়তা-বোধ আপনাকে সঙ্কোচ করে; তাই বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী যাঁহারা উচ্চারণ করিয়াছেন, অখণ্ড ভূমানন্দের স্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন, জাতীয়তা-মন্ত্রের খণ্ড আদর্শ তাঁহাদের ধ্যানে ও সাহিত্যে আসিতে পারে নাই। অথচ এই national spirit সাহিত্যিক মহাকাব্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এবং মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্য সে বিশেষ লক্ষণে বিশেষিত। মধুসূদন এই জাতীয় আদর্শ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন সে বিচার গৌণ—হয়ত যুগপ্রভাব, হয়ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের প্রভাব, কিংবা হয়ত উভয়ই। এখানে প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয়, মধুসূদনের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের সহিত এই লক্ষণের চমৎকার সাদৃশ্য এবং প্রাচ্য মহাকাব্যে এই লক্ষণের অবর্ত্তমানতা।

এইবার মধুসূদনের কাব্যালোচনায় প্রবেশ করা যাইতে পারে।

॥ ২ ॥

মধুসূদনের প্রত্যেকখানি কাব্যের মধ্যে তাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিশক্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ছন্দের অভিনবত্বে, মেঘনাদ-বধ কাব্য মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্যসৃষ্টিতে, বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যের গঠন-বৈশিষ্ট্যে, ব্রজাঙ্গনা রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর নূতন বিন্যাসে এবং চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী কবি-মনের সহজ প্রকাশে ও সনেটের গঠন-বৈচিত্র্যে বাংলা কাব্যধারায় রূপগত ও ভাবগত বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের যে-কোন একখানি কাব্য লইয়াই স্বতন্ত্রভাবে দীর্ঘ আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে মধুসূদনের এই দীর্ঘ কাব্যভূমি (নাটক-প্রহসনগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে) পরিক্রমার অভিজ্ঞতা অতি সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উপায় নাই। কবির বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে একটি বিশেষ দিক—তাঁহার ক্লাসিক কবিমানসটির যথাজ্ঞান পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

মধুসূদনের এই ক্লাসিক কবিমানসের পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার মেঘনাদ-বধ কাব্যে। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর দীপ্তির পূর্ব্বে যেমন প্রভাত-সূর্য্যের মৃদু কিরণছটা, মেঘনাদ-বধ কাব্যের পূর্ব্বে তেমনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সহস্র রশ্মি কল্পনার কিরণ-প্লাবন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রোম্যাণ্টিক-কল্পনার জলাভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে ক্লাসিক-কল্পনার কঠিন ভূসংস্থান বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে তাহা একত্র সংহত হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের মহাকাব্যোচিত বিস্তার-ব্যাপকতা থাকিলেও ইহার কাহিনী-অংশের বস্তুদৈন্য ও সংহতির অভাব বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। মহাকাব্য ও মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা যে ঘটনাবহুল বর্ণনাত্মক কাব্য—এই প্রাথমিক লক্ষণটি উপেক্ষা করা যায় না। কল্পনার বিস্তার, গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি, ভাষার ওজস্বিতা, পটভূমির ব্যাপকতা—এই বৈশিষ্ট্যগুলি একটি সংহত, আদি-অন্ত-বিশিষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে; কিন্তু একটি সুবিন্যস্ত কাহিনীর অভাবে তিলোত্তমাসম্ভব মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা কাব্যের গৌরবলাভ করিতে পারে নাই। ইহা কবির অক্ষমতা নয়, স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়। কবি যেন ইচ্ছা করিয়া তাঁহার স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল পরিভ্রমণের মুক্তাজ্ঞা দিয়াছেন। যে শক্তি একটু সংযত

হইলে, একটু সচেতন হইলে বিরাট কাব্যসৌধ গড়িয়া তুলিতে পারিত, সে শক্তি যেন খেলাছলে বালুতীরে ঘর গড়িয়া কেবল ঘর ভাঙ্গিয়াই ফেলিয়াছে। কবি যেন শূন্য কাশের বনের তীর হইতে তাঁহার কল্পনা-প্রদীপকে কেবল অকারণেই ভাসাইয়া দিয়াছেন, দেওয়ালি-রাত্রির আলোক-সজ্জায় ব্যবহার করেন নাই। তিলোত্তমাসম্ভবকে তাই পূর্ণ কাব্যের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না; ইহা কাব্যের ভূমিকা বা নক্শা। কাব্যখানি দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, কবি যেন মূল কাব্য-পরিকল্পনার প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভাষা, কল্পনা ও ছন্দের উপর অধিকার আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পৌরাণিক সুন্দ-উপসুন্দর কেন্দ্রস্থ কাহিনীটি ঘিরিয়া কবি শব্দ-সঙ্গীত-অলঙ্কার ঐশ্বর্য্যকে লম্বিত করিয়াছেন। কাহিনীটি এই কাব্য-আভরণ-উপকরণগুলিকে ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্বনস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ক্লাসিক কবির দৃষ্টি বিশালতার দিকে, রোমান্টিক কবির দৃষ্টি সূক্ষ্মতার দিকে। তাই ক্লাসিক কবির তুলি স্থূল, রোম্যান্টিক কবির তুলি সূক্ষ্ম। এই কাব্যে মধুসূদনের কল্পনা রোম্যান্টিক জগতেই পরিভ্রমণ করিয়াছে, তাঁহার দৃষ্টি সূক্ষ্মতার দিকে, জীবনের মহত্তম-বৃহত্তম বিকাশগুলিতে নয়—সৌন্দর্য্যের রসাবেশে। তাঁহার লক্ষ্য যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কল্পনার পর কল্পনা, উপমার পর উপমার জাল বিস্তার করা। কাব্যের পরিণতি বা লক্ষ্য সম্বন্ধে কবি উদাসীন। মহাকাব্যের নীরন্ধ্র বস্তু-বিন্যাসের মধ্যে এই বাক্-বিস্তার ও ভাব-অসংযম কাব্যের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে। বাক্-বিস্তার—রোম্যান্টিক কবির বৈশিষ্ট্য। একই অনুভূতিকে নানা আবেশে, নানা ভঙ্গীতে আস্বাদন করিয়াও রোম্যান্টিক কবির তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ক্লাসিক কবির বাচন-ভঙ্গী ও বক্তব্যের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা-অতৃপ্তির রেশ নাই, বাক্-সংযমই তাই ক্লাসিক কবির বৈশিষ্ট্য। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গেই বাক্ ও অনুভূতি-অসংযমের প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে। 'ধবল শিখরো' নামক প্রথম সর্গটিকে প্রকৃতপক্ষে ধবল শিখরে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর মিলন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; এই মিলন-কাহিনীর এরূপ অতিপল্লবিত বিস্তারের কাব্যোপযোগিতা কতখানি সে বিচার না করিয়া কবি-মানসের পরিচয় লইতে গেলে দেখা যাইবে যে ক্লাসিক শিল্প-বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়া এই সর্গে কবি অতি ক্ষুদ্র-খণ্ড বিষয়ের উপরও মনোযোগ আরোপ করিয়াছেন। অসুর কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের করুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের বিবরণ প্রসঙ্গে ইন্দ্রের অমরাপুরী বৈজয়ন্ত ধাম, কনকাসন, রাজছত্র, নন্দনকানন, পারিজাত-ফুল, উর্ব্বশী-চিত্রলেখা-মিশ্রকেশী অপ্সরীবৃন্দ,

বজ্র, ধনু এমন কি ইন্দ্রের বিমান এবং বিমান-সারথি মাতলি পর্য্যন্ত কবির স্মরণপথে আবির্ভূত হইয়াছে। ধবল-শিখরে স্বর্গ-বিতাড়িত ইন্দ্রের নিঃসঙ্গ নির্জ্জন বাসের অপমান-গ্লানিকে তীব্র করিবার জন্য ইন্দ্রের 'পূর্ব্বকীর্ত্তি-গৌরবেরও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। আবার ইন্দ্রের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের দুঃসহ শোকান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য নিশি, নিদ্রা ও স্বপ্ন দেবীর যে ব্যাপক-প্রচেষ্টা—ইন্দ্রাণীকে আনয়ন, কুঞ্জ-কানন সৃষ্টি—তাহাও রোম্যাণ্টিক কবি-মনের সৃষ্টি। কাব্যের গতি যেন কুঞ্জ-কাননে গিয়া একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কবিও সকল উদ্দেশ্য-দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া বিভোর হইয়া কুঞ্জ-কাননের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তথাপি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের স্থানে স্থানে ক্লাসিক কবি-কল্পনার আভাসও পাওয়া যায়। কাব্যের সূচনায় ধবল-গিরির যে বর্ণনা এবং দানবদল কর্ত্তৃক দেববৃন্দের পরাজিত হইবার বিবরণ যে একটিমাত্র উপমার আশ্রয়ে ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা ক্লাসিক কাব্য-রীতির লক্ষণ সূচিত করে। ইহা ছাড়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত কল্পনা-বিস্তারে, ব্রহ্মলোকের সৌন্দর্য্য, দেবগণের অঙ্গদ্যুতি ও তাঁহাদের মন্ত্রণা-চিন্তার চিত্রগুলির বর্ণনায় কবি এক অপরূপ গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোথাও লৌকিক ভাব প্রধান হইয়া উঠে নাই; বিষয় ও ভাবের বর্ণনা মহাকাব্যোচিত উদাত্ত পটভূমির সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর বর্ণনায় কাব্যের একঘেয়ে হইয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা থাকে, কারণ এই কাব্যের বাহন মিলযুক্ত সহজ সঙ্গীত নয় এবং এই কাব্যের জগৎও পাঠকের পরিচিত নয়। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ছন্দ ভাবের unit-এ সুমিত কালের ব্যবধানে সৃষ্ট শব্দ-সঙ্গীত; এই শব্দ-সঙ্গীতের একতান প্রবাহ একটি অখণ্ড সুর-ধারা সৃষ্টি করে। ইহা বিহগকূজনের সঙ্গীত নয়, ঝরণার একতান সঙ্গীত। একটিতে মিষ্টতা আর একটিতে গাম্ভীর্য্য, একটি সহজবোধ্য তাই প্রাথমিক স্তরের, আর একটি আয়াসলভ্য তাই উচ্চ শ্রেণীর। এই কাব্যে মধুসূদন সঙ্গীত-সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা দেখাইতে না পারিলেও পরিবেশের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, কবির কল্পনা সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে পরিভ্রমণের ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। ব্রহ্মলোক, সুমেরু শিখর, উত্তর মেরুর বিশ্বকর্ম্মার সদন—এইরূপ বিচিত্র অলৌকিক জগতে সাধারণ কবির মন বিচলিত করিতে পারে না। এই জগতের অতি-বিশুদ্ধ বায়ুতে সাধারণ কবির

নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে এবং এই জগতে পরিভ্রমণের যে বাহন—শব্দ-মন্ত্র ও কল্পনা—তাহা সাধারণ কবির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না, এইখানে মহা-কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব। রোম্যান্টিক কবির মনও এইরূপ অলৌকিক জগতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু রোম্যান্টিক কবি এই জগতের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন, স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতা তাঁহার কাব্য-সাধনার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু ক্লাসিক কবি পাঠকদের যে-জগতে লইয়া যাইবেন সে-জগতের পরিবেশ-পটভূমি জল-বায়ু-আকাশের সহিত পাঠকদের সহজ-স্পষ্ট সম্পর্কে তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হয়। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রারম্ভেই ধবল-গিরির যে বর্ণনাটি আছে, সেটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে কবি কেবলমাত্র শব্দ-উপমা ও ছন্দের সাহায্যে ধবল-গিরি প্রদেশের নির্জ্জন-নিঃসঙ্গতা, অটল-গাম্ভীর্য্য, অভ্রভেদী মহিমা কেমন চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই বর্ণনা এই কাব্যের আরও বহু জায়গায় আছে—ব্রহ্মপুরীর বর্ণনা তাহাদের মধ্যে অন্যতম—কিন্তু সে বর্ণনাগুলির মধ্যে সংহতির অভাব আছে। ধবল-গিরির বর্ণনাটি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম।

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন ,
সতত ধবলাকৃতি, অচল অটল,
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী
যোগীকুলধ্যেয় যোগী।"

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন, সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল—এই ছয়টি বর্ণনামূলক বিশেষণ পরের দীর্ঘ উপমাটির মধ্যে গভীর তাৎপর্য্যমণ্ডিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রথম কাব্য বলিয়া হয়ত এই ছয়টি বিশেষণের অপব্যয় ঘটিয়াছে, মেঘনাদ-বধ কাব্যে এইরূপ শব্দের অপব্যয় সম্ভব হইত না। তথাপি সংহতির অভাব লক্ষ্য করা যায় না এবং শব্দ-উপমা-ছন্দ একত্র মিলিত হইয়া ধবল-গিরির ভাব-রূপ ও চিত্র-রূপ পাঠকের মানসপটে সহজেই স্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত করিয়া দেয়।

মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যেই মধুসূদনের ক্লাসিক কল্পনা-বৈশিষ্ট্যের চূড়ান্ত প্রকাশ। এ কাব্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-মহাকাব্যের আদর্শ কতখানি অনুসৃত হইয়াছে এবং মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও গঠন-রীতির প্রচলিত আদর্শ অনুযায়ী মেঘনাদ-বধ আদৌ মহাকাব্য কিনা—সে বস্তুমূলক বিচার-ব্যাখ্যা এ আলোচনায় অবান্তর বলিয়া মনে করি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের বাহ্যিক সাদৃশ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও উভয় দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য-বাহন—মহাকাব্যের পরিণতি একটি লক্ষ্যে আসিয়া মিলিয়াছে। সেই গভীরতম আন্তর বৈশিষ্ট্যেই মহাকাব্যের মহাকাব্যত্ব; তাহা হইল মহাকাব্যের গৌরব-সমুন্নতি। মেঘনাদ-বধ কাব্যের গৌরব-সমুন্নতি তাহার ভাষায়-উপমায়-ছন্দে, চরিত্রে-ঘটনায়-পটভূমিকায়, ভাবে-রসে-অনুভূতিতে; সুতরাং এই কাব্যের মর্ম্মগত মহিমাটুকু যাঁহারা ধরিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই কাব্যের মহা-কাব্যোচিত বাহ্য-বৈশিষ্ট্য বিচার অনাবশ্যক। এই কাব্যে মধুসূদনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টিতে, তীব্র আবেগ-অনুভূতি উদ্বোধনে, উদাত্ত-চরিত্র কল্পনায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে, দৃঢ়পিনদ্ধকায় গঠননৈপুণ্যে, কল্পনার ব্যাপকতায় ও গভীরতায়; আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণে ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত মানবিক-রস উৎসারণে। এই সমস্ত মিলাইয়া এবং সমস্ত কিছুর অতীত হইয়া নগাধিরাজ হিমালয়ের মহিমার ন্যায় এই কাব্যের গৌরব-সমুন্নতি।

এই কাব্যের পটভূমিকায় আছে স্বর্ণলঙ্কা। কিন্তু যে-সময়ের ঘটনা এই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সেটি লঙ্কার সমৃদ্ধি-যুগ নয়, পতনের যুগ। এই পতনের চিত্র কবি অপরূপ দৃঢ়তার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকা কোথাও কম্পিত হয় নাই। যে-সময়ে লঙ্কার গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইতে চলিয়াছে সেই প্রদোষান্ধকারের ধূসর পাণ্ডুরতার আস্তরণে আবৃত লঙ্কাকে কবি অপরূপ দক্ষতার সহিত তাহার পূর্ব্বগৌরব-পটভূমিকার সহিত সমন্বিত করিয়া দেখিয়াছেন। পতনের বিষণ্ণ-চিত্রের পশ্চাতে কবি অতি সতর্কতার সহিত গৌরবের উজ্জ্বল দীপ্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস যখন পতনের ভাটার স্রোতে শুষ্ক হইয়াছে, তখন সেই পঙ্ক-কঙ্কালপরিকীর্ণ কর্দ্দমাক্ত নদী-রেখার ন্যায় শীর্ণ লঙ্কার নিঃস্ব-রিক্ততা, শ্রীহীন ম্লানতা দেহের লাবণ্য-সুষমার অন্তরালে কলঙ্কের অস্থিমালার ন্যায় কবি

কৌশলে গোপন রাখিয়াছেন।

পতনের চিত্র আঁকিতে অসাধারণ শক্তি-সংযম-দৃঢ়তার প্রয়োজন। সমৃদ্ধির চিত্রে স্বাভাবিকভাবেই গৌরব ও দীপ্তি সঞ্চারিত হয়, কিন্তু গৌরব-সমৃদ্ধির উচ্চগ্রাম হইতে পতনের নিম্নতর গ্রামে যখন সুর নামিয়া আসে, তখন সেই নিম্নগ্রামে সমতা রক্ষা করিয়া উদাত্ত-গম্ভীর সুরের মধ্যে অন্তঃশীলা করুণ-রসের মিশ্রণ করিতে গেলে দুর্ব্বল শিল্পীর হাত কাঁপিয়া যাইবে, কারুণ্যের অশ্রুপ্লাবনে উদাত্ত-গাম্ভীর্য্য ভাসিয়া যাইবে, আবেগ-অনুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া চরিত্রের অভ্রভেদী চূড়া অবনমিত করিবে। মধুসূদনের কৃতিত্ব, তিনি আশ্চর্য্যভাবে সুরের সাম্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি পতনের চিত্রের মধ্যে ক্লাসিক-কাব্যের sublimity ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মেঘনাদ-বধ কাব্যে বীর-রস ও করুণ-রস, বলিষ্ঠতা ও কারুণ্য একাধারে পরিবেশিত হইয়াছে, একটি আর একটিকে গৌণ করিয়া ফেলে নাই। কেহ কেহ মেঘনাদ-বধ কাব্যকে করুণ-রসপ্রধান বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত বিচারে এ কাব্যে বীর-রস ও করুণ-রস পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়া আর একটির সার্থকতা নাই। কবি দাবী করিয়াছেন তিনি মেঘনাদ-বধ কাব্য heroic style অনুসারে রচনা করিয়াছেন; সমালোচকরা বলেন সেটা কবির মুখের কথা, কবি করুণ-রসের কাব্য লিখিয়াছেন—সেটা ভুল ধারণা।

মধুসূদন বীর-কাব্যই লিখিয়াছেন এবং তাঁহার পরিকল্পনাও ছিল তাই। তবে অমিশ্রিত বীর-রসের কাব্য এ-যুগে রচিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই কবি বীর-রসের কাঠিন্য করুণ-রসের কোমলতা দ্বারা সিক্ত করিয়া লইয়াছেন। যে-যুগে মেঘনাদ-বধ কাব্যের সৃষ্টি সে-যুগে রাম-রাবণের পৌরাণিক যুদ্ধের পুনরাবৃত্তিতে যে বীর-রস সৃষ্টি হইবে, সে বীরত্ব-আবেগকে এ-যুগের পাঠক উৎকন্ঠিত হইয়া গ্রহণ করিবে না; এ-যুগে কাব্যে অবিমিশ্র বীর-রস প্রকাশের উপযোগিতা নাই। তাহা ছাড়া, আধুনিক যুগ রোম্যান্টিক ভাবের যুগ। এ-যুগে কবির মনের একমুখীনতা প্রত্যাশা করা যায় না এবং একই লক্ষ্যে ও একই আদর্শে যুগমনকে নিয়ন্ত্রিত করা পূর্ব্বযুগে সম্ভব হইলেও এ-যুগে সম্ভব হইতে পারে না। তাই পূর্ব্বযুগে ক্লাসিক কবির মনে যেরূপ একই আদর্শের ও একই ভাবের অনুবর্ত্তন দেখা যাইত, বর্ত্তমান যুগের ক্লাসিক-কবির মধ্যে সেরূপ বিশুদ্ধি দেখা যায় না। সাহিত্যিক ইতিহাসে রোম্যান্টিক-যুগের আবির্ভাবের পর যখন আবার কৃত্রিম ক্লাসিক-আদর্শের অনুবর্ত্তন করা হয়, তখন সে ক্লাসিক-

কাব্যের মধ্যে রোম্যাণ্টিক কবি-মনের প্রভাব জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়ে। তাই মেঘনাদ-বধ কাব্যে শুধু বীর-রস নাই, বীর-রসের সঙ্গে আছে করুণ-রস। এই করুণ রস কবির ব্যক্তি-মনের সৃষ্টি। তাই মেঘনাদ-বধ কাব্যে যেখানে সম্ভব হইয়াছে সেইখানে কবি তাঁহার মনের অব্যক্ত ভাব, প্রচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুদ্ধ আবেগ-অনুভূতি দ্ব্যর্থক ভাষায় বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ রাবণ-চরিত্রকে কবির আত্ম-প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিধি বিড়ম্বিত শক্তিধর পুরুষ রাবণ কবির আত্মার-ই প্রতিরূপ—ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে এ ব্যাখ্যাকে একেবারে উপেক্ষা করাও যায় না। সে যাহা হউক, মোটের উপর ইহা অস্বীকার করা যায় না যে যুগপ্রভাবে নিতান্ত অনিবার্য্যভাবে রোম্যাণ্টিক কবি-মনের প্রকাশ এই কাব্যে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে এবং সেই কারণে মেঘনাদ-বধ কাব্যের ব্যক্তিক আবেদন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। তবে ইহার জন্য কাব্যের heroic style কোথাও ক্ষুন্ন হয় নাই। কাব্যের সূচনায় বীর-বাহুর পতনের চিত্রে বীর ও করুণ-ভাব মিশ্রিত যৌগিক-রস যেরূপ উদাত্ত-অনুদাত্ত ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই মেঘনাদ-বধ কাব্যের মৌলিক style।

যুদ্ধে বীরবাহুর পতন হইয়াছে, কিন্তু এ পতন তো কাপুরুষের পতন নয়; প্রকৃত বীরের পতন। কবি তাই উদাত্ত স্বরে আরম্ভ করিলেন, 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'। প্রথমেই 'সম্মুখ' শব্দটির সংযুক্ত ধ্বনিতে যেন সমুদ্র-শঙ্খের উদাত্ত স্বর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার সহিত 'সমরে' কথাটি যুক্ত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধের তীব্রতা, ভয়াবহতা, প্রচণ্ডতা যেন পূর্ণ হইল; মধ্যে 'পড়ি' কথাটি বীরবাহুর গৌরবসূচক নয়। তাই কবিও এমন জায়গায়, এমনভাবে শব্দটিকে স্থাপিত করিয়াছেন যে শব্দটি উচ্চারণে স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় না—অনায়াসে অসতর্কভাবে, আপনা হইতেই এই অমঙ্গলসূচক কথাটির খাদ হইতে পাঠকের উচ্চকণ্ঠের স্বর এক-প্রযত্নে-উচ্চারিত, 'বীরচূড়ামণি বীরবাহু'তে আসিয়া যেন তুঙ্গ স্পর্শ করে। 'সম্মুখ' হইতে 'বীরবাহু' পর্য্যন্ত একটি ভাব সম্পূর্ণ হইলে তবে যতি পড়িয়াছে। ইহাকে বলিতে পারি বীরভাবের অর্দ্ধ unit। কবি শব্দে, ভাবে, ছন্দে বীরবাহুর যুদ্ধ-বীরত্বকে সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাব-unit-এর ইহা একটি অংশ। বীরবাহুর বীরত্ব সত্ত্বেও তাহার যে পরাজয় ঘটিয়াছে সে কথা তো মিথ্যা নয়, তাই 'বীরবাহু'র পরে ছন্দও যেন ক্রন্দন করিয়াছে—চলি। যবে।

গেলা। যমপুরে। অকালে।—পূর্ব্ব-বাক্যটির ন্যায় দীর্ঘ বাক্যে ভাবের সম্পূর্ণতা নয়। প্রত্যেকটি শব্দ যেন অশ্রুবিন্দুর মত ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন ও নিরাভরণ; সংযুক্ত ধ্বনির প্রয়োগ একটিও নাই। বাক্যটিকে উচ্চারণ করিতে বক্ষ স্ফীত করিয়া নিশ্বাস লইতে হয় না। কথাগুলি এমন মর্ম্মান্তিক যে ইহারা যেন এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করিবার মত নয়; সহ্য করিয়া থাকিয়া, সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে সেই নিদারুণ বাক্য শেষ করিতে হয়। প্রথম বাক্যের বীর-ভাবের অর্দ্ধ-unit দ্বিতীয় বাক্যের করুণ-ভাবের অর্দ্ধ-unit-এর সহিত যুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইল। প্রথম বাক্যের বজ্র-নির্ঘোষে, বীরত্ব-আবেগে হৃদয় সমুদ্র-বক্ষের ন্যায় স্ফীত হয়, দ্বিতীয় বাক্যে সে স্ফীতি বিষাদ-কারুণ্যে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে পাঠক-হৃদয় একবার উচ্ছ্বসিত হইবে, একবার সঙ্কুচিত হইবে; একবার উত্তাল উর্ম্মিমালার শিখরে উন্নীত হইবে আর একবার পতনের পাতালান্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। এইভাবে সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের উদাত্ত শ্লোকরাশি পাঠক-হৃদয়কে অশ্রান্ত আবেগে আন্দোলিত করিয়াছে এবং ইহা হইতে যে-স্বর ব্যঞ্জিত হইয়াছে তাহা বীরও নয়, করুণও নয়; বীর ও করুণ স্বরের সমবায়ে সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র স্বর—তাহা sublime।

তাই মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে ভুলিতে হইবে যে এই কাব্য করুণ-রসের কাব্য, স্মরণ রাখিতে হইবে এ-কাব্য heroic style-এ লেখা। 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'—কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে ইহাই কবির প্রতিশ্রুতি। মেঘনাদ-বধ কাব্যের বীর-রস heroic poety-র প্রকৃতি অনুযায়ী সৃষ্ট, করুণ-রস রোম্যান্টিক কবির সৃষ্টি। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র রাবণের দুইটি রূপ—একটি নৈর্ব্যক্তিক, আর একটি ব্যক্তিক। এক-দিকে রাবণ লঙ্কাধিপতি, সমগ্র লঙ্কাবাসীর আশ্রয়, লঙ্কার সম্ভ্রম-গৌরব রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাহার মস্তকে—আর একদিকে রাবণ মেঘনাদের পিতা, প্রমীলার শ্বশুর, মন্দোদরীর স্বামী। তাহার বিস্তৃত বক্ষপট লঙ্কাবাসীর দুর্দ্দশায় যেমন অস্থির হইয়াছে তেমনি বীরবাহুর মৃত্যুতেও বিচলিত হইয়াছে। রাবণের সম্রাট্-রূপে অনুভূতি-কল্পনা বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়াছে, পারিবারিক-রূপে আবেগ গভীর ও ঘনীভূত হইয়াছে। একটিতে উৎসারিত হইয়াছে বীর-রস, আর একটিতে করুণ-রস। এই কাব্যে রাবণের যে দুইজন মহিষী পাঠকদের সম্মুখে তাহাদের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছে, তাহার একজন চিত্রাঙ্গদা আর একজন মন্দোদরী। চিত্রাঙ্গদার সহিত রাবণের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক, মন্দোদরীর

সহিত রাবণের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিক সম্পর্ক। বীরবাহুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদার শোকের মধ্যে ব্যক্তি-শোকের সঙ্কীর্ণতা নাই, রাবণের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের মধ্যে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ সুর ধ্বনিত হয় নাই—

"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী।"

এ অভিযোগ রাজার কাছে দীন প্রজার অভিযোগ; স্বামীর কাছে সহধর্ম্মিণীর অভিযোগ নয়। চিত্রাঙ্গদার বিলাপ-ধ্বনির সহিত সুর মিলাইয়াছে আরও বহু পুত্রহারা জননী। কিন্তু মন্দোদরীর বিলাপ একক-কণ্ঠের। এইভাবে মধুসূদন রাবণ-চরিত্রে মহাকাব্যোচিত উদার বিস্তৃতি আনিয়া তাহাকে ব্যক্তিক সুখ-দুঃখের অতীত করিয়া দেখাইয়াছেন, আবার তাহার পারিবারিক রূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাবণ-চরিত্রের পূর্ণ মানবিকতার দিকটিও উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। রাজা, প্রজার সহিত মিলিত হইয়া বহু; ব্যক্তি, নিজেতে স্বতন্ত্র হইয়া একক। রাজ-পরিচয়ে রাবণ সমগ্র লঙ্কাবাসীর সহিত মিলিত; ব্যক্তি-পরিচয়ে রাবণ সমগ্র লঙ্কাবাসী হইতে স্বতন্ত্র। মধুসূদন রাবণের মিলিত-রূপ ও একক-রূপ উভয়ই দেখাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কল্পনা-অনুভূতির ব্যাপকতা যেমন বাড়িয়াছে, গভীরতাও তেমনি বাড়িয়াছে।

তবে ইহা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক মহাকাব্যের আদর্শের পরিপন্থী। পাশ্চাত্ত্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্যে চরিত্রের ব্যক্তি-পরিচয় প্রধান, সাহিত্যিক মহাকাব্যে চরিত্রের ব্যক্তি-পরিচয় গৌণ, দেশ ও জাতির পরিচয় মুখ্য। "Homer concentrates on individuals, and their destinies···Virgil shows that his special concern is the destiny not of a man but of a nation, not of a Aeneas but of Rome.' মেঘনাদ-বধ কাব্যে 'individuals and their destinies'ও যেমন আছে আবার 'destiny···of a nation'ও তেমনি আছে। রাবণও যেমন আছে, স্বর্ণলঙ্কাও তেমনি আছে। যদি তুলনামূলক বিচার করা হয় তাহা হইলে

রাবণের কাছে স্বর্ণলঙ্কা গৌণ হইয়া যাইবে এবং রাবণের প্রতিনিধিত্বের রূপ তাহার ব্যক্তিত্বের রূপের কাছে ম্লান হইয়া যাইবে। মেঘনাদ-বধ কাব্যকে সে বিচারে চরিত্র-প্রধান কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—authentic মহাকাব্যের এই মৌলিক লক্ষণটি গ্রীকসাহিত্যের প্রভাবেই আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। ইহার পিছনে গ্রীক সাহিত্যের 'Man is the measure of all things'—মানববাদের এই নীতির সুস্পষ্ট ছাপ আছে।

॥ ৪ ॥

মেঘনাদ-বধ কাব্যের চরিত্র-পরিকল্পনায়, প্রেম-অনুভূতি প্রকাশে, নিসর্গ-বর্ণনায়, উপমা-প্রয়োগে ও চিত্র-উপস্থাপনে ক্ল্যাসিক কাব্যাদর্শনের অনুবর্তন দেখা যায়। এইবার সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

ক্লাসিক আদর্শে রচিত মহাকাব্যে বা মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যে একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠে। এই কারণে বীরত্ব গৌরব-ই এই কাব্যের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার বুদ্ধিবল অপেক্ষা বাহুবলের উপর যাহাদের নির্ভর তাহাদের মনের গড়ন সাধারণত সরল, সহজ ও নির্দ্বন্দ্ব হয়। এইরূপ দ্বন্দ্বহীন সরল, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল, বীরত্ব-গৌরবী চরিত্রই ক্লাসিক কাব্যের উপযোগী। তাহাদের বিরোধ অন্ত-প্রবৃত্তির সহিত নয়, বহিঃ-শক্তির সহিত। এই শক্তি কোথায়ও রূপ পায় বিরোধী শত্রুপক্ষে, কোথায়ও অদৃষ্ট নামক এক অদৃশ্য নিয়ামক-শক্তিতে। আবার ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে বিরোধী শত্রুপক্ষ অদৃষ্ট নামক তত্ত্বের বাস্তব রূপ। এই বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়াই তাহাদের চরিত্র-গৌরব, পৌরুষ, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা প্রকাশিত হয়। জয়-পরাজয়ের পরিণতির দ্বারা এই শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্ব প্রমাণিত হয় না; সংগ্রাম-শক্তিতেই সে শক্তির অগ্নি-পরীক্ষা। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের শক্তি কোথায়ও সাফল্যের জয়-ঘোষণায় অভ্যর্থিত হয় নাই, তথাপি এই চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা, বজ্র-কঠিন পৌরুষ অন্যান্য চরিত্রের সাফল্যের কাছে ম্লান হইয়া যায় নাই। মেঘনাদ-বধ কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদের এই শক্তি-

গৌরবই তাহাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মেঘনাদ-বধ কাব্যের বিধি-বিড়ম্বিত শক্তিধর রাবণের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের করুণকাহিনীকে কবি সূর্য্যাস্তকালের বর্ণসমারোহের দীপ্তি আনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রাবণের শক্তি যেন Pagan শক্তির সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। সে-শক্তি যেন নিসর্গ শক্তির ন্যায় আদিম, অনিয়মিত। বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকাকুল রাবণকে মন্ত্রী সারণ এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছে—

"অভ্রভেদী-চূড়া যদি যায় গুঁড়া হ'য়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে।"

রাবণের শক্তির মহিমা ভূধরের ন্যায় দুর্জ্জয় দুস্তর, অভ্রভেদী। 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ'—এই উক্তির মধ্যে রাবণের চরিত্রের গভীরতম সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদ্রের নিসর্গ-শক্তি রাবণের শক্তিরই সমধর্ম্মী। এই নিসর্গ-শক্তির অভ্রভেদী চূড়া অবনমিত হয় না। সে-শক্তি প্রলয়ের দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়া ভস্মীভূত করে অথবা ভস্মীভূত হয়, প্রকাশের প্রচণ্ডতাই সে শক্তির পরিচয়। সেই শক্তিকে প্রস্তর-শৃঙ্খল ধারণ করিতে দেখিয়া রাবণের নিজ-শক্তি যেন ক্ষুব্ধ-অপমানিত হইয়া বলিয়াছে—'রেখো না তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা।'

এই শক্তিকে একদিকে বিধি আর একদিকে রাম দিনে দিনে হীনবীর্য্য করিতেছে। রাম ক্ষুদ্রমতি নর, বাহুবলে তাহাকে পরাস্ত করা যায়। রাবণের ক্ষোভ-আশঙ্কা-ভয় রামের জন্য নয়। সে ভয়শূন্য হৃদয় মনুষ্যভয়ে কখনও ভীত হয় না; সে বজ্র-কঠিন হৃদয় শতপুত্রের মৃত্যু-যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়, কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়ে না। রাবণের অভিযোগ-আক্রোশ তাহার অদৃশ্য ভাগ্যনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে; যে গোপন অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি রাবণের শক্তিক্ষয়ের কূটচক্রজাল বিস্তার করিতেছেন রাবণের দম্ভোলী সে স্থানের নাগাল পায় না, তাই রাবণের শক্তির অপমান বিধির কাছে, তাহার হৃদয়ের বিলাপ সেই অদৃশ্য ভাগ্যনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে। রামের শক্তিকে সে তৃণসম জ্ঞান করে।

বিধির দ্রুতগতি রথচক্রের তলে রাবণ পিষ্ট হইয়াছে, তথাপি রাবণ-চরিত্রে কোন দ্বিধা-সংশয়-দ্বন্দ্ব স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাবণের রাজসভার সারি সারি স্তম্ভের ন্যায়ই রাবণের মনের গড়ন উন্নত, সরল। কোন বিরোধী

চিন্তার আবর্ত্ত, অন্যায় অধর্ম্মের অভিযোগ কোনরূপ আত্ম-বিশ্লেষণের চেষ্টা রাবণ-চরিত্রে নাই। পুত্রহারা জননীর কাতর বিলাপে, স্বামীহারা বিধবার করুণ আর্ত্তনাদে রাবণের মনে কোন সংক্ষোভ, কোন আলোড়ন, কোন দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। রাবণ যাহা করিয়াছে, সজ্ঞানে সত্য জানিয়া তাহা করিয়াছে; দশে তাহাকে দুষ্কর্ম্ম বলুক, রাবণের নিজের কাছে তাহার জন্য কোন অনুশোচনা, কোন অনুতাপ নাই। রাবণ যে-পথে চলে সে পথ শুধু আগাইয়া যাইবার পথ, পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার পথ নয়। চিত্রাঙ্গদার কঠোর অভিযোগে নিরুত্তর রাবণ—'শোকে, অভিমানে, ত্যজি স্বকনকাসন, উঠিলা, গর্জ্জিয়া রাঘবারি'। শোক বীরবাহুর পতনে, চিত্রাঙ্গদার বিলাপে। কিন্তু অভিমান কেন? এ অভিমান কিসের জন্য, কাহার উপর? অভিমান চিত্রাঙ্গদার উপর। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—ত্রিভুবন রাবণের বিরুদ্ধে; সকলেই জানে রাবণ অধর্ম্মাচারী; ঠিক সেই অভিযোগই নিজের স্ত্রীর মুখে? স্ত্রীর কাছে তাহার শক্তির মর্য্যাদা স্বীকৃত হইল না, তাহার পৌরুষ সম্মানিত হইল না, তাহার দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হইল না; তাই অভিমান। এইরূপ বলিষ্ঠ উন্নতশীর্ষ, একমুখী চরিত্র-ই ক্লাসিক কাব্যের উপযোগী। মধুসূদন শোকের অগ্নিশিখায় রাবণের শক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। রাবণের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের করুণ পটভূমিকায় রাবণের শক্তিই সহস্রগুণিত হইয়াছে। তাহার শক্তির অগ্নি-পরীক্ষার জন্য এইরূপ একটি পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল। তাই বলিতে পারি, এ-কাব্যে করুণ রস থাকিলেও সে করুণ-রস বীর-রসকেই পুষ্ট করিয়াছে; এবং সে বীর-রস প্রধানত শক্তিশালী রাবণ-চরিত্র হইতে উৎসারিত হইয়াছে। কবি heroic poetry-র বীরত্ব-গৌরব কোদণ্ড-টঙ্কার ও গদাস্ফালনের দ্বারা বর্ণনা করেন নাই। কবি বীরত্বের বস্তু-পিণ্ডকে পরিহার করিয়া কৌশলে বীরত্বের spiritটুকু গ্রহণ করিয়াছেন। রাবণ-চরিত্রের শক্তি কেবল যুদ্ধ-শক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সে-শক্তি চরিত্রের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। সাহিত্যিক মহাকাব্যের নীরন্ধ্র ও সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ গঠন-রীতির উপর বৃহৎ পরিমাণ বস্তুভার চাপাইতে গেলে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না; তাই সূক্ষ্মদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কবিকে বস্তু হইতে অধ্যাত্ম-শক্তি (spirit) নিষ্কাশন করিতে হয়; সেদিক দিয়া মধুসূদনের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। এ কাব্যের কেন্দ্রে যুদ্ধের বর্ণনা মাত্র একবার, কিন্তু পটভূমিকায় আছে একটা বিরাট প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের আয়োজন। কবি কৌশলে সেই প্রলয়াত্মক যুদ্ধের spirit-টুকু গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন আড়ম্বরকে

কাব্যের নেপথ্যেই রাখিয়া দিয়াছেন। সেই যুদ্ধ-অবরোধের ভূমিকায় রাবণ-চরিত্রের শক্তি সুপ্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক-চরিত্রের আবেগ-অনুভূতিগুলিতেও সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিভাব অপেক্ষা সার্ব্বজনীন-ভাবই প্রধান হইয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রোম্যান্টিক-কাব্যের গতি বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষে, ক্লাসিক-কাব্যের গতি নির্ব্বিশেষ হইতে বিশেষে। ইহার আরও একটি কারণ এই যে সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক-চরিত্রের মাধ্যমে একটি দেশের—একটি জাতির আবেগ-অনুভূতি বাণীরূপ পায়, তাই এ কাব্যের অনুভূতিগুলি যদি ব্যক্তি-মনোভাব-প্রধান হয়, তাহা হইলে সেগুলির মধ্যে সমাজ-মনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। তাই মহাকাব্যের কবিকে অত্যন্ত কৌশলে একটি বিশেষ চরিত্রের ভিতর দিয়া নির্ব্বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করিতে হয়। বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে বিশেষ অনুভূতি-ই প্রকাশ পায়, সেইটিই সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু মহাকবির দায়িত্ব ইহা অপেক্ষা অধিক, তাই কাব্যের বিশুদ্ধ objective কল্পনার আশ্রয়ে আত্মভাবকে পরিপূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কবিকে পাত্র-পাত্রীর ভাবে ভাবিত হইয়া যাইতে হয়। মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রথম সর্গেই বীর-নায়ক রাবণের শোক-বর্ণনার মধ্যে এই নির্ব্বিশেষে অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। এই শোক-বর্ণনায় যে সংযম ও সংহতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা মেঘনাদ-বধের ন্যায় ক্লাসিক কাব্যের-ই উপযুক্ত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কবি পুত্র-শোকাকুল রাবণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া কাব্যের সূচনা করিলেন, তাহা করুণ রস বর্ণনার উদ্দেশ্যে নয়। চিত্র-শিল্পী যখন সূর্য্যোদয়ের চিত্র আঁকেন তখন পূর্ব্ব-দিগন্তের ভূমিকাটিকে তিনি এক ধূসরপাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত করেন, সেই পাণ্ডুরতার উপর অরুণ-রাগ-রেখা অধিক উজ্জ্বল হয়। মধুসূদনও সূচনায় এই করুণ-রসের অবতারণা করিয়াছেন, পটভূমি প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে। আবার অনেক শিল্পী আছেন যাঁহারা পটভূমিকেই উজ্জ্বল ও বৃহৎ করিয়া মূল বিষয়টিকে দর্শকের অনুভবের উপর ছাড়িয়া দেন; মধুসূদনও রাবণের কারুণ্যের দিকটি মুখ্য করিয়া তাহার বীর্য্য-গরিমার দিকটি পাঠকের অনুভবের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তবে এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা রোম্যান্টিক-আর্টের ন্যায় অস্পষ্ট ও ব্যঞ্জনাধর্ম্মী হয় নাই, অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই কাব্যে রাবণের পাপের চিত্র নাই, যেটুকু আছে তাহাও নেপথ্য-

বর্ণনায় ; এ কাব্যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের চিত্র-ই অঙ্কিত হইয়াছে। তবে ইহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শোকের অগ্নিদাহে রাবণ যেন এক অপরূপ বিশুদ্ধি ও অধ্যাত্মশক্তি লাভ করিয়াছে। প্রথমেই রাবণের যে মূর্ত্তিকে কবি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা শোক-বিধৌত এক রমণীয় পবিত্র মূর্ত্তি—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষ কুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে॥"

প্রথমেই 'তরু'-বিশেষণটিকে কবি রাবণের শক্তিকে নিসর্গ-শক্তির সহিত এক করিয়া দেখিলেন। 'তরোরিব' সহিষ্ণু রাবণের প্রথম উক্তি বীরবাহুর পতনে অবিশ্বাস, 'নিশার স্বপন-সম তোর এ বারতা, রে দূত'। যে বীর, যে শক্তি-নির্ভর, সে শক্তির পরাজয় কল্পনা করিতে পারে না। তাই বীরবাহুর পতন-সংবাদ সত্য হইলেও সে-ঘটনা যেন কালরাত্রির দুঃস্বপ্নের ন্যায়, অবচেতন মনের ঘনান্ধকারে তাহা সংঘটিত হইয়াছে। 'অমরবৃন্দ যার ভুজবলে কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে?' এ সংবাদ স্বপ্নের ন্যায়ই অবিশ্বাস্য, প্রত্যক্ষ দিবালোকে সচেতন বুদ্ধির জগতে এ অসম্ভব হইতে পারে না। ইহার পর রাবণের যে শোক তাহা বীরবাহু-পিতা রাবণের শোক নয়, লঙ্কাধিপতি রাবণের শোক। রাবণের ব্যক্তি-হৃদয়ের হাহাকার লঙ্কার সম্ভ্রম রক্ষার চিন্তায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—

"কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!"

রাবণ-চরিত্রের মধ্য হইতে উৎসারিত হইলেও এ-শোকে রাবণ-চরিত্রের বিশেষত্বও যেমন আছে, লঙ্কাবাসীর সাধারণত্বও তেমনি আছে। রাবণের চরিত্র-উৎসারিত হইয়া ইহার গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, লঙ্কাবাসীর শোকের ছায়া পড়িয়া ইহা বিপুল ব্যাপ্তি ও উদার সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছে। একবার মাত্র রাবণের রাজাভরণের অন্তরাল হইতে তাহার পিতৃহৃদয় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে—

"...হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল-হৃদয়

ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয ধন লয কেহ হরি।”

কিন্তু এই ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা, এই মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া রাবণ যেন বীর-হৃদযকে দ্বিগুণ শক্ত করিযা বলিয়াছে,

“কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী।”

ইহার পর দূত বীরবাহুর বীরত্বের যে বর্ণনা দিযাছে তাহার সার্থকতা কি? হতপুত্রের পতনের বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনিবার জন্য পিতৃ-হৃদয উৎকণ্ঠিত হয় কেন? দুর্ব্বল-হৃদয শোক প্রকাশ করে ক্রন্দনে অথবা আবেগ-উচ্ছ্বাসে। বীর রাবণ জানে তাহার পুত্র সম্মুখ-যুদ্ধে বীরের ন্যায প্রাণ দিযাছে, তাই বীরবাহুর সেই অপূর্ব্ব কাহিনীর বিবরণ শ্রবণ করিযা রাবণ শোককে লঘু করিতে চাহিয়াছে। ইহা পুত্রের মৃত্যুর পটভূমিকায় পুত্রের বীরত্ব আস্বাদন, পুত্রের মৃত্যু-শোককে পুত্রের বীরত্বের আবরণে আবৃত করিবার চেষ্টা। ইহা বীর নাযকের উপযোগী। সে বীর-কাহিনী শ্রবণ করিয়াও হৃদয পরিতৃপ্ত হইল না। ভগ্ন রথ, মৃত হস্তী-অশ্বের মধ্যে শব-কঙ্কাল-পরিকীর্ণ রণক্ষেত্রে পুত্রের রক্তাপ্লুত ধূলিধূসরিত দেহ না দেখিতে পারিলে হৃদয শান্ত হইবে না—

·· চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু ঃ চল দেখি জুড়াই নযনে।”

তাই শোকের বর্ণনা দিযা আরম্ভ করিলেও ইহা রাবণের বীর-হৃদযকে, তাহার শোক-অকম্পিত হৃদযকেই উদ্দীপ্ত করিয়াছে। কিন্তু বিধি বাম, তাই এই প্রচণ্ড শক্তি আত্মনিগ্রহেই নিঃশেষিত হইয়াছে।

রাবণের ন্যায মেঘনাদও শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর। তবে রাবণের শক্তি আদিম শক্তি, তাহা প্রেম ও কল্যাণের মন্ত্রে শোধিত নয়; সেই কারণে রাবণ কেবল তীব্র দহন-জ্বালাই সহ্য করিয়াছে এবং মেঘনাদ নিমেষের মধ্যে জ্বলিয়া সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অতীত হইয়াছে। রাবণের শক্তিতে পাপ যুক্ত হইয়াছে; তাহার শক্তি জগতের কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ্র-পবিত্রতাকে ভস্মীভূত করে। তাহা জগতের বুকে প্রলয়ের ঘূর্ণিবাত্যা। তাই রাবণের অমঙ্গল দানব-শক্তিতে ক্ষয় করিবার জন্য দেব-নর যুক্ত হইয়াছে। রাবণ তাহার পতনের জন্য অবশ্য বিধিকেই দায়ী করিয়াছে, কিন্তু সে-বিধি কে? জগতের কল্যাণ ও

মঙ্গল-শক্তিই সেই বিধি। এই কল্যাণ-শক্তির কাছে রাবণের দানব-শক্তি পরাজিত হইয়াছে। মেঘনাদের শক্তি অপাপবিদ্ধ, তাহা প্রেমে-ভক্তিতে, কর্ত্তব্যে-পৌরুষে, মাধুর্য্যে মহিয়সী। সে শক্তিতে জ্বালা নাই দীপ্তি আছে। সে অনির্ব্বাণ প্রচণ্ড সূর্য্য-দীপ্তিও মুহূর্ত্ত মধ্যেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে এবং তাহা রাবণের বক্ষের ক্ষতকেই গভীর করিয়াছে। কিন্তু এ অম্লান দীপ্তি সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নয়, এ অপাপবিদ্ধ বীরের পতন সহজে হইতে পারে না; মায়া দেবী স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"কিন্তু হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে।"

কিন্তু 'মরে পুত্র জনকের পাপে'।

প্রমোদ-কাননের রম্য পরিবেশে মেঘনাদের প্রথম আবির্ভাব। তাহার উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি উৎসবে-ব্যসনে, যুদ্ধে-বীরত্বে, মাধুর্য্যে-শৌর্য্যে সমানভাবে ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু মনের কি সহজ সরল গতি! যখন প্রমোদোদ্যানে লীলা-সহচরীদের সহিত মেঘনাদ প্রমোদ-রত তখন যুদ্ধের কোন চিন্তা, কোন উদ্বেগ, কোন চঞ্চলতা মনে ছায়াপাত করে নাই। এ শক্তি যেন ঝরনার ধারার মত কেবল বহিয়াই যায়, অশ্রান্ত গতি-ই এ-শক্তির বৈশিষ্ট্য। এ প্রবাহে কোথায়ও আবর্ত্ত, কোথায়ও স্থিরতা, কোথায়ও কুণ্ডলী, কোথায়ও বক্রতা নাই। তাই ধাত্রী প্রভাষার রূপধারী লঙ্কার রাজলক্ষ্মী রমা যখন বলিল—'হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী', তখন 'জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া'। এই বিস্ময় তাহার চরিত্রগত বিস্ময়। সে শক্তিমান, তাহার শক্তির উপরই সে নির্ভরশীল; সে যুদ্ধে একবার যাহাকে পরাস্ত করিয়াছে, যাহাদের 'খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু বরষি প্রচণ্ড শর বৈর-দলে'—সেই পর্য্যুদস্ত-পরাভূত বৈরীদল আবার শক্তি-সঞ্চয় করিয়া প্রিয়-ভাই বীরবাহুকে বধ করিয়াছে এ অদ্ভুত সংবাদ মেঘনাদের বিশ্বাসের অতীত, অভিজ্ঞতার বাইরে। বাহু-শক্তির অতীত যে কোন দৈব-শক্তি আছে, সে ধারণা মেঘনাদের নাই। মেঘনাদের সরল বীর-হৃদয় জানে না শক্তির অগম্য কোন্ অদৃশ্য বিধির অঙ্গুলিসঙ্কেতে নাগপাশের বন্ধন গরুড় সন্দর্শনে পলায়নপর নাগেরা খুলিয়া ফেলে, করায়ত্তসিদ্ধি মুহূর্ত্তমধ্যে এমন করিয়া স্খলিত হইয়া যায়, পরিপূর্ণ আনন্দের আয়োজন কোন্ মন্ত্রে করুণ ভৈরবীর মধ্যে শেষ হয়। এইরূপ সরল এক মনোভাব-সম্পন্ন বীর-চরিত্র এপিক্-কাব্যের

উপযোগী। দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল, ব্যক্তিমনোভাব-প্রধান চরিত্র অপেক্ষা রাবণ-মেঘনাদের ন্যায় দ্বন্দ্বহীন, একমুখী চরিত্রই মহাকাব্যে চিত্রিত করা হয়।)

প্রভাষার মুখে বীরবাহুর পতন-সংবাদ শুনিয়া—

"ছিঁড়িয়া কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়।"

যে-শক্তি শরতের লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় পর্ব্বতের সানুদেশে ক্রীড়ারত ছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সে মেঘের বক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। প্রমীলা যুদ্ধের সে মর্ম্মান্তিক সংবাদ তখনও শোনে নাই, তাই প্রণয়মুগ্ধ প্রেমিকার ন্যায় প্রমীলা মেঘনাদকে জিজ্ঞাসা করে—

"………কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?"

ইহার উত্তরে ইন্দ্রজিতের উক্তি লক্ষ্যণীয়—

"………ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? (ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে।"

এই উক্তির মধ্যে প্রেম ও কর্ত্তব্য, বীরত্ব ও প্রণয়-গভীরতা, পত্নীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং আত্মশক্তির উপর অকুণ্ঠ আস্থা, যৌবন-ধর্ম্ম ও দেশ-ধর্ম্ম যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া এই প্রেমকে প্রকৃত বীরকাব্যের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।) এই ক্ষণিক বিচ্ছেদে কোনপক্ষেই অশ্রুমোচন নাই, এই প্রণয়-রঙ্গনাট্যের উপর আকস্মিক ভাবে যবনিকা পড়িল বলিয়া কাহারও মনে কোন খেদ নাই, যেখান হইতে এই আহ্বান আসিয়াছে তাহার কাছে ক্ষুদ্র প্রণয়-লীলা তুচ্ছ, কোন বীর-হৃদয় সে আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে না। (কিন্তু বীর-হৃদয় তো লৌহনির্ম্মিত নয়, তাই প্রণয়াকাজ্ক্ষা, যৌবনাবেগকেও লঘু করা হয় নাই, তাই 'ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া'। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাপিত হইলে আবার এ প্রেম-উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। বীর-নায়কের প্রেম; এই উক্তিতে প্রেমের গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত হইয়াছে, বীরধর্ম্মও তেমনি

অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, দেশ-ব্রতের আদর্শও নায়ক-হৃদয়ে উজ্জ্বল—এই তিনটি ভাবের মধ্যে কবি সংক্ষেপে অতি অদ্ভুতভাবে এক অপরূপ সাম্য-সুষমা বজায় রাখিয়াছেন। এই প্রেমে মাদকতা আছে কিন্তু আত্মনিমজ্জন নাই, এ প্রেমে গভীরতা আছে, রস-বিভোরতা নাই। এ প্রেমে শৌর্য্য ও মাধুর্য্যের সম্মিলন।)

প্রমীলার মধ্যেও কবি প্রেমিক-সুলভ আর্ত্তি ও বীরকাব্যের নায়িকা-সুলভ সাহসিকতা একত্র করিয়া দেখাইয়াছেন। (প্রেম ও বীরত্ব, কোমলতা ও তেজ একই চরিত্রের মধ্যে একটি ঘটনার আশ্রয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদের দীর্ঘ বিলম্বের হেতু বুঝিতে না পারিয়া সাধারণ নায়িকার ন্যায়ই প্রমীলার আবেগকম্পিত কণ্ঠে বিরহ-আর্ত্তি ফুটিয়াছে—

"এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী ;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"

ইহার পর প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের দৃশ্যটিও স্মরণীয়—

"......পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?")

স্বামী মেঘনাদের উদ্দেশ্যে প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশে মহা সিন্ধু-অভিমুখী নদীর গতি। মেঘনাদ-প্রমীলার যে দৃঢ় প্রণয়-বন্ধন তাহা নদীর ও মহাসিন্ধুর প্রণয়বন্ধনের ন্যায় ; তাহা উপলখণ্ডের বাধাকে দুর্ব্বার গতিতে অপসারিত করে। প্রমীলার প্রেমে পার্ব্বত্য নদীর দুর্ব্বার আকর্ষণ, প্রমীলার প্রেমের শক্তিও পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় প্রচণ্ড। প্রেমের এই দুর্ব্বার আকর্ষণ ও প্রচণ্ড শক্তি একটি উপমার মধ্যে কবি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই তেজ, এই শক্তিই প্রমীলার সব নয়। এই তেজের সঙ্গে আছে প্রেমের কোমলতা, প্রেমিকার আত্মনিবেদন। যে নারী অগ্নিতেজে দীপ্তা, স্বামীর কণ্ঠলগ্না সেই নারী মৃগ-শিশুর ন্যায় নিরীহ প্রণয়মুগ্ধা। মেঘনাদের বক্ষে প্রমীলা যেন সাগরবক্ষে শান্ত নদী-ধারা, যেন হরবক্ষে পার্ব্বতী। তাই প্রমীলা শ্বশুর রাবণ এবং স্বামী মেঘনাদের মতই বীরকাব্যের উপযোগী চরিত্র। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে এই নারীকে তিনি কেবল বীরাঙ্গনা করিয়াই গড়েন নাই, তাহার চিত্তে নারীত্বের মাধুর্য্য ও কোমলতাটুকু বজায় রাখিয়াছেন। মেঘনাদের বিদায় লইবার পর স্বামীর মঙ্গলকামনায় প্রমীলার উক্তিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;—
"প্রমীলা, তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।
অভেদ্য-কবচরূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখো, মা, কুঠার যেন, না স্পর্শে উহারে।
আর কি কহিবে দাসী? আন্তর্য্যামী তুমি,
তোমা বিনা জগদম্বে, কে আর রাখিবে?"

(মেঘনাদ-বধ কাব্যের শোক ও প্রেম-বর্ণনায় কবির সংহত-সংযত-অনুচ্ছ্বসিত কল্পনাবেগ যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি আর একটি বস্তুও লক্ষ্য করিবার আছে।) সেটি হইল মাতা ও পত্নীর নিকট হইতে মেঘনাদের বিদায় দৃশ্যে কবির সংযম। অন্য কোন বাঙ্গালী কবির আবেগ-উচ্ছ্বাস-ক্রন্দন কূলপ্লাবী হইয়া কাব্যের আরও অন্ততঃ দুইটি সর্গে বিস্তৃত হইত। কিন্তু (মধুসূদনের অসাধারণ সংযম, আবেগ ও মানব-রস উদ্বোধনের অতুলনীয় ক্ষমতা এবং সেই আবেগকে কাব্যের তটবন্ধনের মধ্যে সংহত ও ঘনীভূত করিয়া রাখিবার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া আরও বহু দৃশ্যের ন্যায় এই দৃশ্যেও পাঠক বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইবে।) কবি যেন মহাকালের দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া দুর্ব্বার গতিতে রথ-চালনা করিয়া গিয়াছেন, সে রথ-চক্র তলায় কত সতীসাধ্বীর স্বামী প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত পুত্রবৎসলা জননীর সন্তানের মস্তক চূর্ণ হইয়াছে, কত প্রমোদ-কানন সমভূমি হইয়াছে, কবি ফিরিয়াও তাকান নাই। অশ্রুসজল নেত্রে পথের দুইধারে যাহারা ক্রন্দনরত হইয়াছে কবি অধরে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তাহাদের চুপ করিতে বলিয়াছেন,—কবির নিজের বুক তো পাষাণে গড়া। (এইরূপ নিষ্ঠুর, এইরূপ ভয়ঙ্কর, উদাসীন, ধূমকেতু-ওঠা আকাশের মত এইরূপ ভয়ঙ্কর কবিই—মহাকবি।)

(ক্লাসিক-কাব্যের নিসর্গ-চিত্রগুলি অত্যন্ত মোটা তুলিকায় আঁকা ;) মোটা তুলিকা না বলিয়া 'ব্রাস' বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। সেই 'ব্রাসের' এক-একটি টানে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের ন্যায় এক-একটি বৃহৎ চিত্র আঁকা হয়। রোম্যান্টিক কবির তুলি সূক্ষ্ম। রোম্যান্টিক কবি প্রকৃতির সহিত সহধর্ম্মিতা

বোধ করেন, প্রকৃতির সহিত ভাবের আদান-প্রদান করেন, প্রকৃতির সূক্ষ্মলীলা-পর্য্যায় প্রত্যক্ষ করেন। ক্লাসিক-কাব্যে ফুল ফোটা, সন্ধ্যা-প্রভাত হওয়া, নদীর জলধারা ছোটা, ঝড়-তুফান ওঠা—এইরূপ বৃহৎ ও স্থূল দৃশ্যগুলি ছাড়া অন্য কোন সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবতারণা করিলে কাব্যের পটভূমিকার সহিত তাহা গভীরভাবে অন্বিত হইতে পারে না। ক্লাসিক-কাব্যের বীর-ভাবের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হয়। মেঘনাদ-বধের কবিও সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটনের কোন চেষ্টা করেন নাই। নিসর্গের সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মতা পরিহার করিয়া কবি অত্যন্ত মোটা ও স্বল্প রেখায় প্রকৃতির অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে—

"অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী ,
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী , কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে ;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভীবৃন্দ ধায় হাম্বা রবে ;
আইলা সুচারু-তারা-শশীসহ হাসি,
শর্ব্বরী , সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুমি কি ধন পাইলা ;"

এই নিসর্গ-চরিত্রের সহিত একই কারণে রাবণের রাজসভা বা অন্যান্য বস্তু-চিত্রগুলিও স্মরণীয়। সূচনায় কবি রাবণের রাজসভার যে চিত্র আঁকিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন—সে চিত্রের তুলির টানগুলি শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত বর্ণের সুউচ্চ-উন্নত সারি সারি স্তম্ভের ন্যায়। প্রথমেই রাজসভার মধ্যস্থলে কনকাসনে উপবিষ্ট দশাননবলীর রূপ-ঐশ্বর্য্য-তেজ একটি উপমা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে—'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ'। দশাননের পর 'শত শত পাত্রমিত্র আদি সভাসদ'। সভাসদেরা সকলে মিলিয়া যেন একখানি বহুমূল্য মণিমাল্য। সেই মণিমালার মধ্যমণি রাবণের রূপৈশ্বর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে, তাই স্বতন্ত্রভাবে কোন সভাসদের রূপ ও বেশের বর্ণনা নাই। রাজা ও সভাসদের পর সভাতলের বর্ণনা। সভাগৃহের ভূতল স্ফটিকে গঠিত 'তাহে শোভে রত্নরাজি' এই স্ফটিক-নির্ম্মিত ও রত্নখচিত সভাতলের বৈভব ও দ্যুতি ব্যঞ্জনের জন্য আর একটি উপমার প্রয়োজন হইয়াছে—'মানস-সরসে সরস

'কমলকুল বিকশিত, যথা'। সভা-তলের বর্ণনা সমাপ্ত হইল। ইহার পর স্তম্ভ সারি সারি, তাহাদের উন্নতশীর্ষে অবলম্বিত স্বর্ণছাদ। এখানে আর একটি উপমা—'ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে ধরারে'। সভাগৃহের মূল গঠন-চিত্র (structure) এইভাবে কয়েকটি মোটা রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। এই মূল গঠন-চিত্র বর্ণনার পর সভাগৃহের কারু-চিত্র (decoration)-এর বর্ণনা, সে বর্ণনাও সূক্ষ্ম নয়। ঝালর ঝুলিতেছে, কিঙ্করী চামর ঢুলাইতেছে, ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মতা পরিহার করিয়া রাজসভার নাম করিতেই পাঠকের মানসপটে যে অপরিচিত ও সাধারণ একখানি চিত্র ভাসিয়া উঠে, কবি সেইরূপ একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তবে এই সাধারণ চিত্রের মধ্যে অসাধারণ ঐশ্বর্য্য-বৈভবের কিরণ-ছটা ও গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তোলা এবং দ্যুতি ও দীপ্তি সঞ্চার করা অসাধারণ শিল্পীর দ্বারা ভিন্ন সম্ভব হয় না। মধুসূদন তাহা করিয়াছেন সুনির্ব্বাচিত শব্দ ও ভাবগম্ভীর উপমা প্রয়োগে।

(ক্লাসিক-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতা। তাই ক্লাসিক-কাব্যের উপমা-চিত্রগুলি একটা অনির্দ্দেশ্য রহস্যের ব্যঞ্জনা দেয় না; একটা পরিচিত (concrete) বস্তু ও বিষয়ের মূর্ত্তিকে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।) সব ক্ষেত্রে হয়ত সেগুলি মূর্ত্তির রূপ পায় না, তবে concrete হয় এবং এমন অনুভূতি জাগায় যাহা সাধারণ পাঠকের বোধ-সীমার মধ্যে। (মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রত্যেকটি উপমা-চিত্র এইভাবে ভাবকে পাঠকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও অনুভূতির সীমার মধ্যে আনিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ছাড়া এই কাব্যের উপমার আর একটা বৈশিষ্ট্য ইহার ভাব-গভীরতা ও গাম্ভীর্য্য। ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টিতেই ক্লাসিক-কাব্যের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়, সুতরাং এই শ্রেণীর কাব্যের উপমাগুলিও যে পরিবেশ-পটভূমির সহিত একই সুরে, একই ছন্দে অন্বিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এক কথায় বলা যাইতে পারে ক্লাসিক কবি যে যে উপকরণে কাব্যে ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেন—উপমা-চিত্র তাহার মধ্যে একটা প্রধান উপকরণ। মেঘনাদ-বধ কাব্যের ইতস্ততঃ কয়েকটি উপমা-চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।)

মেঘনাদ-বধ কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এই সুরম্য কাব্যহর্ম্মোর বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত কক্ষে কক্ষে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্যদীপ্তি, যে হীরা-মুক্তামাণিক্যের ইন্দ্রধনুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র চাই। এই সংকীর্ণ আলোচনায় তাহা সম্ভব হইবে না, তাই আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আলোচনা সমাপ্ত করিব।

মেঘনাদ-বধ কাব্যে মধুসূদনের কবি-কমণ্ডলুর সমস্তটুকু করুণা-বারি রাবণ-মেঘনাদের উদ্দেশে নিঃশেষিত হইয়াছে, এমন একটা ধারণা প্রত্যেকেরই আছে। কবি চিঠিতেও স্বীকার করিযাছেন রাবণ-মেঘনাদ তাঁহার কবিচিত্তকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যেও কবির এই স্বীকারোক্তি সমর্থিত হইয়াছে। রাবণ-মেঘনাদের চিত্রকে কবি এমন উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন যে সে-চিত্রের পাশে রাম-লক্ষ্মণের চিত্র ম্লান ও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। রাম-লক্ষ্মণকে কবি হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিনা, তাঁহাদের আদর্শ-মহত্ত্বের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়াছেন কিনা, সে বিচার যথাসময়ে করা যাইবে। এখানে কবির এই স্নেহ-পক্ষপাতের কারণটি বুঝিয়া লইতে হইবে। যে রাম-লক্ষ্মণের আদর্শ সত্যনিষ্ঠা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি নর-নারীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, সেই রাম-লক্ষ্মণের গুরুত্ব খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে কাব্য-রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে না আনিয়া কবি নেপথ্যে কেন রাখিয়া দিলেন সে কারণটি অনুসন্ধান করা দরকার।

কাব্যখানি মনোযোগের সহিত পড়িয়া একটা কথা মনে হইয়াছে যে রাবণের শক্তি কবি-মনকে প্রলুব্ধ করিলেও, রাবণের শক্তির অপমান কবিকে ক্ষুব্ধ-বিচলিত করিলেও রাবণ-চরিত্রের আদর্শে কবির বোধ হয পূর্ণ সমর্থন ছিল না। রাবণের শক্তির লীলা, তাহার প্রচণ্ড তেজ-দীপ্তি কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই শক্তি-ই যে জগতের কল্যাণের, মঙ্গলের ও শান্তির —কাব্যের কোথাও কবির এ সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয় না। কবির চিত্ত-ফুল-বনের প্রস্ফুটিত কুসুম মেঘনাদ, তাহার শক্তি পুষ্পের সৌরভের ন্যায়; তাই কবি তাঁহার হৃদয়-পদ্ম মেঘনাদকে বধ করিতে অনেক চোখের জল ফেলিয়াছেন, কাব্যে ও চিঠিতেও। রাবণ সম্পর্কে কবির মনোভাব চিঠিতে মাত্র একটি জায়গায় ব্যক্ত হইয়াছে—"the idea of Ravan elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow." মেঘনাদের

জন্য কবির অশ্রু উদ্বেলিত হইয়াছে, কিন্তু কবি রাবণের তেজোদ্দীপ্ত শক্তির দহন-জ্বালাটুকুই দেখাইলেন—কাব্য যখন শেষ হইল তখনও সে জ্বালা নির্ব্বাপিত হয় নাই, তখন সে অগ্নিকুণ্ডে পূর্ণাহুতি পড়িয়াছে মাত্র।[১] যে-শক্তি মঙ্গল ও কল্যাণ-বোধের দ্বারা শুদ্ধ নয়, তীব্র অন্তর্জ্বালাই তাহার পরিণতি। কাব্যের ঘটনা-বিন্যাসে এই সত্যই কি ব্যঞ্জিত হইয়াছে ?

রাবণ-চরিত্রের এই শক্তি, এই তেজ, এই সূর্য্যদীপ্তিই heroic poetry-র নায়কের উপযোগী। রামের চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া উচ্চ নৈতিক আদর্শ-জ্ঞাপক নীতিকাব্য রচনা করা যায়, সীতা-বিসর্জ্জনের কাহিনী লইয়া করুণ-রসাত্মক কাব্য রচনা করা যায়, কিন্তু heroic style-এর কাব্য রচনা করা যায় না। তবে কি রাম বীর নন্? রাম অসাধারণ বীর, তাঁহার বাহুবল রাবণেরই মত। কিন্তু সে-শক্তি passive, সে-শক্তি আত্মসংহৃত, সে শক্তিতে নক্ষত্র-দীপ্তি আছে, সূর্য্যের তেজ নাই। সে-চরিত্র ত্যাগে-বীর্য্যে, করুণায়-দৃঢ়তায়, বৈরাগ্য-সংযমে মহিমময়; সে-শক্তি নিসর্গ-শক্তির ন্যায় দুর্ব্বার-দুস্তর-দুঃসহ নয়। সে-শক্তি সমস্ত কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া, সমস্ত কিছুর সম্ভ্রম বাঁচাইয়া, শুধু ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য প্রকাশিত হয়। তাহার প্রকাশ ভূমিকম্পের মত নয়, প্রলয়-ঝঞ্ঝার মত নয়। রাম নর-চন্দ্রমা; তাঁহার শক্তি আছে, এবং শক্তির অতীত আরও কিছু আছে। রামের শক্তি ধীর-অচঞ্চল-নম্র; রাবণের উগ্র-চঞ্চল-উদ্ধত। রাবণের শক্তি ঐশ্বর্য্যের, রামের শক্তি বৈরাগ্যের; রাবণের শক্তি-ই heroic poetry-র উপযোগী এবং সেই কারণে রাবণ-চরিত্রই মেঘনাদ-বধ কাব্যে প্রধান। এবং রাবণের শক্তির ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য রক্ষ-পুরী ও রক্ষ-সেনার ঐশ্বর্য্যও কবি উজ্জ্বল রেখায় আঁকিয়াছেন।

রাবণ-চরিত্র প্রধান বলিয়া এই চরিত্রের ধর্ম্মই যে কাব্যের মূল ধর্ম্ম—সে

---

১ ॥ (ক) "I am going to celebrate the death of my favourite Indrojit." (রাজনারায়ণ বসু-কে)

(খ) "…Let me hear what favour the glorious son of Ravan finds in your eyes. He was a noble fellow."

(রাজনারায়ণ বসু-কে)

(গ) "It was a struggle whether Meghnad will finish me or I finish him. Thank heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say…It cost me many a tear to kill him."

(রাজনারায়ণ বসু-কে)

সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া শক্ত। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন নাটকখানি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য ও বিসর্জ্জন নাটক উভয়ই objective কবি-কল্পনার সৃষ্টি, সুতরাং ইহাদের সাদৃশ্য-কল্পনা অসঙ্গত হইবে না। বিসর্জ্জন নাটকের গোবিন্দমাণিক্য মেঘনাদ-বধ কাব্যের রামের মত আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ। সে চরিত্রের বিকাশ-বিবর্ত্তন নাই (Ideal-রূপ তত্ত্বের বিকাশ-বিবর্ত্তন আশা করা যায় না)। ইহার তুলনায় রঘুপতির চরিত্র হিংসা ও প্রথাবদ্ধ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মত্ত হস্তীর ন্যায় অস্থির চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। রঘুপতির শক্তিও প্রচণ্ড, কিন্তু সে শক্তি নীচতা-আশ্রিত, সে শক্তি চঞ্চল দীপের ন্যায় অকম্পিত অচঞ্চল নয়; তাই শেষ পর্য্যন্ত গোবিন্দমাণিক্যের কাছেই সে চঞ্চল শক্তি স্তব্ধ হইয়াছে। রাবণের অনেকখানি মিল যেন রঘুপতির সহিত। বিসর্জ্জনে রঘুপতি-চরিত্রই প্রধান, তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে রঘুপতির আদর্শে ও ধর্ম্মেই কবির সমর্থন? অনুরূপ প্রশ্ন মেঘনাদ-বধ কাব্যের রাবণ-চরিত্র সম্পর্কেও করা যায়।

রাবণের শক্তি যে প্রলয়ঙ্কর, সে শক্তির পীড়নে যে বসুন্ধরা কম্পিত, সে শক্তি যে দুঃশাসনের কলুষ-হস্তে জগতের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণ করিতেছে, কল্যাণী-শক্তির বুকে পাষাণ চাপা দিতেছে, এ-কথা বহু জায়গায় বহু চরিত্রের ভাষণে প্রকাশিত হইয়াছে—

> "কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
> "পরম অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
> দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনী,
> দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
> হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
> কভু কি উচিত, মাতঃ।...
> পরধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
> পামর।"

রাবণের ইষ্টদেবতা মহাদেবও বলিয়াছেন,—

> "পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন
> কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।"

দেবতাদের ষড়যন্ত্র রাবণের বিরুদ্ধে। রাবণের পুত্র মেঘনাদও ইন্দ্র-বিজয়ী, তথাপি মেঘনাদের প্রতি বা রক্ষঃ-কুলের অপর কাহারও প্রতি দেবতাদিগের রুষ্ট

মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। রাবণকে বধ করিবার জন্যই মেঘনাদকে বধ করিতে হইয়াছে—'মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে রাবণ'। দানব-শক্তি দমনের জন্য ধরিত্রীর বক্ষের একটি কোরক অকালে বৃন্তচ্যুত হইল।

সীতা হরণকালে পরম ধর্ম্মচারী জটায়ুর উক্তিটিও স্মরণীয়—

"'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে—
বীর-বর,—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ,
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি দুর্ম্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম দীপ' ?"

জটায়ু যেন শূন্য হইতে পুণ্য দৈববাণীর ন্যায় রাবণের দুর্বৃত্ত-কীর্ত্তির উপর রোষ-হুঙ্কার জানাইয়াছে, তাহার দানব-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে।

অনেকের ধারণা মধুসূদন গ্রীক-সাহিত্যের আদর্শে এ কাব্যে দেব-দেবীর চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাই কাব্যের দেব-দেবীরা যুদ্ধ-বিবাদে এক পক্ষের অংশ গ্রহণ করিয়া সেই পক্ষের জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই কাব্যে দেব-কুল রামের পক্ষাবলম্বী, সুতরাং তাঁহাদের উক্তিতে রাবণের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা মনে করা ভুল হইবে। তবে এ কাব্যে মধুসূদন দেব-দেবীকে যে খুবই কর্ম্ম-তৎপর করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা যে গ্রীক-সাহিত্যের দেব-দেবীর প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে, এমন কথা কেমন করিয়া মানিয়া লইব ? আমাদের প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যগুলিতেও দেব-দেবীর তৎপরতা কি ইহা অপেক্ষা বেশী নয় ? সে কথাও যাক্, ধরিয়া লওয়া গেল দেবতাদিগের এই কর্ম্ম-তৎপরতার পিছনে গ্রীক-সাহিত্যের প্রভাব-ই ক্রিয়াশীল। সে-কথা যদিও মানিয়া লওয়া যায় তবু ইহা স্বীকার করা যায় না যে গ্রীক দেবকুলের নীচ প্রবৃত্তিগুলিও অক্ষম অনুকারকের ন্যায় কবি মধুসূদন ভারতীয় দেব-দেবীর মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের কোথায়ও ভারতীয় দেব-মাহাত্ম্য খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।[১] ভারতবর্ষের দেবকুল ধর্ম্ম ও সত্যের সহিত অভিন্ন। যখন সেই ধর্ম্ম ও সত্যের বিলোপ সম্ভাবনা দেখা দেয়,

১॥ দ্বিতীয় সর্গের জন্য মধুসূদন ইলিয়াডের কাছে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন —"I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida." মধুসূদনের

তখন তাঁহাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়; তাই এই কাব্যের দেব-দেবীর যে কর্ম্ম-তৎপরতা তাহা অধর্ম্ম ও অসত্যকে বিলুপ্ত করিবার জন্য। রাম সত্যাবলম্বী, তাই স্বভাবতই দেব-অনুরক্ত ও দেব-সমর্থিত। এ কাব্যের দেবতারা গ্রীক-দেবতাদের ন্যায় হীন নন্, অন্যায়ভাবে তাঁহারা কাহাকেও দমন করিতে চান না। তাই রাবণের বিপক্ষে তাঁহাদের উক্তিগুলিকে একান্তভাবেই স্বার্থ-প্রণোদিত বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।

দেবতাদিগের কথা যদি ছাড়িয়াও দিই, তাহা হইলে নভঃ-চারী জটায়ু পক্ষীর তিরস্কারকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না কেন? স্বার্থ-বিদ্বেষ-সঙ্কুল জগতের ঊর্দ্ধে উচ্চ পর্ব্বত-চূড়ায় তাঁহার বাস; এবং রাবণ যে সীতাকে হরণ করিয়া লইতেছে সে খবরও তিনি জানেন না, 'কোন্ কুলবধূ আজ হরিলি দুর্ম্মতি?' সুতরাং জটায়ুর সাক্ষ্যকে মিথ্যা ও স্বার্থ-প্রণোদিত মনে করিবার কোন হেতু নাই। গ্রীক-আদর্শে ভারতীয় দেবচরিত্রের উপর অসতর্কভাবে দুই-একটি কালো তুলির দাগ টানিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও জটায়ু পক্ষীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া মধুসূদনের কোন গোপন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় নাই।

এই সমস্ত কিছুই যদি ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলেও মেঘনাদ-বধ কাব্যের চতুর্থ সর্গটির সার্থকতা কি—এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে। বস্তু-প্রধান মহাকাব্যে এতবড় একটি স্বর্গের অবতারণা কি কেবলমাত্র lyric relief দিবার জন্য? যে কাব্যে একটি অবান্তর শব্দ-চিত্র-উপমা সন্নিবেশ করিবার স্থান নাই—সূচ্যগ্র-ভাগে সরিষা ধারণের স্থান হইতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যে একটি অবান্তর শব্দের স্থান হইতে পারে না (কবি রাজনারায়ণ বসুকেও লিখিয়াছিলেন, "You must weigh every thought, every image, every expression. every line")—সেই কাব্যে মূল ভাব-সূত্রের সহিত অসংলগ্ন একটি বৃহৎ সর্গ কেবল লিরিক-সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য স্থান পাইয়াছে, ইহা কোন ফরাসী-

এই স্বীকৃতির সঙ্গে আর একটি বিষয়ের স্বীকৃতিও আছে, সেইটিই এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—"I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible." (রাজনারায়ণ বসু-কে)। এই প্রসঙ্গে আর একখানি চিঠিও উল্লেখযোগ্য—"You shan't have to complain against the un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather than try to write, as Greek would have done." (রাজনারায়ণ বসু-কে)।

সমালোচক তো দূরের কথা কোন সাধারণ সমালোচকেও মানিয়া লইবে না ("I think I have constructed the poem on the most rigid principles and even a French Critic would not find a fault with me,")। কবি যে দাবী করিয়াছেন এই কাব্যের গঠন প্রমাদশূন্য—সে দাবী অসঙ্গত নয়। এই কারণে চতুর্থ সর্গটির কেবলমাত্র কাব্য-সৌন্দর্যটুকু দেখিলে চলিবে না, উহা যেমন কাহিনীর অখণ্ডত্ব (entirety) বজায় রাখিয়াছে তেমনি আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করিযাছে।

রাম-সীতার শান্তরসাস্পদ আরণ্য-দাম্পত্য-জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায় পাঠকের মন এমন একটা অনির্ব্বচনীয় আবেশে অভিভূত হয় যে তখন সেই সেই শান্ত-পরিবেশের মধ্যে, সেই পবিত্র বনস্থলীতে যোগী-বেশী রাবণের আবির্ভাব কি কৃতান্তরূপী ব্যাধের আগমন বলিয়া মনে হয় না ?

"ছিনু মোরা, সুলোচনা, গোদাবরী তীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে।"

সেই সুখের নীড ভাঙ্গিয়া অমঙ্গলরূপী রাবণ কি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পবিত্রতা নষ্ট করে নাই ? ভারতের নারীর শুদ্ধ মঙ্গলঘট পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে নাই ? রাবণের এই ক্রূর-কর্ম্মে 'বনদেবী বুঝি দাসীর দশায় মাতা কাতরা কাঁদিলা। কিন্তু বৃথা এ ক্রন্দন।' ইহাতেই কি অনুমান হয না যে, যাহা শুদ্ধ-পবিত্র অথচ দুর্ব্বল, রাবণের দানবীয় শক্তির রথ তাহার বুকের উপর দিয়া শক্তির ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে ? আমার তো মনে হয়, চতুর্থ সর্গে রাম-সীতার পবিত্র দাম্পত্য-চিত্রের পাশে সেই অপবিত্র অগ্নিশিখাকে স্থাপিত করিয়া কবি উভয়ের পার্থক্যটি স্পষ্ট করিয়াছেন।

এই সর্গের সীতার দুঃখ-দগ্ধ চিত্রখানি কবি এমন পবিত্রভাবে, এমন সংযম ও শুচিতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন যে মনে হয় ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্ম-বাণীটি কবি সীতা-চরিত্রের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। ঐশ্বর্য-মদ-মত্ত স্বর্ণলঙ্কার একান্তে অশোক-কাননে কবি যখন প্রবেশ করিয়াছেন তখন স্পষ্ট অনুমান করিতে পারি, কবির পরিধানে কৌষিক-বস্ত্র, স্কন্ধে উত্তরীয়-যজ্ঞোপবীত, অন্তর শান্ত শুদ্ধ-পবিত্র, মুখমণ্ডল পুণ্য তপঃপ্রভায় দীপ্ত। যে-কবি রাবণকে অঙ্কিত করিয়াছেন এ যেন সে কবি নন। স্বর্ণলঙ্কা হইতে বাহির হইয়া, সমুদ্র-স্নানে শুচি হইয়া, বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া কবি নিভৃতে রাজপুরীর

কোলাহল হইতে দূরে অশোক-কাননে গোপনে একান্ত আবেগভরে সীতাদেবীর চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন। কবির অব্যক্ত অন্তর-ভাব যেন এই সীতা-চরিত্রের মধ্যেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে, কবির নিভৃত গোপন অন্তর্লোক যেন এই অশোক-কাননেই উন্মোচিত হইয়াছে। রাবণের রাজসভায় কবির বাহ্যরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে, অশোক-কাননেই কবির অন্তর-রূপ প্রকাশিত। সীতা চিত্রের পার্শ্বে কবি আর একটিমাত্র নারীকে স্থান দিয়াছেন। তিনি রক্ষঃবধূ, কিন্তু ভারতীয় আদর্শের ত্যাগ-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। সীতার পদতলে সরমা—

"আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ।"

সুবর্ণ দেউটি—সরমা ; তুলসীর মূল—সীতা। সরমা—সীতার দুঃখে দুঃখী, রামের সত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত। কিন্তু তিনি রক্ষঃকুলেরই তো বধূ, স্বর্ণ-লঙ্কার পুরনারী, তাই তিনি সুবর্ণ-দেউটির ন্যায় স্বর্ণোজ্জ্বলে ভাস্বর। কিন্তু সীতার ঐশ্বর্য্য-সমারোহ নাই, তিনি তুলসীর মূলের ন্যায় পবিত্র, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক—যে-সংস্কৃতির মূল কথা ঐশ্বর্য্যে নয় বৈরাগ্যে, ভোগে নয় ত্যাগে, বাহু-শক্তিতে নয়, আত্মশক্তিতেই কল্যাণ। সেই সংস্কৃতির প্রতীক সীতা, তাই তিনি তুলসীর মূল। এই ভারত-নারী, ভারতের সম্ভ্রম-মর্য্যাদা-পবিত্রতা হরণ করিয়াছে রাবণ। জগৎ এই পাপ, এই অন্যায় করুণার চোখে দেখিতে পারে না, তাই নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যেও রাবণের এই অনাচারের প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে—

"স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিবাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসেছে অরবে
শাখে পাখী। রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে।
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী॥"

—ইহাই চতুর্থ সর্গের মর্ম্মকথা।

রাবণ তাহার নিজের পতনের জন্য পুনঃ পুনঃ বিধিকে দোষারোপ

করিয়াছে। অধিকাংশ সমালোচকই এই বিধিকে গ্রীক কাব্যের Fate-এর সহিত তুলনা করিয়া রাবণকে বিধি-বিড়ম্বিত শক্তিধর পুরুষের মর্য্যাদা দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক সাহিত্যের অদৃষ্টবাদ-ই হউক, বা দেব-যন্ত্রবাদ-ই হউক, কোনটিকেই মধুসূদন অক্ষম-অনুকারকের ন্যায় অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কাব্যে অদৃষ্টবাদ ও দেব-যন্ত্রবাদের প্রভাব থাকিলেও উহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু আছে।

রাবণের পতনের জন্য বিধিকে দোষী করিলে চলিবে না—রাবণের পতনের কারণ সে নিজে। নারীহরণ, সতীত্বনাশ, অক্ষম-অসহায়ের উপর অত্যাচার তাহার নিত্য অভ্যাস। সীতাহরণ সেই বহু অপকর্ম্মের একটি। সীতাহরণের অন্য কোন কারণ কেহ কল্পনা করিয়াছেন—সূর্পনখার অপমানে নিতান্ত রাজনৈতিক কারণেই রাবণ সীতাহরণ করিয়াছে; কিন্তু সে ব্যাখ্যা কাব্যের কোথাও নাই। সুতরাং কাব্যে রাবণের পতনের জন্য যে প্রত্যক্ষ ও নির্দ্দিষ্ট কারণ রহিয়াছে, হাতের কাছের সেই কারণটিকে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে মেঘনাদ-বধ কাব্যকে গ্রীক-সাহিত্যের স্তন্যরসপুষ্ট করিয়া তোলা হইবে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে রাবণের পতনের কারণ তাহার দানবীয় শক্তি। ইহাকে যদি বিধি বলা হয় তাহা হইলে বলিব, সেই বিধি আর কেহই নয়—তাহা সনাতন ভারতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল-বুদ্ধি। এই তত্ত্বরূপী বিধির বাস্তবরূপ—রাম।

আরও একটি কথা আছে। Dryden heroic poem-এর সংজ্ঞা দিয়াছেন, "The design of it is to form the mind to heroic virtue by example, 'tis conveyed in verse that it may delight, while it instructs." রাবণ-চরিত্রে delight আছে কিন্তু instruction নাই। রাবণ-চরিত্রের আদর্শে কোন মহাকবি পাঠক-সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া তুলিতে পারেন না; instruction আছে রাম-চরিত্রে।

"হাসিয়া কহিলা দূত 'শুন রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,
ইন্দ্রিয় দমন, ধর্ম্ম পথে সদা গতি,
নিত্য সত্য দেবী-সেবা; চন্দন কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত

অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসত্য !"

এই চিরন্তন সত্য রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রেই বাণীরূপ পাইয়াছে। রাবণের অপরিমেয় শক্তি আছে, কিন্তু তাহাতে পুণ্যকিরণসম্পাত নাই, তাহা আছে রাম-লক্ষ্মণ চরিত্রে ॥

॥ ৬ ॥

কিন্তু এ ব্যাখ্যাকে মেঘনাদ-বধ কাব্যের মর্ম্মব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। রাবণকে পাপ-অধর্ম্মের symbol এবং রামকে ধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠার symbol মনে করিলে কবির উপর, কবির যুগের উপর অবিচার করা হইবে। মেঘনাদ-বধ বৃত্র-সংহার নয়। রাবণ-চরিত্রে যদি কবি পাপের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা-ই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাব্যখানির পরিণতি কি দাঁড়াইবে—ট্র্যাজেডী বা কমেডী ? এবং রামের আদর্শেই যদি কবির সমর্থন থাকে, তাহা হইলে যুগের সহিত কবির সম্পর্ক কোথায় ? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মেঘনাদ-বধ কাব্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেটি স্মরণ করিতে পারি—"মেঘনাদ-বধ কাব্যের কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা-প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব-পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্ত্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা যে বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহার শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্ম্মভীরুতা সর্ব্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে বোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য, ইহার হর্ম্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্দ্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা

চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী-ঐশ্বর্য্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্ব্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতেছে না, কবি সেই ধর্ম্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উৎসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি অতি সাবধানে স্পর্দ্ধাভরে কিছু মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল॥"

ইহাই মেঘনাদ-বধের মর্ম্মকথা। মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দে ও ভাবে এই বিদ্রোহের সুরই ফুটিয়াছে; সে বিদ্রোহ প্রাচীন জড়-অভ্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ইহা সেই যুগেরও বিদ্রোহ। কবির নিজের ব্যক্তি-জীবনেও এই বিদ্রোহের আভাস আছে। রাবণ-চরিত্র কবি-মানসের এবং যুগ-মানসের সেই বিদ্রোহের প্রতীক। রাবণ ধর্ম্মের রথচক্রে দলিত হইয়া ধর্ম্মের এবং সত্যের জয়স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। রাবণ অভ্যস্ত রীতি-সংস্কারের লৌহপিঞ্জরে মাথা ঠুকিয়া রক্তাক্ত-দেহ হইয়াছে। কবির জীবন ও কবির সমসাময়িক জগৎকে মিলাইয়া লইলে মেঘনাদ-বধের এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু মধুসূদন খুব দৃঢ়তার সহিত এই ভাব-সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বাস্তব জীবনে তিনি সনাতন আদর্শ, প্রচলিত সংস্কারকে যেরূপ দৃঢ়তার সহিত উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কবি-জীবনে মধুসূদনের সে দৃঢ়তা ও প্রচণ্ডতার যেন কিছু অভাব দেখা দিয়াছে। তাই রাবণকে কবি নিজে যে ভাবে বুঝিয়াছেন ঠিক সে ভাবে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে যেন মজ্জাগত হিন্দুসংস্কার এবং বাল্মীকির প্রভাব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাই একদিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনা এবং আর একদিকে প্রাচীন ভারতীয়-ঐতিহ্যবোধ এই দুইটি ধারা মিশ্রিত হইয়া কাব্যখানিতে একটি অখণ্ড অনুভূতিকে স্থায়ী হইতে দেয় নাই। রাবণকে অধর্ম্মাচারী দানবশক্তি মনে হইয়াছে, আবার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিধর বীরপুরুষ—নবীনযুগের আদর্শ বলিয়াও মনে হইয়াছে। (কবি বন্দিনী সীতার চিত্র আঁকিতে গিয়াও অশ্রু গোপন রাখিতে পারেন নাই, আবার 'বিশদ বস্ত্র,

বিশদ-উত্তরী, ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটীর গলে' পুত্রশোকাতুর রাবণের এই চিত্র আঁকিতে গিয়াও চোখের জল ফেলিয়াছেন। ক্লাসিক কবির পক্ষে ইহা একটা ত্রুটি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। ক্লাসিক কাব্যের পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্ট, সূচ্যগ্রভাগের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট; মেঘনাদ-বধ কাব্যের পরিণতি সেরূপ নয়। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই মনে হয় যে জাতীয় জীবনের যে সংগঠন-পর্ব্বে মেঘনাদ-বধ কাব্যের সৃষ্টি, সে-যুগে জাতীয় আদর্শ কোন স্থির লক্ষ্যাভিমুখী হয় নাই; সে-যুগের কাব্যে অনুরূপ দ্বিধা-সংশয় অনিবার্য্য কারণবশতই প্রকাশ পাইবে। মধুসূদন ক্লাসিক কবি-মন লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও ঐ যুগটি সাহিত্যিক মহাকাব্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। সে-যুগটি মহাকাব্য রচনার সম্পূর্ণ বিরোধী। সাহিত্যিক মহাকাব্য জাতির সংগঠন যুগে বা গৌরব যুগে সৃষ্টি হইতে পারে না (এ সম্পর্কে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে)। তাই নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই এই ত্রুটি দুর্ব্বলতা কাব্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

॥ ১ ॥

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল সার্থক কবি-খ্যাতিতে স্মরণীয় নন্; নূতন-সুরের প্রবর্ত্তক হিসাবেই তাঁহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বিহারীলালের কবিতার সুরে ঐ সময় বাংলা কাব্য একটা নূতন লক্ষ্যে—বাহ্যিকতা হইতে আন্তরিকতায়, বস্তু-তন্ময়তা হইতে আত্ম-তন্ময়তায়, আখ্যায়িকা-কাব্য হইতে গীতি-কবিতায় গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। বিহারীলালের কবিতার শোধনমন্ত্রে বাংলা কাব্যের এই ধর্ম্মান্তর হয় বলিয়া বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার একটা স্থায়ী সম্মানিত আসন নির্দ্দিষ্ট আছে।

কবির প্রাপ্য সম্মান তাঁহাকে অবশ্যই দিতে হইবে, তথাপি যেন মনে হয় বিহারীলালের কবিতার গুরুত্বকে বহু সমালোচক একটু বাড়াইয়া দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের কবিতার উপর বিহারীলালের প্রভাবকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করায় ও নিজেকে তাঁহার শিষ্যরূপে প্রতিপন্ন

করায় বিহারীলালের গুরুত্ব যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ নন্, ঠাকুর-পরিবারের একাধিক ব্যক্তি বিহারীলালের উদ্দেশ্যে যে ভক্তিপ্লুত অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন, সেই যুগের এবং পরবর্ত্তী যুগের সমালোচকদের নিকট বিহারীলালকে আধুনিক কাব্য-ধারার গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট। বাংলা কাব্যে মধুসূদনের আবির্ভাবের জন্য যদি কোন পূর্ব্ব-ভূমিকার প্রয়োজন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে মধুসূদন অপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিজের শক্তিতে পথ প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হইত না, ইহা বিশ্বাস হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব কতটুকুই বা! যে-কাব্যগুলির উপর তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছে, সে কাব্যগুলি রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়-জ্ঞাপক নয়। যে-পর্ব্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভূসংস্থানে 'ডাঙ্গা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে', সে কাব্যপর্ব্বকে বিহারীলালের কাব্য স্পর্শ করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব তাই সাধারণের চোখে ধরা পড়িবার কথা নয়, ইহা গবেষণার বিষয়। যে কারণেই হউক, এই প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ করিয়া দেখিয়াছেন এবং ততোধিক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

এই কারণেই এক শ্রেণীর সমালোচকদের ধারণা, Wordsworth-এর Lyrical Ballads যেমন ইংরাজী সাহিত্যে একটা নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে, বিহারীলালের কবিতা-ও তেমনি বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের অবসান ঘটাইয়া রোম্যান্টিক যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ক্লাসিক যুগের অবসান ও রোম্যান্টিক যুগের প্রবর্ত্তন-ইতিহাসের সহিত বাংলা সাহিত্যের রোম্যান্টিক যুগের সূত্রপাতে কিছু বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও একটা মৌলিক পার্থক্য আছে।

বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক যুগ পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই যেন রোম্যান্টিক যুগের হাওয়া প্রবেশ করিয়া ইহার ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক হইতে রোম্যান্টিক যুগের পরিবর্ত্তনের মধ্যে একটা অতৃপ্তিকর আকস্মিকতার স্পর্শ আছে। একটি দৃশ্যের রূপ-সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই যেন পট পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন রুচির ও ভিন্ন স্বাদের দৃশ্য উপস্থাপিত হইয়াছে। ক্লাসিক বা রোম্যান্টিক—কোন যুগই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। রুদ্ধকক্ষেও যেমন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, শূন্য বায়ু-মণ্ডলেও তেমনি শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। তাই ক্লাসিক যুগের পর রোমান্টিক যুগের আবির্ভাবের মধ্যে চক্রাবর্ত্তনের ন্যায় একটা ক্রম-

পর্য্যায় লক্ষ্য করা যায়; বাংলা সাহিত্যে এই চক্রাবর্ত্তন যেন অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া মনে হয়।

ক্লাসিক যুগ শক্তিসঞ্চয়ের যুগ; ইহা কাব্যের স্থিতিপর্ব্ব। রোম্যান্টিক যুগ শক্তিপ্রকাশের যুগ; ইহা কাব্যের গতিপর্ব্ব। ক্লাসিক যুগের গম্ভীরভাব-জ্ঞাপক অলঙ্কার-শৃঙ্খল রোম্যান্টিক যুগে লঘু পক্ষ বিস্তার করিয়া কাব্যকে শূন্যাভিমুখী করে। প্রত্যেক রোম্যান্টিক যুগের পূর্ব্বে তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ক্লাসিক যুগের উপক্রমণিকা থাকে। তখন দীর্ঘ অব্যবহারের মালিন্যে মরচে-ধরা দুরূহ শব্দ প্রয়োগে, বিদেশী ভাব স্বীকরণে, গম্ভীর প্রকাশ-রীতিতে ঘনপিনদ্ধ নাটকীয় কাহিনীতে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল—ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত পটভূমি বিস্তারে কাব্য-ধারার ভিত্তিভূমিকে গ্রাণাইট স্তরের ন্যায় দৃঢ় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। দুর্ব্বল ভাবালুতা, চটুল-লৌকিক ভাববিলাস, লঘু-তরল ঘটনা বিন্যাস, আবেগ-উচ্ছ্বসিত কাহিনী এইজন্য ক্লাসিক যুগের কাব্যমালায় স্থান পায় না। ক্লাসিক যুগের এই সংযম রোম্যান্টিক যুগের ভাবোচ্ছ্বাসকে গ্রহণ-শক্তি দান করে। নতুবা কাব্য যদি একটানা রোম্যান্টিক-প্রলাপ বকিতে থাকে, তাহা হইলে কাব্যের দীর্ঘজীবিতায় সংশয় প্রকাশ করা যায়। আবার হিমালয় শৃঙ্গে সংহত-তুষাররাজির ন্যায় ক্লাসিক যুগের সঞ্চিত ভাব-ভাণ্ডার রোম্যান্টিক কবি-কল্পনার উত্তাপে গলিয়া গীতিকবিতার অসংখ্য ঝরনা-ধারায় বহিয়া আসিয়া রোম্যান্টিক যুগকে সজীব ও রসসিক্ত করে। তাই ক্লাসিক যুগ রোম্যান্টিক যুগের ভাবেরও উৎসস্থল।

এইভাবে ক্লাসিক যুগের সংযম ও কেন্দ্রসংহতিতে কাব্যের ভাব ও ভাষা যখন সমৃদ্ধ হয়, অফুরন্ত প্রাণশক্তি যখন কাব্যের কোষে সঞ্চিত থাকে, তখন ক্লাসিক্যাল রীতির প্রথাবদ্ধতায় অচলায়তন ভাঙ্গিয়া রোম্যান্টিক যুগে গীতিকবিতার মুক্তধারা বহিয়া যায়।

ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসিক যুগ খুবই দীর্ঘ—১৭০২ হইতে ১৭৪০ পর্য্যন্ত। একটু ব্যাপকভাবে ধরিলে Wordsworth-এর Lyrical Ballads (১৭৯৮)-এর প্রকাশকাল পর্য্যন্ত ক্লাসিক যুগের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাই ইংরাজী সাহিত্যের রোম্যান্টিক যুগকে অকাল-বসন্তের পুষ্পসম্ভার বলিয়া মনে করা যায় না। এই যুগের আবির্ভাবের জন্য কাব্যভূমি ও পাঠকের চিত্তভূমিতে একটা প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষার ভাব জাগিয়াছিল। ক্লাসিক যুগের একটানা দীর্ঘ অনুবৃত্তিতে পাঠক-সমাজ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অলঙ্কার-বহুল ভাষাড়ম্বরে এবং মহাকাব্যোচিত বিশাল কাব্য-পটভূমিতে

পদচারণা করিতে করিতে, সূক্ষ্ম বায়বব্য দার্শনিক তত্ত্বের অনুসরণে পাঠকের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। তখন ক্ষুদ্র রোম্যাণ্টিক গীতিকবিতার একখণ্ড মুক্তাকাশে নিশ্বাস লইবার জন্য পাঠক-চিত্ত যেন ব্যাকুল হইয়া উঠে। এইভাবে কৃত্রিম আড়ম্বরবহুল কাব্য-ধারায় পীড়ন সহ্য করিবার পর গীতিকবিতার ক্ষুদ্র কমণ্ডলুতে সমুদ্রমন্থনের সুধা যেন পাঠকের তৃষাতপ্ত কণ্ঠকে অমৃত-সিক্ত করে। তাই যে যুগের পাঠক-সমাজ গীতিকবিতাকে শুষ্ককণ্ঠে পিপাসার্ত্তের ন্যায় তীব্র আবেগ-উৎকণ্ঠার সহিত গ্রহণ করিবে, সেই যুগটি-ই রোম্যাণ্টিক কাব্য-ধারা আবির্ভাবের পক্ষে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইংরাজী সাহিত্যের রোম্যাণ্টিক যুগ এইভাবে পাঠক-চিত্তে মুক্তির তৃপ্তি আনিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ কিন্তু রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের রুদ্ধকক্ষ হইতে মুক্তি পাইয়া বিহারীলালের কবিতায় একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির আমেজ, একটা বন্ধন-হীন মুক্তির উল্লাস বোধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্রের কাব্য এবং বিহারীলালের কাব্য প্রায় যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে ক্লাসিক্যাল রীতির বিরুদ্ধে একটা ধূমায়মান অসন্তোষের চিহ্ন বিহারীলালের কবিতায় দেখা যায়—

"এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্টহাসে ফেরে কার ছায়া ?
হা ধিক্! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস সব উল্কি-মুখী আয়া ?
নেকড়ার গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পরচুলে
চটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল!
পরস্পরে গলা ধরি
নাচিছেন যেন পরী
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল!
কেন এই অলীক ভুষা
সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে!

হেলিয়া নলিনী-রাণী
কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটি মালা দিব শ্রীচরণে ?
দু-মিনিটে ঝ'রে যাবে ম'রে যাবে ক্ষুদ্র প্রাণী,
দিও না মায়ের পায়ে প্রসাদী কুসুম আনি ॥"

তথাপি বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক যুগের কল্পনা-দৈন্য বাঙ্গালী পাঠকের শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে নাই। কারণ এই ক্লাসিক যুগটির মধ্যে বিশুদ্ধির অভাব আছে। এই যুগে যে কবি মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনিও রোম্যাণ্টিক কবি-কল্পনাকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা একাধারে ক্লাসিক-কাব্যাদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন আবার ক্ষুদ্র খণ্ড গীতিকবিতায় 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'র সৌন্দর্য্যকে সহজে ও অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই গীতিপ্রবণতা ইঁহাদের ক্লাসিক কাব্য-রচনার উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহার নীরন্ধ্রতার মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির মুক্ত বাতাসের প্রবেশ-পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফরাসী সাহিত্যের তুলনায় ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসিক যুগে বিশুদ্ধির অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন— "Classicism in England hardly ever shows itself in a state of absolute purity." এই ক্লাসিক যুগের মধ্যে রোম্যাণ্টিক-কল্পনা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "Sensibility, imagination, atlyricism which the respressive action of culture cannot always reduce tocorrect limits, show through in a word, an image, a movement, an accent, with all the writers of this age."

বাংলা সাহিত্যে ইহার বিপরীত চিত্রই পাওয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক যুগ আদৌ গড়িয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। কারণ এই যুগের কবিরা সজ্ঞানে সচেতনভাবে ক্লাসিক কাব্যের মধ্যে গীতকবিতার দখিন-হাওয়া আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র একাধারে ক্লাসিক ও রোম্যাণ্টিক কবি, ইঁহাদের অসংখ্য-গীতিকবিতার মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে—আখ্যায়িকা-কাব্যের কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া গেল। তাই বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক যুগ বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট যুগ-বিভাগ সম্ভব

নয়। যাঁহাদের আমরা ক্লাসিক-আদর্শের কবি বলিয়া স্বীকার করি, ক্লাসিক কাব্যাদর্শের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল না; তাঁহাদের ক্লাসিক-প্রেরণার মধ্যে দুর্ব্বলতা ছিল।

সুতরাং ইংরেজী সাহিত্যে Wordsworth-এর Lyrical Ballads যে ভাবে নূতন যুগের গোড়াপত্তন করিয়াছে, বিহারীলালের কবিতায় ঠিক তাহা নাই। বিহারীলাল বাংলা গীতিকাব্যের ধারাকে একটা নূতন গতিপথে চালনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় এই গীতিকবিতার উৎস কখনও শুকাইয়া যায় নাই; বরাবর প্রবহমান-ই ছিল।

॥ ২ ॥

কোন প্রাচীনপন্থী সমালোচক বলিয়াছেন, "বিহারীবাবু সর্ব্বদাই কবিত্বে মজগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে, কবিত্ব ঢালা থাকিত; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।" ইহা ঠিকই, এবং এই কারণেই সাহিত্য-সমালোচকের কাছে বিহারীলালের গুরুত্ব কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। ভাব-কে যিনি রূপ দিতে পারেন না, সে নীরব কবিকে সাহিত্য-সমালোচক খুব বড় আসন দিতে রাজী হইবেন না। কবির অনুভূতি যদি প্রবল হয়, তাঁহার প্রেরণায় যদি কোন দুর্ব্বলতা না থাকে, তাহা হইলে অনুভূতি সহজেই প্রকাশের পথ খুঁজিয়া লয়; কবিকে তাহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টিত হইতে হয় না। অক্ষর-জ্ঞানহীন পল্লীকবিদের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। কবির অনুভূতি আছে, কিন্তু অনুভূতিকে রূপ দিবার ভাষা নাই; সাহিত্য-তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার মধ্যে একটি বিরোধ আছে। বিহারীলাল তাঁহার অনুভূতিকে স্পষ্ট রূপ দিতে পারেন নাই—ইহাতে তাঁহার ভাব-প্রকাশের অক্ষমতা প্রমাণিত হয় না, অনুভূতির অস্পষ্টতা প্রমাণিত হয়। কবি বলিয়াছেন "কেবল হৃদয়ে দেখি দেখাইতে পারিনে"—কবির নিজ মুখের এই উক্তিকেও সাহিত্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ সমালোচক সহজে মানিয়া লইতে পারিবেন না এবং কবির হৃদয়ে দেখাও প্রকৃত দেখা কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলেন। সেদিক দিয়া বিহারীলাল স্বয়ং এবং তাঁহার কাব্য সাহিত্য-সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়

একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম বলিতে হইবে। তবে কবির সংজ্ঞা যদি এই হয়—"poetic genius is the power of seeing and communicating certain kinds of truth by embodying in concrete ideas," তাহা হইলে বিহারীলালকে খুব উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিয়া মানিয়া লওয়া শক্ত। পরে বিহারীলালের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

তবে প্রারম্ভেই বলিয়াছি বিহারীলালের গুরুত্ব কবি হিসাবে নয়; তাঁহার গুরুত্ব স্বতন্ত্র কারণে। সেই কারণটি আগে বুঝিয়া লইয়া পরে তাঁহার কাব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কবির কাব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

বিহারীলালের সহিত Wordsworth-এর একটি জায়গায় বেশ চমৎকার একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সে সাদৃশ্য এই নয় যে উভয়েই ক্লাসিক যুগের অবসান ঘটাইয়া রোম্যান্টিক যুগের সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের সাদৃশ্য হইল গীতিকবিতার স্বরূপ এবং গীতিকবিতার ভাষা সম্পর্কে একটা নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার। Wordsworth-এর আদর্শ Lyrical Ballad-গুলিতে কাব্যরূপে এবং তাঁহার Preface-এ মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; বিহারীলালের আদর্শের পরিচয় তাঁহার কবিতাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে Wordsworth-এর পূর্ব্বেও রোম্যান্টিক গীতিকবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাই Wordsworth, Coleridge, Shelley প্রমুখ কবিগোষ্ঠী দ্বারা যে রোম্যান্টিক যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাকে Romantic Revival বা রোম্যান্টিক ভাবধারার পুনঃপ্রবর্ত্তন বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্ব যুগের (এলিজাবেথীয় যুগে) রোম্যান্টিক আদর্শ ভিন্নতর ছিল।

বাংলা সাহিত্যও যে বিহারীলালের পূর্ব্বে রোম্যান্টিক গীতিকবিতায় সমৃদ্ধ ছিল—এ-কথা ঘোষণা করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কারণ বাংলা কাব্য-প্রবাহ প্রধানত গীতি-কবিতার খাতেই বহিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব কবিরা সঙ্গীতের রথে চড়াইয়াই প্রকৃত নর-নারীর প্রেম-কাহিনীকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ-লোকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার যে সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়, পরিচয়ের মালিন্যে যে-সৌন্দর্য্য ম্লান হয় না, মিলনের নৈকট্যে যে প্রেমের রহস্য স্পষ্ট হয় না—বৈষ্ণব কবিরা মুক্তাবিন্দুটির মত এক-একটি গানে সে প্রেমের রহস্য ও সৌন্দর্য্য (strangeness and beauty) প্রকাশ করিয়াছেন। এই সঙ্গীত-ধর্ম্ম ও রোম্যান্টিক বৈশিষ্ট্যই বাংলা কাব্যের মৌলিক

পরিচয়; এইখানেই বাঙ্গালী-কবির শক্তি। তাই চরম দুর্দ্দিনে এই মূল শক্তি-কেন্দ্রটির উপর নির্ভর করিয়াই বাংলা কাব্য বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সঙ্কট-কালে আত্মরক্ষার জন্য প্রধান অস্ত্রটির উপরই সর্ব্বাগ্রে হাত পড়ে—তাই আখ্যায়িকা কাব্য নয়, মঙ্গল-কাব্য নয়, কবিওয়ালাদের অবলম্বন ছিল বৈষ্ণব কবিদের রস-সমুদ্র, সঙ্গীতের আদি গঙ্গোত্রী।

কিন্তু বিহারীলালের কাব্যেই বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার মৌলিক সুর-টি প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—'it is not to be heard but overheard'। গায়ক আপন মনে গান করেন, শ্রোতারা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শোনেন। ইহাই সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যেই বাস্তব-প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণতা হইতে, শ্রোতা-রঞ্জনের লৌকিকতা হইতে সঙ্গীতের মুক্তি। বিহারীলালের কবিতা সংঙ্গীতের এই আদিম বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত, তাই কবির আত্মভাব প্রধান হইয়া তাঁহার কবিতাগুলি স্পষ্টতা হইতে অস্পষ্টতায়, রূপ হইতে রাগিণীতে সমাপ্ত হইয়াছে। বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্টভাবে আলোচনা করা দরকার।

আত্মভাবের উদ্বোধন (awakening of the self) বিহারীলালের কবিতার একটা সুস্পষ্ট-যুগ-নির্দ্দেশক বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণব কবিতাগুলিও সঙ্গীত-ধর্ম্মী। বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যের মোহাঞ্জন বৈষ্ণব-কবিদের চোখেও আঁকা ছিল, লাখ লাখ যুগ হিয়ায় হিয়া রাখিয়াও তাঁহাদের নায়িকার দাবদগ্ধ হৃদয় জুড়ায় নাই, নিসর্গ ও মানব মনের একটা গূঢ়-গোপন সম্পর্ক তাঁহারাও দেখিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি রাধিকা—কৃষ্ণের রূপ দেখিয়াছে কালিন্দীর তরঙ্গমালায়, বর্ষার জলভারমন্থর মেঘমালার শ্যামলতায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা হৃদয় হইতে হৃদয়ে কথা বলিতে পারেন নাই। কবি-হৃদয় ও পাঠক-হৃদয়ের মধ্যে সহজ নিকট সম্পর্ক স্থাপিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাসনা-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কবির অন্তর্লোকের ধ্বনিতরঙ্গ রাধা-কৃষ্ণের রূপকল্পনার মধ্যস্থতায় প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ দৌত্যে আবেগ-অনুভূতি যেন কিছুটা তীব্রতা হারাইয়াছে—তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে প্রকাশের প্রত্যক্ষতা হারাইয়াছে। সব চেয়ে বড় কথা, কবির ব্যক্তি-মানস রাধা-কৃষ্ণের লীলা-উৎসবের বর্ণোজ্জ্বল চিত্রের নেপথ্যে থাকিয়া সখীভাবে পরিকরত্ব করিয়াছে। আত্মভাব বজায় থাকিলে বৈষ্ণব-সাধনায় অধিকার জন্মে না। বৈষ্ণব সাধনার প্রথম কথা ব্যক্তি-ভাব বর্জ্জন। বৈষ্ণব কবিতা তাই কবি-ভাবনার বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র নয়। একটি রসের একটি কবিতা হইতে আর একটি

কবিতার পার্থক্য বিচার করা তাই খুবই শক্ত। সমস্ত কবিতাগুলি যেন একই উৎস হইতে উৎসারিত রসের তরঙ্গ। বৈষ্ণব কবিতায় তাই গোষ্ঠী মনোভাব প্রধান, ব্যক্তি-মনোভাব গৌণ। মধ্য-যুগের বৈষ্ণব-কবি গাহিতে পারেন না—'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়।' শরৎ-তপনের প্রভাত স্বপনে তাঁহার মন যদি অকারণে পুলকিত হইয়াও ওঠে, সে পুলকানন্দ রাধা-কৃষ্ণের মিলন-সুখ বর্ণনার জন্য গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

বাংলা লোক-সাহিত্যের মধ্যে কবি-মানস বোধ হয় অতি-সহজেও অকপটে তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখকে বাণীরূপ দিয়াছে। পাবনা জিলার মাঝির কণ্ঠে গানের যে কলিটি শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন —সেটি তো মন-ভার করা যুবতীর কাছে কবির সহজ-মনের প্রতিশ্রুতি। 'যুবতী, ক্যান্ বা কর মনভারী! পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরী।' ইহাতে যুবতীর মন প্রসন্ন হইয়াছিল কিনা জানি না,—কিন্তু কবি যে তাহার অকৃত্রিম প্রণযের সঙ্গে ট্যাহা-দামের মোটরী যোগ করিয়া প্রণয়ের গুরুত্ব ও ওজন বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন, কবির এই সহজ মনোভাব-টুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "দেখিলাম এই গোয়াল ঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দোবন্ধে সুরে তালে মাঠে ঘাটে জলে স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।" কিন্তু লোক-সাহিত্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ব্যক্তি-মনের পরিচয় থাকিলেও, ইহাতে প্রধানত সমাজ-মনোভাবই প্রধান এবং সমাজ-মানসের পরিচয়েই লোক-সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয়। তবে এই সন্ধি-পর্ব্বেই বাংলা কাব্যের গোষ্ঠী-মনোভাব হইতে ব্যক্তি-মনোভাবে, সমাজ-সচেনতা হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে উত্তরণের প্রথম চিহ্ন পড়িয়াছে।

মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে এই ব্যক্তি-ভাব আরও স্পষ্ট। কিন্তু সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধকায় গঠন-সংহতির মধ্যে আত্মভাব সংকুচিত, আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত। কবিতার রূপের ফ্রেম অনুসারে কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে কবিতায় বিকৃতি আসিয়া পড়া অসম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, মধুসূদনের কবি-মানস মহাকবিদের রাজপথেই বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, পল্লী-পথে বিচরণ করিতে গেলেও মহাকবি রাজ-মর্য্যাদা তাঁহার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। টাই-হ্যাট-কোট পরা কবির বাহ্য বেশ

যেমন খাঁটি বাঙ্গালী মনটি আবৃত করিয়াছে, চতুর্দ্দশপদী কবিতার শব্দচ্ছটা, উপমা ও সুউচ্চ প্রকাশভঙ্গী তেমনি সহজ সরল সঙ্গীত-মাধুর্য্যের বুকে পাষাণ চাপা দিয়াছে। বিহারীলাল প্রথম সেই পাষাণ-ভার হইতে বাংলা কাব্যের সঙ্গীতধারাকে উদ্ধার করিয়াছেন। কবি কাব্য-বীণায় আপন মনে সুরের পর সুর সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। কবির মগ্ন চৈতন্যের এই সৃষ্টি বাংলা কাব্যে একটা অলৌকিক সুরলোক সৃষ্টি করিয়াছে। কবির এই সুরলোককে তাঁহার ধ্যানলোকও বলা যাইতে পারে। সূর্যের কিরণস্পর্শে পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে একটির পর একটি পাপড়ি মেলিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়, কবির মানস-পদ্মও সুরসরস্বতীর স্পর্শে তেমনি নিভৃতে একটু একটু করিয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। সারদা-মঙ্গলের পাঠকেরা দূর হইতে আড়ি পাতিয়া সে সঙ্গীত শুনিয়া লইয়াছে। বিহারীলালের কাব্যসাধনা তাই কাব্যসৃষ্টি নয়—কাব্য-যোগ।

॥ ৩ ॥

এইবার বিহারীলালের আলোচনায় প্রবেশ করা যাইবে।

সারদা-মঙ্গল এবং সাধের আসন বিহারীলালের কাব্যমালার মধ্যমণি। এই কাব্য দুখানিতেই তাঁহার কবি-প্রতিভা মধ্য-গগন স্পর্শ করিয়াছে—যদিও এই দুইখানি কাব্যই তাঁহার কবি-জীবনের একেবারে শেষ যুগের রচনা। তাঁহার প্রথম যুগের দুইখানি কাব্য বন্ধু-বিয়োগ ও প্রেম-প্রবাহিণীতে ঈশ্বর গুপ্তের অনুসরণ-চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট, বিশেষ করিয়া ভাষায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে। বিহারীলালের স্বকীয়তা এই কাব্য দুখানির মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে কবির স্বভাব-সুলভ উচ্ছ্বাস ও আবেগ-অসংযম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবিকে অনুসরণ করিয়াছে।

বন্ধু-বিয়োগ কাব্যখানিতে স্মৃতি-মঞ্জুষার আবরণ উন্মোচন করিয়া কবি তাঁহার তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু—পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস ও বিজয় এবং মর্ম্মসহচরী সরলাদেবীর উদ্দেশ্যে ছন্দোবদ্ধ স্মৃতি-অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন। কবির সহিত ইহাদের পরিচয়ের নিবিড়তা এবং অন্তরঙ্গতার সুরটি কবি ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বহু কাহিনীর ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বন্ধুদের চরিত্র-

মহত্ব বর্ণনার তরল উচ্ছ্বাসে স্মৃতি-কাহিনীগুলি ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে —একত্র সংহত হইয়া চরিত্রগুলিকে পাঠকের মানস-সৌরজগতে নক্ষত্র-দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারে নাই। কবি উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, কিন্তু কল্পনার ভাবানুরঞ্জনের বস্তু-তথ্যকে কাব্য-সত্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মৃত-ব্যক্তি আমাদের স্মৃতিতে বস্তুরূপে সঞ্চিত থাকে না, ভাব-বিগ্রহ রূপেই উজ্জ্বল হইয়া থাকে, তাই মৃত-ব্যক্তিকে অতি সহজেই কবিতায় ভাব রূপ দেওয়া যায়। কারণ মৃত্যুর বিশাল কালো যবনিকার অন্তরালে স্থূল বস্তু-সত্তা পরিহার করিয়া তখন সে সূক্ষ্ম ভাব-দেহ ধারণ করে। বিহারীলাল কিন্তু কোন চরিত্রেরই ভাব-সত্তা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। সাহিত্য সৃষ্টিতে selection বলিয়া একটা কথা আছে। ভাবকে কাব্যে বাণীরূপ দিতে গেলে কিছু বর্জ্জন করিতে হয়, কিছু গ্রহণ করিতে হয়। এইভাবে কল্পনায়-বাস্তবে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে, তথ্যে-সত্যে, রূপে-অরূপের মিলনেই গড়া হয় বাঙ্ময় কাব্য-প্রতিমা। বিহারীলালের সে ক্ষমতা ছিল না, এই কাব্যে তিনি এমন তুচ্ছ ঘটনারও অবতারণা করিয়াছেন যাহা কাব্যের বিষয়-বস্তুরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

বন্ধুদের সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতার ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে তিনি বলিয়াছেন—

"কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত,
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত,
তৎক্ষণাৎ উঠিতাম প্রতীকার তরে,
পড়িতাম বিপক্ষের ঘাড়ের উপরে।
কেহ দিলে কাহাকেও থামকা যাতনা,
সবে মিলে করিতাম তাহাকে লাঞ্ছনা।"

লাইনগুলি যে কবিতা হইয়া উঠিতে পারে নাই—তাহার জন্য দায়ী বিষয় না প্রকাশভঙ্গী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত; মনে হয় উভয়-ই।

স্ত্রী-বিয়োগের দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যে পীড়ায় গর্ভবতী বাঁচে না কখন,
যে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রস্রবণ,
যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ,
খাটে না কিছুতে কোন ঔষধি বিশেষ;

আমার দুর্ভাগ্য দোষে প্রিয়া সরলার,
জন্মেছে সে পীড়া, আর বাঁচা ভার ॥"

প্রেম-প্রবাহিণী-তে প্রথম প্রেমের অনুরাগ-উচ্ছ্বাস ও প্রেমের মাদকতাহীন পরিণতির চিত্রই বিভিন্ন সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে এ-কাব্যে প্রেম সম্পর্কে কবির ধারণা স্পষ্ট হয় নাই; উচ্ছ্বাসের ধূম্রজালে কবির সহজ দৃষ্টি আবৃত হইয়া গিয়াছে। তিনি কখনও বলিয়াছেন, 'হায় রে সাধের প্রেম, কত খেলা খেল, মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল।' আবার কোথাও প্রেমের অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিহারীলালের এই কাব্য দুইখানিতে কোথাও কবির শক্তির অস্ফুটতম প্রকাশও লক্ষ্য করা যায় না। ভাষা ও প্রকাশরীতি বন্যঘোড়ার মত তাঁহার নাগালের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। কবি স্বকীয়তাও কিছু দেখাইতে পারেন নাই, আবার ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণ কবিতে গিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। অথচ বিহারীলালের কবি-শক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই কাব্য হইতে উদ্ধৃতি উদ্ধার করা হয়। নীচে ইতস্ততঃ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই কাব্যের একটি লাইনও কবিতার রূপ পায় নাই।

শুদ্ধ প্রেমের অন্বেষণ করিয়া কবি বিফল হইয়া বলিতেছেন—

"কিছুতেই যখন তোমারে না পেলাম।
একেবারে আমি যেন কি হ'য়ে গেলাম ॥"

কোন 'মহামনস্বিনী' নারী 'স্বৈরিণী' হইয়াছেন শুনিয়া কবির উক্তি—

"এক বস্তু ভালো নাহি লাগে চিরদিন।
নবরসে নোলা তাই ঝোঁকে দিন দিন ॥"

প্রেমিকা স্বৈরিণী হওয়ায় প্রেমিকের উক্তি—

"তিনি কহিলেন, 'ভাই জগতের প্রতি,
আমার অন্তর চটে'গিয়াছে সম্প্রতি'।"

সেই স্বৈরিণী-নারীর আগমন-ভঙ্গী বর্ণনা প্রসঙ্গে—

"চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে,
লাট খেয়ে ঘুড়ি যেন থামিছে দমকে ॥"

স্বৈরিণী-নারীর সহিত কবির কথোপকথনটি-ও উল্লেখযোগ্য—

"কাছে এসে শুধালেন মিত্র সম্বোধনে,
'কি ভাবিছ, কি বকিছ দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে'?"

আমি বলিলাম, 'না, এমন কিছু নয় ;
কোথায় আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশয় ?'
কহিলেন তিনি, 'আর সে বিজ্ঞতা নাই,
উপরে আছেন, যাও দেখ গিয়ে ভাই',
মনে হ'ল দুই এক কথা এঁরে বলি,
সংবরি সেভাব গেনু উপরেতে চলি।
ঘরে ঢুকে দেখি—পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ঘরে,
এক কোণে স্তব্ধ হ'য়ে কেদারা উপরে,
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাইয়ে…"

নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যেও কবির বিষয়ের গভীর প্রবেশ-ক্ষমতা আয়ত্ত হয় নাই। সমুদ্র-দর্শন, নভোমণ্ডল, ঝটিকা-সম্ভোগ প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির অনুভূতি গভীরভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে এমন লক্ষণ পাওয়া যায় না। সমুদ্রের বাহ্যিক রূপ দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়াছেন—সমুদ্রের 'অসীম-আকাশ-প্রায় নীল জলরাশি', 'তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি', সমুদ্র-তীরের প্রবল সমীরণ, তরঙ্গের দোলায় দোদুল্যমান পোতশ্রেণী, সমুদ্র-তীরলগ্ন দ্বীপমালা প্রভৃতি বস্তুমূলক বহু বিষয় কবির মনেব আকাশে শরতের লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে।

সমুদ্র-দর্শন-জনিত প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া উঠিলে সমুদ্র নানাভাবে কবির অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে, কিন্তু বিহারীলাল এই বিস্ময়ের প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। নভোমণ্ডল ও ঝটিকাসম্ভোগ প্রভৃতি কবিতাগুলিও কবির সাধারণ ভাব-সমূহকে নাড়া দিয়াছে। তবু সমুদ্র-দর্শন কবিতাটির জায়গায় জায়গায় উপমার সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে দোদুল্যমান জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।"

কিন্তু নভোমণ্ডল বা অন্যান্য কবিতায় ভাষা ও উপমার সে দীপ্তি নাই—

"ওহে নীলোজ্জ্বলরূপ গগনমণ্ডল
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধখণ্ড অবিকল
গোল হ'য়ে ঘেরে আছে মম চারিধার।"

নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যখানির ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব এই যে এই কাব্যে বিহারীলালের স্বকীয় প্রকাশভঙ্গীটি অস্ফুটভাবে ধরা পড়িয়াছে। ভাষা ও প্রকাশ-রীতিতে পূর্ণ বিশুদ্ধি না আসিলেও পূর্ব্ব যুগের কাব্য অপেক্ষা ইহাতে যথেষ্ট উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছে। সব চেয়ে বড়ো কথা, বিহারীলাল তাঁহার নিজস্ব প্রকাশমাধ্যম প্রায় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

বঙ্গসুন্দরীর প্রথম কলিতেই—

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা
উঃ! কি জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ পতন।"

—সারদা-মঙ্গলের কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। যে-লেখনী সারদামঙ্গলের কবিতাগুলি লিখিয়াছিল সেই কুসুম-পেলব লেখনীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বঙ্গসুন্দরী-তে দেখা গেল ভাষায়-উপমায়-প্রকাশরীতিতে কবির পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। শুধু অধিকার নয়, ইহার উপর কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গসুন্দরী বিহারীলালের প্রথম সার্থক সৃষ্টি।

এই কাব্যের 'উপহার' অংশ-ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল কাব্যাংশে ভাবের দিক দিয়া বিশেষ মৌলিকত্ব ও চমৎকারিত্ব নাই বলিলেও চলে; তবে 'উপহার' অংশে বিহারীলালের রোম্যান্টিক কবি-ভাবনা অতি চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

রোম্যান্টিক-কবির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বর্ত্তমানের কুশ্রী দীনতা হইতে, বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূঢ়তা হইতে মুক্তি লইয়া মানস জগতে আত্মনিমজ্জন। যাহা অত্যন্ত কাছের, যাহা অত্যন্ত স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ, তাহা রোম্যান্টিক কবিকে পীড়িত করে। রোম্যান্টিক কবি তাই বাস্তবকেও কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগে রঞ্জিত করিয়া লন; বাস্তবকে দেখেন কল্পনার ভূমিকায়। এই কাব্যের ভূমিকায় বিহারীলালের মানস-পরিভ্রমণের চিত্র অতি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে—

"কভু ভাবি ত্যজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,

যথায় নগর গ্রাম,
নহে মানুষের ধাম,
পড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

*　　*　　*

কভু ভাবি কোন ঝরণার
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার,—
গিয়ে তার তীর তরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

যে সময় কুরঙ্গিনীগণ ;
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—"

বঙ্গসুন্দরী-র 'উপহার' অংশে এইরূপ মুক্ত কল্পনা-ক্রীড়ার চিহ্ন প্রতি পঙ্‌ক্তিতে। এই অংশে কবি কেবল যে বর্ত্তমান হইতে বিদায় লইয়া কল্পলোকে কল্পনা-ঘেরা দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্ম-সংকোচ করিয়া থাকিতে চান্, তাহা নয়। বহির্বিশ্বে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া বৈচিত্র্যের অনুভূতি লাভ করিবার জন্যও কবি-চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

"প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্ ঝর্,
চারিদিক্ মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
সাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ প্রফুল্ল মনে
কাটাই আনন্দে শর্ব্বরী।

বরষার যে ঘোরা নিশায়
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙ্গে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত।
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।”

বঙ্গসুন্দরীর এই অংশ দেখিয়া মনে হয় কবির ভাব-‘দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল’ ; কল্পনার বসন্ত-বাতাসে ‘মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,…নুয়ে বুঝি নামিবে ভূতল।’

॥ ৪ ॥

সারদা-মঙ্গল বিহারীলালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। বঙ্গসুন্দরী-তে কল্পনার বপ্রক্রীড়া, সহস্র অশ্বের গতি সে কল্পনার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, ঝড়ের মুখে মেঘের ন্যায় সে কল্পনা চিত্র হইতে চিত্রান্তরে লইয়া গিয়া পাঠককে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। কিন্তু সারদা-মঙ্গলে শুধু কল্পনা নয়, কল্পনার সহিত ভাবনা, সুরের সহিত রূপের মিশ্রণ। তাই এ কাব্যের বিচারও ভিন্নরূপ হইবে। এ-কাব্যে কেবল বসন্তের পর্য্যাপ্ত কুসুমসম্ভার দেখিয়া মুগ্ধ হইলে

চলিবে না, ফুলের সহিত ফলকেও দেখিতে হইবে।

সারদা-মঙ্গলের পাঁচটি সর্গে সারদার সহিত কবির বিরহ-মিলনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সারদা কে? সারদা একদিকে কবির মানস-মরালী আর একদিকে বিশ্বের সৌন্দর্য্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কবির মানস-প্রিয়া রূপে তিনি বিশেষ, বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের উৎসরূপে তিনি নির্ব্বিশেষ। হয়ত সারদা বিশেষ হইতে নির্ব্বিশেষে, ব্যক্তিক হইতে নৈর্ব্ব্যক্তিকে এমন মুহুর্মুহু রূপান্তরিত হইয়াছেন যে সহসা পাঠক সেই রূপান্তরের সূত্রটি ধরিয়া উঠিতে পারেন না। তথাপি প্রথম সর্গটিতে সারদার এই ব্যক্তিক-নৈর্ব্ব্যক্তিক রূপ চমৎকার সংযম ও সাঙ্কেতিকতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী সর্গগুলিতে সারদার সহিত কবির বিরহ-মিলনের উচ্ছ্বাসবহুল অতিপল্লবিত বর্ণনাই প্রধান—সারদার সংহার-মূর্ত্তিতে কবির সন্ত্রাস, অভয়-মূর্ত্তিতে কবির শান্তি, সারদার আবির্ভাবে কবির উল্লাস, অন্তর্দ্ধানে বিষণ্ণতা—এই উল্লাস ও বিষণ্ণতা, এই পাওয়া ও না-পাওয়ার জোয়ার-ভাটায় কাব্যখানি একটি অনির্দ্দিষ্টের ব্যঞ্জনায় সমাপ্ত হইয়াছে। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘাত সব যুগের কবির মধ্যেই দেখা যায়, কল্পলোকের ধ্যান কখনই করায়ত্ত ধন হইয়া দেখা দেয় না; দেয় না বলিয়া কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, সুরকারের সুর। কিন্তু বিহারীলালের কবিতায় এই আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বিরোধ, কবির উচ্ছ্বাস ও চোখের জল তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি এবং কবি হিসেবে সেইখানেই বিহারীলালের অপকর্ষ।

বিহারীলালের সারদা-পরিকল্পনার মধ্যে কোন তত্ত্ব-কথা আবিষ্কার না করিয়া সারদা-মঙ্গল কাব্যখানি পড়িলে সাধারণের চোখে সারদার যে রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, কবির অনুসরণে সেই রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম সর্গে উষা-বন্দনার মঙ্গল-গীতে সারদা-মঙ্গলের সূচনা। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তরুণী উষা পূর্ব্বাকাশের তোরণ-দ্বারে আবির্ভূত হইতেছেন, তাহার—

"চরণ-কমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতারা জ্বলে।"

রাত্রির শেষে দিনের সূচনায় পূব-দিগন্তে যখন আঁধার-আলোর আলিঙ্গন, তখন উষা দেবীর রূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবার কথা নয়। কবিও তাই অতি

সূক্ষ্ম তুলিকায় ঊষার সাঙ্কেতিক চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন। উদীয়মান সূর্য্য-কিরণপ্রভায় দেবীর চরণ অলক্ত-রক্তরাগে রক্তিম। সূর্য্যমণ্ডলের উপর ঊষা দেবী দণ্ডায়মানা, তাই চরণে রবির রেখা, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ আভা। এইখানে চিত্র সম্পূর্ণ, ঊষা দেবীর বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা কবি করিলেন না, কারণ আলো-আঁধারের ছায়ায় ঊষা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপেই প্রতিভাত। বিশ্ব তখনও আলোকিত হয় নাই, তখন 'হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙো ভাঙো ঘুম ঘোর,' তখনও ঊষা দেবীর 'সীমন্তে শুকতারা জ্বলে'। তাই কবি ঊষার চিত্র একটা অস্পষ্টতার ধূসর মায়া-যবনিকার উপর বিরল রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ঊষা দেবীর এই চিত্রখানি বিহারীলালের সমগ্র কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সু-অঙ্কিত চিত্র। এমন সংযম এমন সাঙ্কেতিকতা, এমন সূক্ষ্ম তুলিকায় বর্ণলেপন কোন দুর্ব্বল শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হইত না। প্রসঙ্গত আরও একটি কথা বলিতে পারি যে নিসর্গ চিত্র অঙ্কনে বিহারীলালকে কদাচিৎ অসংযত হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার সংযমের বাঁধ ভাঙিয়াছে যখন তিনি অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়াছেন। তাই বলা যায়, বিহারীলাল সার্থক শিল্পী, কিন্তু সার্থক কবি নন। শিল্পীর কাজ চিত্র আঁকা, কবির কাজ অনুভূতি যোগানো। যেখানে এই দুইয়ের মিলন সেইখানেই মহাকবির সৃষ্টি।

ঊষা দেবীর সহিত কবি তাঁহার বীণাপাণি সারদাকে আবাহন করিয়াছেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই দেখি কবির হৃদয়-কমল যে বীণাপাণির চরণস্পর্শ কামনা করিয়াছে সেই বীণাপাণি কবির হৃৎকমলে বিরাজিতা এবং তিনি আর কেহই নন—পূর্ব্ব-বন্দিতা ঊষা দেবী। তাঁহার—

"কপোলে সুধাংশু ভাস
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।"

এইভাবে বহির্বিশ্বের সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি ঊষা মুহূর্ত্তমধ্যে কবির হৃদ্-পদ্মের বীণাপাণিতে পরিণত হইয়াছেন। কবি যাঁহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অন্তরে তাঁহাকে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। অন্তর-বাহিরের মিলনে কবি বলিয়াছেন—

"তুমি সাধনের ধন
জ্ঞান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে।"

সারদা-মঙ্গলের প্রথম চারিটি গানে উষার সহিত বীণাপাণির অভিন্নতায় এবং কবির সাধের সহিত সাধ্যের মিলনেই কাব্যের বন্দনা-গীত সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর আদি-কবি বাল্মীকির আশ্রমে সৃষ্টির আদি প্রভাতে সরস্বতীর আবির্ভাবের রূপক-কাহিনীও চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তখনও সারদার রূপের সহিত উষার রূপের অভিন্নতা—

"করে ইন্দ্রধনু বালা
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।"

(২১-২৯ সঙ্গীতে) ব্রহ্মার মানস-সরে কবি সারদার বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। যে জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসার শোক-সঙ্গীতে গদগদ আদি কবির অন্তরে 'করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়', সেই 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'-ই সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ব্রহ্মার মানব-সরোবরে ক্রীড়া করেন। অর্থাৎ যিনি কাব্য-অধিষ্ঠাত্রী তিনিই সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী। এই সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দর্য্য। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-প্রতিমার প্রতিবিম্বই বিশ্বের খণ্ড-সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। বিশ্বে যে সৌন্দর্য্য বহুতে বিচিত্র, এই একে তাহা সংহত। ইহাই বোধ করি বাহিরের বৈচিত্র্য ও অন্তরের একত্বের কল্পনা এবং ইহাকেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ চিত্রায় বলিয়াছেন—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

* * *

অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী,
তুমি অন্তরবাসিনী।"

সূর্য্যের আলোয় যেমন জগৎ আলো, সারদার সৌন্দর্য্যে তেমনি জগতের সৌন্দর্য্য। সূর্য যেমন আলোর আকর, সারদা তেমনি সৌন্দর্য্যের আকর। এই সারদার সৌন্দর্য্য-দ্যুতিতে জগতের সৌন্দর্য্য-কণিকার দ্যুতি। এই ভাবটি কবি একটা চমৎকার রূপ-কল্পনার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। স্বচ্ছ

তরল দর্পণে বিশ্বের দিগন্ত যেন আবৃত, তাহার মধ্যস্থলে বিশ্বের সারভূত সৌন্দর্য্য-দেবী সারদা এবং চতুর্দ্দিকে দেবীর প্রতিবিম্ব—

"ফটিকের নিকেতন,
দশ দিকে দরপণ,
বিমল সলিল যেন করে তক্ তক্।
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়
হাসিয়ে যে দিকে চায়,
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া,
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে
ঘুরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক দেখিলে, হয় অমনি অবাক, চক্ষে পড়ে না পলক;
তেমনি মাসন-সরে
লাবণ্য-দর্পণ ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া॥"

চতুর্দ্দিকে প্রতিবিম্ব দেখিয়া দেবী বিহ্বল হইয়া পড়েন। চতুর্দ্দিকে প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য-প্রতিমায় তিনি শ্বেত-শতদল পরাইতে যান্—

"রূপের ছটায় ভুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার।
অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী;—

দেবী বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী; তিনি চমকিত হইলে বিশ্ব চমকিত হয়; তাই দেবীর 'চমকে গগন তারা, ভূধরে নির্ঝরধারা, চমকে চরণতলে মানস-সরসী।' এই চিত্রখানিও কোন দুর্ব্বল শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হইত না। তবে এই চিত্র-ই সারদা-মঙ্গলের শেষ চিত্র। ইহার পর চারিটি সর্গে চিত্র গৌণ, সুর প্রধান। সে সুর কোথায়ও হর্ষের কোথায়ও বিষাদের, কোথায়ও সংশয়ের। সে সুর প্রগাঢ় অনুভূতির সুর নয়, তরল উচ্ছ্বাসের সুর।

প্রকৃত বিচারে প্রথম সর্গেই সারদা-মঙ্গলের সমাপ্তি। কবির ভাবও এইখানে শেষ হইয়াছে। কবি যদি এইখানে কাব্য সমাপ্ত করিতেন, তাহা হইলে সারদা-বিরহের দুঃখ কবি-হৃদয় ত্যাগ করিয়া পাঠক-হৃদয় অধিকার করিত এবং সুগীত সঙ্গীতের রেশটুকুর মত সারদা-মঙ্গল গানের রেশও পাঠকের হৃদয়ে বাজিতে থাকিত। কিন্তু কবি তাহা করেন নাই। সারদার বিরহে কবির ক্রন্দন চারিটি সর্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং পরিশেষে কবি যখন থামিলেন তখন পাঠকের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

কবির সে হর্ষ-বিষাদের উচ্ছ্বাস বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না—

"ফের একি আলো এলো
কই কই কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার ;
কে আমারে অবিরত
ক্ষেপায় ক্ষেপার মত
জীবন কুসুমলতা কোথা রে আমার।"

কবি আরাধ্যা সারদা দেবীকে পান, পাইয়া হারান। কবি কখনও সারদার অভয়-মূর্ত্তি দেখেন, কখনও দেখেন সংহার-মূর্ত্তি। কখনও বিষাদিনী সারদার দুঃখে অশ্রুমোচন করেন, কখনও অভিমানিনী সারদার মানভঙ্গ করেন। আবার কখনও সংশয়-ব্যাকুল হইয়া বলেন—

"তবে কি সকলি ভুল
নাহি কি প্রেমের মূল
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা লতার।"

আদর্শ-বাস্তবের এই লুকোচুরি খেলা, সসীম ও অসীমের এই সমন্বয়-চেষ্টা হিমালয়-শৃঙ্গে সারদার সহিত কবির মিলন-চিত্রে সমাপ্ত হইয়াছে।

এই কাব্যের হিমালয়-বর্ণনা অংশ কোন কোন সমালোচকের মতে নিসর্গ-বর্ণনার একটা চমৎকার নিদর্শন। জায়গায় জায়গায় বর্ণনা হয়ত খুবই চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সারদা-মঙ্গল কাব্যখানি পড়িতে পড়িতে এইটিই কাব্যের দুর্ব্বল অংশ বলিয়া মনে হয়। হিমালয় যেন নিতান্ত অসঙ্গতভাবে কাব্যের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কবি ও সারদার বিরহ-মিলনের দীর্ঘ লীলা দেখিতে দেখিতে পাঠক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলে হিমালয়ের 'উদার রূপরাশি'র মধ্যে যেন, তাহার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহাতে কবি ও সারদার মধ্যে হিমালয়-দেওয়াল গগনচুম্বী হইয়া উভয়ের ব্যবধানকে উত্তুঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। পরে এই হিমালয়-শৃঙ্গেই যখন আবার উভয়ের মিলন হয়, তখন সে মিলন-চিত্রের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ আর তেমন থাকে না।

রোম্যান্টিক কবি নিসর্গকে দেখেন আপন ভাবানুরঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া, রোম্যান্টিক কবির কাব্যে তাই নিসর্গ কেবল বস্তুরূপেই সমাপ্ত হয় না; বস্তু-রূপ কবি-কল্পনাস্পর্শে ভাব-রূপে পরিণত হয়। এই ভাব-রূপের ভিতর দিয়া বর্ণিত হয় কবির মানস-রূপ—কবির mood। অবশ্য কেবল বস্তু-রূপ-সর্ব্বস্ব objective নিসর্গ-বর্ণনা যে নাই তাহা নয়, তবে বিরল। আত্মভাব-প্রধান কবির পক্ষে নৈরাত্ম objective কবি-কল্পনা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কিন্তু সারদা-মঙ্গলের ন্যায় একখানি আত্মভাবপ্রধান subjective কাব্যে এরূপ objective নিসর্গ-বর্ণনা একেবারেই অসঙ্গত হইয়াছে। তাই চতুর্থ সর্গটি এবং পঞ্চম সর্গের কিছু অংশ মূল ভাব-সূত্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়। আবার হিমালয়ের প্রথমাংশের বর্ণনায় সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও পরিশেষে গঙ্গোত্রীতে দাঁড়াইয়া গঙ্গার জলপ্রবাহে কলিকাতার নাড়ীর সম্পর্ক অনুভব করিয়া কবি সূক্ষ্ম বর্ণনার মধ্যে স্থূল লৌকিক ভাবের অবতারণা করিয়াছেন—

"ত্রিলোক তারিণী গঙ্গে
তরল তরঙ্গ-রঙ্গে,
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি;
চলেছ মা মহোল্লাসে
তোমারি পুলিনে হাসে,
সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী।"

সারদা-মঙ্গলে কবি-কল্পনার মৌলিকত্ব থাকিলেও ভাব-সংযমের অভাবে ইহার কাব্যসম্ভাবনা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। লিরিক কবিতার উপাদান প্রগাঢ় অনুভূতি ও কল্পনার ক্রীড়া-বিলাস (intense emotion coupled with an intense display of imagery); কিন্তু বিহারীলালের কবিতায় পাই অনুভূতির পরিবর্ত্তে আবেগ, কল্পনার পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাস। এই আবেগ ও উচ্ছ্বাস সংহত হইলে সারদা-মঙ্গল বাংলা কাব্য-মালায় উজ্জ্বল রত্ন হইয়া শোভা পাইত।

যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির জন্য সারদা-মঙ্গলের কাব্যসম্ভাবনা পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে নাই, এইবার সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমত, অরূপ-ভাবকে কবি স্পষ্ট রূপ-মূর্ত্তি দান করিতে পারেন নাই। কবির সারদা একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে তত্ত্বরূপে রাখিয়াও কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব ছিল, কিন্তু এই তত্ত্বকে কবি রূপের ফ্রেমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কবি সারদাকে রূপবতী সৌন্দর্য্য-প্রতিমারূপে গড়িতে গিয়াছেন কিন্তু সে রূপায়ন নিখুঁত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব হইয়াও চরিত্র। তাহার অদৃশ্য অঙ্গুলি-সংকেত কবি যেমন দেখিতে পান, পাঠকও তেমনি দেখিতে পায়। রবীন্দ্রনাথ এই অপরূপ তত্ত্বকে সার্থক-ভাবে রূপের সীমার মধ্যে ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বিহারীলালের সারদা রূপ ও অরূপ রাজ্যের মাঝামাঝি জায়গায় থাকিয়া কবিকে উৎকণ্ঠিত ও পাঠককে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, কবি অলৌকিক ভাব-কল্পনার মধ্যে লৌকিক ভাবের মিশ্রণ ঘটাইয়া কাব্যের রস-পরিণতিতে বাধা জন্মাইয়াছেন। বিশুদ্ধ গীতিকবিতায় লৌকিক ভাবের স্থান হইতে পারে না, কবি-কল্পনার ফিল্টারে ছাঁকা হইয়া লৌকিক ভাবও অলৌকিক ভাব-নির্য্যাসে পরিণত হয়। এই কারণে গীতি-কবিতায় বাস্তবতার দাবী অবান্তর। কিন্তু কবি সারদার সহিত মান-অভিমান মিলন-বিরহের মধ্যে এমন লৌকিক ভাবের অবতারণা করিয়াছেন যে তাহাতে ভাবের সূক্ষ্মতা নষ্ট হইয়া কাব্যের মূল পরিণতি ব্যর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কোন একখানি সাঙ্কেতিক বা রূপক নাটককে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিলে কথাটি পরিষ্কার বোঝা যাইবে। রাজা নাটকে রাজা-সুদর্শনার কাহিনী লৌকিক হইয়াও অলৌকিক, নাটকের ভাষার বাচ্যার্থ লৌকিক, ব্যঙ্গার্থ অলৌকিক। বাচ্যার্থের লৌকিকতা কাব্যের জগতে রাজার স্থান করিয়া দিয়াছে, ব্যঙ্গার্থের অলৌকিকতা ইহার মর্ম্মবাণীটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। বিহারীলালের সারদা-মঙ্গলের মর্ম্মার্থের সূক্ষ্মতা ও সাঙ্কেতিকতা রাজা নাটক অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয় এবং ইহা পরিস্ফুটনের জন্য বিহারীলালেরও অনুরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত ছিল, কিন্তু কবি তাহা করেন নাই। এই শ্রেণীর গীতিকবিতায় যে ভাবগুলির অবতারণা করা হয় সেগুলি স্ফটিকের ন্যায় এমন স্বচ্ছ হয় যে সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া মূল কাব্যের কেন্দ্রানুগ মর্ম্মটি অতি সহজেই দেখা যায়। স্বচ্ছ দর্পণ যেমন বস্তুকে আবৃত করে না, প্রতিবিম্বিত করে, এই শ্রেণীর গীতি-

কাব্যেও তেমনি স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খণ্ড ভাব-দর্পণগুলি মূল ভাবটিকে প্রতিবিম্বিত করে। তাই এ কাব্যেও ভাবকে ঠিক ততখানি পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করিয়া উপস্থাপিত করা উচিত ছিল এবং তাহা হইলে বিভিন্ন ভাব-দর্পণে মূল ভাবের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারিত। কিন্তু সারদা-মঙ্গল কাব্যে বিহারীলাল যে ভাবগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন সেগুলি অলৌকিক দর্পণ নয়, লৌকিক মৃৎপিণ্ড; ইহার উপর প্রতিবিম্ব পড়ে না। এই কারণে কবির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

ভাষা এই কাজে কবিকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিত; কিন্তু কবির ভাষাও এমন লৌকিক যে তাহা কোন সূক্ষ্মভাব প্রকাশের উপযোগী নয়; কেহ কেহ বিহারীলালের লৌকিক ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন; কবির ভাষা প্রকৃতই জলের মত সহজে বহিয়া যায়, কিন্তু সারদা-মঙ্গল কাব্যে এ ভাষার উপযোগিতা নাই। ভাষার একটা নির্দিষ্ট শক্তি আছে, প্রত্যেক ভাষার প্রত্যেক ভাব প্রকাশের শক্তি থাকে না। লৌকিক ব্যবহারের মালিন্যের স্পর্শ যে-ভাষার সর্ব্বাঙ্গে, সে ভাষা সারদা-মঙ্গলের সূক্ষ্ম ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। গীতিকবিতায় মহাকাব্যের ন্যায় অপরিচিত শব্দবহুল ভাষা ব্যবহার করিলেও সুরসৃষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং লিরিক-কবিকে লৌকিক ভাষাকেই মার্জ্জনা করিয়া, সংস্কার করিয়া ভাষার বাচ্যার্থ নয়, ব্যঞ্জনা-শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়। উপমা অলঙ্কার প্রভৃতির মধ্য হইতেও একটা অসীম-অনির্দ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলিতে হয়, উপমাগুলিও সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ বাস্তব সংসার-মুখী না হইয়া নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যলোক-অভিমুখী হয়, কিন্তু বিহারীলালের ভাবটি যেমন লৌকিক, ভাষাও তেমনি লৌকিক। তিনি ভাবকেও শোধন করেন নাই, ভাষাকেও মার্জ্জিত করেন নাই; উপমার লক্ষ্যও মর্ত্ত্যজগতের দিকে। তাই কবির সবগুলি উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। সারদা-মঙ্গলের প্রথম সর্গটি ইহার ব্যতিক্রম।

হিমালয়-শৃঙ্গে সারদার সহিত কবির যে মিলন হইয়াছিল—সে মিলন কাব্যের মিলন, অন্তরের মিলন নয়। তাই সাধের আসন-এ দেখি কবি আবার বিশ্বসৌন্দর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অন্বেষণ করিতেছেন। তবে কবি অন্বেষণের পথে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝিতে পারি। কারণ, কবি জানিয়েছেন এই 'কান্তিসঙ্কলিত-কায়া অপরূপ ললনা'-কে বিশ্বের খণ্ড সৌন্দর্য্যের মধ্যেই দেখিতে হইবে। এই বিশ্ব তাঁহারই লীলা-বিভূতি, বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত তাহার কোন সত্তা নাই—

"বিশ্ব গেছে কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না;
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না।
তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তিখানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্বপানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও?
কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর জগৎ-স্বামী?
সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত
কিছু নহে প্রতিভাত॥

ইহার পরে আর একটি সঙ্গীতে দেখি কবির দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। কবি বুঝিয়াছেন রহস্যময়তাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ এবং এই বোধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোম্যাণ্টিক কবির মিস্টিক কবিতে রূপান্তর। সারদা-মঙ্গলের অশান্ত রোম্যাণ্টিক কবি সাধের আসনের মিস্টিক তন্ময়তায় বিভোর। রোম্যাণ্টিক কবির ইতিহাস সৌন্দর্য্যের রহস্য মরীচিকার পিছনে ছুটিবার ইতিহাস; মিস্টিক কবির ইতিহাস উপলব্ধির আনন্দময়তার ইতিহাস। প্রথমটিতে গতি, দ্বিতীয়টিতে স্থিতি; একটিতে খোঁজা, আর একটিতে পাওয়া।

কবি যখন বুঝিলেন, রহস্যময়তাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ তখন তিনি বলিলেন—

"রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহাপ্রলয়-পথে ভুলি কভু ধাব না।

রহস্য বিশ্বের প্রাণ
রহস্যই স্ফূর্ত্তি মান্
রহস্যে বিরাজমান ভব।"

এই উপলব্ধি যখন তিনি লাভ করিলেন তখন রূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি তত্ত্বের ঐক্য আবিষ্কার করিলেন এবং তখনই কবির আসন ছাড়িয়া তিনি ধ্যানীর আসনে বসিলেন।

সারদা-মঙ্গলের ন্যায় সাধের আসনের মূল ভাবও প্রথম সর্গে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"—এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরের সর্গে যে ভাবগুলি আছে সেগুলি এই মূল ভাবেরই ব্যাখ্যা। সারদা-মঙ্গলের প্রথম সর্গে ঝরণা ধারার গতিতে যে ভাব বহিয়া আসিয়াছিল, সাধের আসনের প্রথম সর্গের শেষে "আকাশ পাতাল ভূমি সকলি কেবল তুমি"—এই 'তুমি'র মোহনায় আসিয়া সে উদ্দাম গতি চিরবিরাম লাভ করিয়াছে।

বিহারীলালের সমগ্র কাব্যমালা পড়িয়া তাঁহার কবিশক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করিয়াছি এক কথায় তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়—বিহারীলালের শক্তির প্রকাশ অলৌকিক ভাবের ব্যঞ্জনায় নয় লৌকিক ভাবের বর্ণনায়। রূপসৃষ্টিতে নয়, কল্পনার বপ্রক্রীড়ায়। নিসর্গ-বর্ণনায় তাঁহার সংযম, ভাব-বর্ণনায় অসংযম। বিহারীলালের কাব্যমালায় নিসর্গ-চিত্রগুলিই উচ্ছ্বাসের অমারাত্রির মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। তাঁহার কাব্যের মূল বাহন সুর, গৌণ বাহন চিত্র। কিন্তু চিত্র-বাহনই তাঁহার বশংবদ। তিনি শুধু কবি নন্, যোগীও। শিল্পী ও ধ্যানীর মিলন তাঁহার মধ্যে, তাই কেবলমাত্র শিল্পীর বাহন চিত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ধ্যানীর সপ্তসুরের ডিঙ্গায় উঠিয়া সারদার অভিসারে বাহির হইবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু সে সপ্তডিঙ্গার তরঙ্গ শিল্পীর চিত্রকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কবিকে যোগী পরাভূত করিয়াছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

। ১ ।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধকে (১৮৫০-৯৬) আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে নর্ম্মান ও আংলো-সাক্সনদের সাংস্কৃতিক মিলন যেমন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এক অপরূপ জীবনরসের কাজ করিয়াছিল, বাংলাদেশেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির মিলন অনুরূপভাবে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে ক্রিয়াশীল হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। অতি সামান্যকালের ব্যবধানের মধ্যে রঙ্গলাল-মধুসূদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ন্যায় বহু উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব সেই অনুমানকে যুক্তি-প্রতিষ্ঠ করে। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ব্যাপক মিলন-যজ্ঞ শুরু হইয়াছিল, অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে যুগপৎ এতগুলি শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব সেই শুভ সূচনার সার্থক পরিণতিরই আভাস দেয়। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই যুগের সাহিত্য সিদ্ধির আনন্দ অপেক্ষা সাধনার কৃচ্ছ্রতৎপরতার লক্ষণ-ই অধিক প্রকট, যৌবনের গৌরব-দীপ্তি অপেক্ষা কৈশোরের সারল্য-সুষমাই প্রধান। এই যুগের বাণী-সাধকেরা রস-সৃষ্টির গৌরবে নয়, ব্যাপক সংগঠন শক্তিতেই স্মরণীয়। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ রাখিয়াও একথা বলিতে পারি—এ যুগের সাহিত্য পরীক্ষা-ক্রান্তি পর্ব্বের সাহিত্য।

এই যুগে দুইজন শক্তিশালী যুগপ্রবর্ত্তক কবি কাব্যের দুইটি বিশিষ্ট রীতিতে দুই পথে অগ্রসর হইয়াছেন। একদিকে মধুসূদন, তাঁহার বাহন ক্লাসিক মহাকাব্য। আর একদিকে বিহারীলাল, তাঁহার বাহন রোম্যান্টিক গীতিকাব্য। কথা-সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে লইলে ত্রি-রথীর ব্যূহ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বর্ত্তমান আলোচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। মধুসূদনের মহাকাব্যের অমৃতধারা দুর্ব্বল-অক্ষম অনুকারকদের হাতে পড়িয়া ব্যর্থতার মরুবালুতে শুষ্ক হইয়াছে; বিহারীলালের সঙ্কীর্ণ রোম্যান্টিক-ধারা রবীন্দ্র-গীতিসমুদ্রে পতিত হইয়া সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতচন্দ্র যে কাব্য-রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন, বেশ ও রুচি পরিবর্ত্তন করিয়া সেই কাব্যাদর্শ পরবর্ত্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্য দিয়া রঙ্গলাল পর্য্যন্ত প্রবহমান ছিল। তাই বলা যায় এইটিই বাংলা কাব্যের মূল

প্রবাহ। নানাদিক হইতে যুগোপযোগী নানা ভাবের ঝরনা-ধারা আসিয়া ইহার স্বাদের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইলেও মূল প্রবাহ প্রায় অবিকৃত ছিল। এইভাবে প্রাচীন-নবীনের মিশ্রণে বাংলা কাব্যধারা যখন ধীর-মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে তখন মধুসূদনের আবির্ভাব। বাংলা কাব্যের রাজদণ্ড তখন পদ্মিনী-উপাখ্যান-খ্যাত রঙ্গলালের হাতে। মধুসূদন বাংলা কাব্যের এই মূল প্রবাহে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন না, তিনি একটা নূতন কাব্যধারাকে বাংলার শীর্ণ শুষ্কপ্রায় কাব্যধারার সহিত সংযোগ ঘটাইয়া দিলেন। সে নূতন কাব্যধারায় সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা, সমুদ্র-তরঙ্গের ভীষণতা। কিন্তু মহাকাব্যের সে উত্তাল তরঙ্গমালায় হাল ধরিবার মত কাণ্ডারী মধুসূদনের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দের মধ্যে কেহই ছিলেন না, তাই সে কাব্যধারা শীর্ণ হইতে হইতে ক্রমে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

বিহারীলালের প্রথম আবির্ভাব ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের অনুগতরূপে। শান্ত-নিস্তরঙ্গ প্রবাহে পাল তুলিয়া মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে তিনি কাব্য-তরণী বাহিয়া আসিতেছিলেন (দ্রঃ বন্ধু বিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী কাব্য), হঠাৎ পালে উল্টা হাওয়া লাগিল, পরিচিত প্রবাহ ছাড়িয়া তরণী ভিন্ন প্রবাহে চলিল—এই প্রবাহের মোহনায় রবীন্দ্র-গীতি-সিন্ধু।

মেঘনাদ-বধ-এর কাব্য-সৌন্দর্য্য স্পষ্ট মনে রাখিয়াও বলিতে হইবে, ইহা পরীক্ষা পর্ব্বের কাব্য। ইহা ক্লাসিক কাব্যাদর্শ প্রবর্ত্তনার প্রথম সূচনা-স্তম্ভ। সারদা-মঙ্গল রোম্যাণ্টিক গীতি-আদর্শের প্রথম কাব্য। দুই কাব্যেই দুইটি বিশিষ্ট ধারার সূচনা, দুই কাব্যেই রসগঙ্গোত্রীর প্রথম তুষার-কারা উন্মোচন। একটি মহাসিন্ধুর কোলে বিরাম লাভ করিয়াছে, আর একটি মরুপথে শুষ্ক হইয়াছে।

॥ ২ ॥

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাংলা কাব্যের এই ভূগোলের মধ্যে হেমচন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যে অবশ্য হেমচন্দ্র মধুসূদনের সুযোগ্য উত্তরসাধক রূপেই উচ্চপ্রশংসিত। বৃত্র-সংহার কাব্যে মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণ-চেষ্টাই বোধ হয় এইরূপ ধারণার মূল কারণ। মধুসূদনের উত্তরসাধকত্ব করিবার মত প্রতিভা হেমচন্দ্র কেন, বাংলা সাহিত্যের কোন কবির-ই ছিল না। তাঁহার কাব্য-ধারার প্রথম সূচনাই এত উচ্চস্তরের যে তাহাতে নবজাতকের দৈহিক অপূর্ণতা ও মানস-দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করা যায় না। জন্মগ্রহণ করিয়াই এই শিশু কাব্যধারা যেন যৌবনের অটুট লাবণ্যশ্রী প্রতিবিম্বিত করিয়াছে। শৈশব ও কৈশোর-পর্ব্ব যেন কবি-জঠরে কাটাইয়া পূর্ণ যৌবন-দীপ্তি লইয়াই ইহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাই মেঘনাদ-বধ কাব্যে একটা নূতন কাব্য-রীতির প্রতিষ্ঠা হইলেও ইহার ত্রুটি-দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া এই কাব্যধারাকে পূর্ণতার পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া তো দূরের কথা, কোন কবি-ই মেঘনাদ-বধের স্তর (standard) পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই। বৃত্রসংহারের কবি মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যের পরিকল্পনার বিশালতা, পরিবেশের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার ওজস্বিতা অনুসরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও কৃত্রিম কবি-কল্পনার যে পার্থক্য, মেঘনাদ-বধ ও বৃত্র-সংহারে সেই পার্থক্য এবং ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারি যে হেমচন্দ্র তাঁহার কবি-প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ-পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ঠিক এক শ্রেণীর নয়। উভয়ের পার্থক্য মাত্রাগত (degree) নয়, শ্রেণীগত (class)। হেমচন্দ্রকে রঙ্গলালের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রঙ্গলালের সাধনাকেই তিনি পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রঙ্গলালের আদর্শেই তিনি অনুপ্রাণিত।

হেমচন্দ্র যে মধুসূদনের আদর্শের কবি নন, এ কথা হেমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। অবশ্য হেমচন্দ্রের সহিত যাঁহাদের পরিচয় কেবলমাত্র বৃত্র-সংহার কাব্যের মাধ্যমে তাঁহাদের পক্ষে অনুরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

হেমচন্দ্র মেঘনাদ-বধ কাব্যের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

সমালোচক হেমচন্দ্র হয়ত মেঘনাদ-বধ-কাব্যের ভাষার শক্তি ও ভাবের গভীরতা কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যানুশীলনে তিনি মধুসূদনের আদর্শ গ্রহণ না করিয়া এক বাঁক পিছাইয়া গিয়া ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের আদর্শ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে মনে হয়, সে যুগের সাধারণ কাব্য-রসিকের ন্যায় হেমচন্দ্রের মনও ভারতচন্দ্রের কাব্যজগতে বন্দী হইয়াছিল। তাই মেঘনাদ-বধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও মেঘনাদ-বধের কাব্য-রীতিকে অনুসরণ না করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি মধুসূদনের আদর্শের প্রতিবাদ-ই করিয়াছেন। চিন্তাতরঙ্গিণী কাব্যের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "কবিতাকেশরী রায়-গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃলাভ করা অসাধ্য।" তখন মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, হয়ত মেঘনাদ-বধও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত হউক বা না হউক, সেটা বড় কথা নয়; ইহা হইতে এটুকু লক্ষ্য করিতে পারি যে ভারতচন্দ্র হইতে যুগের ও ভাবের এত দূর ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের কাব্যাদর্শের উপর কবির কি অকুণ্ঠ সম্ভ্রমবোধ! সে যুগের জনচিত্তের উপর ভারতচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল সত্য; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়াও প্রাচীন কাব্য-রীতির প্রতি এই শ্রদ্ধা, বিনা প্রতিবাদে প্রাচীনের প্রতি এইরূপ আনুগত্যই প্রমাণ করে যে কাব্যানুশীলনে হেমচন্দ্র প্রাচীনপন্থী, তিনি মধুসূদনের সরণি অনুসরণ করেন নাই। বাংলা কাব্যের যে মূল প্রবাহ ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের মধ্য দিয়া বহিয়া আসিতেছিল, মধুসূদনকে অতিক্রম করিয়া তিনি সেই তরঙ্গে তরঙ্গ সংযোগ করিয়াছেন। মেঘনাদ-বধ প্রকাশিত হইবার এক যুগ পরে (১৩ বৎসর) বৃত্র-সংহার কাব্যে একবার মাত্র তিনি মধুসূদনকে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু সেই প্রথম এবং সেই শেষ। বৃত্র-সংহারের পূর্ব্বে বা পরে হেমচন্দ্র যে অজস্র কাব্য-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার উপর মধুসূদনের একটি শব্দগত প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় না এবং হেমচন্দ্রের পূর্ব্বাপর সমগ্র রচনা পাঠ করিলেও স্পষ্ট মনে হইবে যে বৃত্র-সংহারে হেমচন্দ্র তাঁহার স্বক্ষেত্রের বাহিরে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। সুতরাং হেমচন্দ্রকে যে মধুসূদনের মন্ত্রশিষ্য বলা হয়—ইহার পিছনে একটা ভ্রান্ত ধারণাই ক্রিয়াশীল।

হেমচন্দ্র মধুসূদনের সহিত এক ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও কেন তাঁহার কাব্য-সরণি অনুসরণ করেন নাই, সে সম্পর্কে স্বভাবতই কৌতূহল জাগিতে পারে। ইহার উত্তর—উভয়ের কবি-প্রতিভার পার্থক্য। কিন্তু ইহা

ছাড়া অন্য কারণও আছে। প্রথম কারণ—মধুসূদনের কাব্যাবলী এ যুগের রসবেত্তাদের নিকট যতই সমাদর লাভ করুক, মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রথম প্রকাশ-কালে মধুসূদনের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কেহই এই অলোকসামান্য কাব্যপ্রতিমাকে বঙ্গ-সাহিত্যের মন্দিরে বরণ করিয়া লয় নাই। পরন্তু, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বহু সমালোচক-মৃগশিশুর শৃঙ্গ সে কাব্যস্তম্ভে আঘাত করিতে গিয়া ভোঁতা হইয়াছে। মধুসূদনের সমসাময়িক যুগ মেঘনাদ-বধ কাব্যকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা পরে দেখিব; এখানে হেমচন্দ্র মেঘনাদ-বধকে কোন্ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন—সেটা লক্ষ্য করি।

হেমচন্দ্র এই কাব্যের একটি প্রশংসাসূচক ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে হেমচন্দ্র মধুসূদনের কবিশক্তি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ ধারণার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদ-বধ কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র যখন ইহার ভূমিকা লিখিতে যান, তাহার এক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই কাব্যখানি তাঁহার অপঠিত ছিল। সে কথাও যাক। হেমচন্দ্র দুইটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন—প্রথমটি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখন সেই পরিবর্ত্তিত ভূমিকাটি-ই প্রচলিত। কিন্তু প্রথম ভূমিকাটি লক্ষ্য করিলে মধুসূদনের কাব্য সম্পর্কে তখন হেমচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। দীর্ঘ হইলেও ভূমিকাটির কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্য।

"মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই।...বুঝি বা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি মাইকেলের যেরূপ কবিত্বশক্তি, তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে তো আর কথাই ছিল না—তাঁহার লেখায় বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটি বলিতে হয়।...যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের লেখায় কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভালো লেখা বলে অগ্রে জানা কর্ত্তব্য। যেখানে যে কথাটি খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব; কোন্ উৎপ্রেক্ষা কোন্ কালের উপযোগী, কোন্ শব্দটি, কোন্ পদটি উচ্চারণ করিলে কোন্ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে পারেন, তাঁহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট। কবি মাইকেলের যে এ সকল গুণ নাই—এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাসকালীন কথার হ্রস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি প্রয়োগ করা

আছে, সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য।

"মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা উক্তি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎর্সনা, রাজার প্রতি রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার কুহকিনী শব্দে বিন্যস্ত হইয়াছে।......কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বল্কল-বেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাণ্ডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোদ্ভব হয়?

"পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষাগুলি সর্ব্বত্র যথাযোগ্য হয় নাই। স্থলবিশেষে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ানো হইয়াছে। যাহা হউক, সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই কীর্ত্তি কতদিন যে সজীব থাকিবে বলা দুঃসাধ্য।"[১]

মেঘনাদ-বধ কাব্যের শব্দ-সঙ্গীত ও ভাব-কল্পনা যে হেমচন্দ্র বুঝিতে পারেন নাই ভূমিকাটি দেখিবার পর সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। এই দীর্ঘ ভূমিকাটি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে মেঘনাদ-বধ কাব্যের কুণ্ঠিত-সংকুচিত প্রশস্তিসূচক মন্তব্যটি যুক্তি-বিশ্লেষণের অনিবার্য্য পরিণতি নয়। ভারতচন্দ্র-মধুসূদনের তুলনামূলক বিচারের পর ভূমিকা-লেখক অগত্যা মধুসূদনের প্রশংসা করিয়া ভূমিকা শেষ করিলেও উহা মধুসূদন অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের কবিশক্তির উৎকর্ষই ব্যঞ্জিত করিয়াছে। সুতরাং মধুসূদনের কাব্যেব রস-আত্মা ভূমিকা-লেখকের দৃষ্টির অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে এবং হেমচন্দ্র মধুসূদনের প্রশংসা করিতে গিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার নিন্দাই করিয়াছেন; মেঘনাদ-বধ কাব্যকে অভ্যর্থনা করিবার নাম করিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন। আবার সুকাব্য সম্পর্কে হেমচন্দ্রের ধারণা যে শব্দার্থ-সম্পর্কিত, কাব্যের বাহ্য দেহ-সৌকুমার্য্যের ঊর্দ্ধে আন্তর রস-সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই, 'ভালো লেখার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার সমসাময়িক

১। কবি হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ।

যুগ-মনোভাবের উর্দ্ধে উঠিয়া মেঘনাদ-বধের প্রসংসা করিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান অসঙ্গত ; তাঁহার কণ্ঠে যুগবিরোধী ধ্বনি ফোটে নাই। সুতরাং যে কাব্যাদর্শের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই, কাব্যে তাহার অনুসরণ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

তবে হেমচন্দ্র একটি মূল্যবান ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কালে সে ভবিষ্যদ্বাণী সফলও হইয়াছে। "কিন্তু ভবিষ্যতে কবির নাম যে ব্যাপক হইবে এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট মেঘনাদ-বধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" অবশ্য ইহার জন্য হেমচন্দ্রকে সে যুগে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল।[২] সুতরাং মেঘনাদ-বধ কাব্যকে সে যুগের জনসমাজ কিরূপ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদ-বধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি প্রকাশিত হইবার পর 'ক্যালকাটা রিভিউ'র মত পত্রিকায় যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"Babu Bangalal Ranerjee is one of the best Bengali writers of the day ;.........We are aware of the claims of Mr. M. M. S. Dutta, whom we remember to have been styled as the 'Milton of Bengal' * * * But he is such a tartar in the field of Bengali literature that he is bound by no laws and rules whatever, but deems himself superior to them. Such license may be allowable in superhuman geniuses like Goethe and Shakespeare ; but in a poetster like Mr. Dutta, is simply intolerable, Mr. Dutta is wild, irregular ; eccentric. Babu Rangalal is neat, elegant, and idiomatic."

মধুসূদন সম্পর্কে হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধারণা দেখিয়াছি, যুগ-ধারণা দেখিলাম। কবি নিজে ভারতচন্দ্রের জয়ঘোষণায় উন্মত্ত, যুগচিত্ত রঙ্গলালের কাব্য-সৌন্দর্য্যে অন্ধ। এইরূপ পরিবেশে হেমচন্দ্র যখন লেখনী ধারণ করিলেন

২। মেঘনাদ-বধ কাব্যের ভূমিকা লিখিবার ২৭ বছর পরে কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকা লিখিবার সময় হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়া অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম।"

তখন তাঁহার লেখনী কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

এখানে কবির অন্তর্লোকের আর দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হেমচন্দ্রের কবি-যশোলিপ্সা এবং নিজের কাব্য সম্পর্কে তাঁহার অদ্ভুত স্পর্শকাতরতা। বীরবাহুর ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, "অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি।" এই যশোলিপ্সার সহিত কাব্য সম্পর্কে তাঁহার স্পর্শকাতর মনও জড়িত হইয়া আছে। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারী উকিল অন্নদাবাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'হেমবাবু বলেন কি জান? Other people's poetry survives them, but I shall survive my poetry,' হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেমবাবু অস্থির হইয়া উঠিতেন। Dryden's Alexander's Feast হেমবাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে আছে। ঐ যে Third Number Poetical Reader-এ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন সুকবি) বলেন, 'হেমবাবুর poetry তো কেবল third number poetry দেখিতে পাই।' আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।" (পুরাতন প্রসঙ্গ)

যশোলিপ্সা ও স্পর্শকাতরতার জন্য হেমচন্দ্র মধুসূদনের পথ এড়াইয়া গিয়া রঙ্গলাল-প্রবর্ত্তিত সহজ কাব্য-পথে দেশাত্মবোধের উচ্ছ্বাসবহুল বাণী প্রচার করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার সমসাময়িক যুগের নিকট হইতে কবি-বিদায় স্বরূপ যে উপহাস-বিদ্রূপ পাইয়াছিলেন, নীলকণ্ঠের ন্যায় তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মনের সে সবলতা ছিল না। তাই মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের উত্তাপটুকু কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি বৃত্র-সংহার রচনা করিয়াছিলেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের যে অংশটুকু গ্রহণ করিলে যুগমনের নিকট হইতে বাহবা পাওয়া যাইবে, তিনি কেবল সেই বাহ্য কাব্য-কৌশলটুকু গ্রহণ করিলেন। ইহাই হইল বৃত্র-সংহার। ইহাতে মেঘনাদ-বধের উত্তাপ আছে, কিন্তু আদর্শ নাই; ইহা

মেঘনাদ-বধের যুগোপযোগী বাঙ্গালী সংস্করণ। সে যুগ এই কাব্য-কঙ্কালকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে।[৩] কিন্তু ইহা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। হেমচন্দ্র তাঁহার যুগের কাছে নিজের আসন উচ্চ করিতে গিয়া মধুসূদনকে প্রতারণা করিয়াছেন; মেঘনাদ-বধের কাব্যাদর্শকে অবমাননা করিয়াছেন। এই প্রতারণা-অবমাননার কু-চক্রজাল উনবিংশ শতক সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবি-প্রতিভার নিকটে স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের কবি-প্রতিভার মধ্যে একটা বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে—উভয়েরই কাব্যরচনার মূলে সৌন্দর্য্য অনুভব ও শিল্পপ্রেরণা অপেক্ষা জাতীয়তাবোধ প্রবল। উভয়েরই ও দেশপ্রীতি উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতার চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত, উভয়েই ভারতের অতীত-গৌরব রোমন্থন-পটু ও উচ্ছ্বাস-প্রবণ। উভয়েই বর্ণনাপ্রধান কবি; চরিত্রসৃষ্টি ও অনুভূতি-উদ্বোধনের অক্ষমতা যেমন রঙ্গলালের কাব্যে তেমনি হেমচন্দ্রের কাব্যে। উভয়ের কাব্যই গদ্যাত্মক, ভাষা উপমা-চিত্র বস্তুমূলক।

॥ ৩ ॥

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এতগুলি উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব সত্ত্বেও যে এই পর্ব্বকে বাংলা কাব্যের একটি গৌরবময় অধ্যায়রূপে গ্রহণ করা যায় না, তাহার আর একটি কারণ—এই যুগের সমাজ-মানসে এমন একটি ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সমাজ এমন উন্নত আদর্শমন্ত্রে উদ্বোধিত হয় নাই যে, কবির সমগ্র শক্তি সমাজ-কল্যাণ ও জাতীয়তাবোধের জয়গানে ব্যয়িত না হইয়া সার্থক সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে। অন্যান্য দেশে সাহিত্যের গৌরবযুগের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্র ও সমাজ সেই যুগের কবিদের এমন একটি শান্ত-নিস্তরঙ্গ পরিবেশ দান করিয়াছে যে সমাজের কোন অন্যায়-অনাচার, কোন কুশ্রী চারিত্র-দৈন্য, রাষ্ট্রের কোন

৩॥ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।" কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ হইতে তুলনায় অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত।" রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিয়াছেন, "এখনকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত।"

বিশৃঙ্খলা-অব্যবস্থা তাঁহাদের রস-সাধনায় ব্যাঘাত জন্মায় নাই। স্থায়ী রস-সাহিত্যসৃষ্টির জন্য এইরূপ একটি পরিবেশ-পটভূমি অপরিহার্য। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লব না থাকিলেও এমন একটি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড এই যুগের ভূমিকায় আছে যে তাহার বহ্নি-উত্তাপে এ যুগের কাব্যরসতরুর কোমল পত্রগুলি শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে অগ্নিদাহের রক্তিমদীপ্তি এ যুগের বাতাসকে উত্তপ্ত, আকাশকে রক্তবর্ণ করিয়াছে। সুতরাং এই যুগের কবিদের রসপ্রেরণাকে রাষ্ট্র ও সমাজ-গত এই প্রাথমিক সমস্যাগুলি অনেক পরিমাণে শোষণ করিয়া লইয়াছে। তাই স্বভাবতই সূক্ষ্ম রসালাপন অপেক্ষা স্থূলভ দেশাত্মবোধক বাণীপ্রচার ও সমাজের অনাচার-ব্যভিচারের উপর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতেই তাঁহাদের অধিক মনোযোগ দিতে হইয়াছে, মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ রসিক-চিত্তকে সন্তুষ্ট না করিয়া আদর্শভ্রষ্ট বৃহত্তর জনগণকে উদ্‌বোধিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং কালজয়ী রসসাহিত্যসৃষ্টি-ই যদি কাব্যের গৌরব-যুগের লক্ষণ হয় তাহা হইলে আলোচ্য যুগকে বাংলা সাহিত্যের গৌরবযুগ বলা ঠিক হইবে না। ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-বিহারীলাল-বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির কথা স্মরণ করিলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। তবে মধুসূদনের সম্পর্কে বলিতে পারি যে তাঁহার কাব্যকে তিনি এই স্থূল সমস্যার ছোঁয়াচ হইতে কিছু ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়া প্রহসন-গুলিকে সংঘাত-সমস্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মধ্যে সে-শক্তি আশা করা যায় না।

হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণীর নায়ক নরসখা নামক যুবকটি যে চিন্তাব্যাধিতে জর্জ্জর হইয়া বিশ্বসংসারের উপর উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল, সে-চিন্তা রোম্যাণ্টিক ভাববিলাসিতা নয়। জগৎ-সংসারের এক বীভৎস মূর্ত্তি তাহাকে পীড়িত করিতেছিল—

"ভেবেছি আমি হে সার নরক-সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার॥
সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান।
ভীষণ নরককুণ্ড কূপের সমান॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা কোপ অনিবার॥"

—সমাজের এই রূপ-ই নরসখাকে পীড়িত করিয়াছিল। ঠিক এই খেদ, এই করুণ আর্ত্তি ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ ও ভগবদ্বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেই পরিস্ফুট। ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে সমাজ-দেহে যে ভাঙন শুরু হইয়াছিল, হেমচন্দ্র পর্য্যন্তও তাহা সমানভাবে চলিয়াছে। ঠিক এই যুগপরিবেশে রসসমৃদ্ধ কাব্যসৃষ্টি সব কবির পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

চিন্তাতরঙ্গিণী কাব্যের ভাবগত সাদৃশ্যও যেমন ঈশ্বর গুপ্তের সমাজ ও পারমার্থিক কবিতাগুলির সহিত, তেমনি রূপগত সাদৃশ্যও ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের রচনা-রীতির সহিত। কাব্য হিসাবে চিন্তাতরঙ্গিণী অতি তুচ্ছ রচনা, ইহাতে কবির কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে নাই। বর্ণনা নীরস, ভাষা অমার্জ্জিত। তথাপি কবির প্রথম কাব্যখানিতে লক্ষ্য করিতে পারি যে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ও সমাজের আদর্শহীনতা কবিচিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির এই বেদনা-পীড়িত আত্মা যেন নরসখা-তে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়া সঙ্কীর্ণতার কারা-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া মরিয়াছে এবং এই নরসখা-ই যেন পরবর্ত্তী কাব্যে বীরবাহুতে মূর্ত্তিলাভ করিয়া কল্পিত পাঠান-রাজকে হত্যার আনন্দে বেদনার অবসান ঘটাইয়াছে।

বীরবাহু কাব্য হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় রচনা। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসবহুল বক্তৃতাগুলি-ই বোধ হয় কাব্যখানির একমাত্র বৈশিষ্ট্য। রঙ্গলালের ও হেমচন্দ্রের এই কাব্যগুলি দেখিয়া মনে করা যায় যে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ থাকিলেই সে যুগের পাঠক যে কোন কাব্যকেই মাথায় করিয়া লইয়াছে, কাব্যাংশে তাহা যতই নগণ্য হউক।

বীরবাহু কাব্যের কাহিনী কাল্পনিক। পাঠানরাজ আলমগীর কান্যকুব্জের যুবরাজ বীরবাহুকে পরাস্ত করিয়া কান্যকুব্জ অধিকার করে ও বীরবাহুপত্নী হেমলতাকে কারাগারে বন্দী করে। পরে বীরবাহু পাঠান-রাজকে দ্বৈতসমরে পরাজিত করিয়া হেমলতাকে উদ্ধার করে। এই নীতিকথার ন্যায় সহজ-সরল কাহিনীটিকে কবি নানা লৌকিক-অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বৈচিত্র্য ও জটিলতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবি-কল্পনার কৃত্রিমতাই কাহিনী-কঙ্কালে রক্তমাংস সংযোজন চেষ্টাকে হাস্যকর করিয়া তুলিয়াছে—বর্ণনায়, কল্পনায় কবি যতই স্বাভাবিক সুষমা আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন ততই তাহা কাগজের ফুলের মত অধিকতর কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের সূচনা রোমান্টিক প্রণয়-কাব্যের ন্যায়। সূচনাতেই নিসর্গের সূক্ষ্ম

বিস্তৃত বর্ণনায় এত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, নায়ক-নায়িকার স্মৃতি-কল্পনায় অতীত-ভবিষ্যতের প্রেম-চিত্রগুলি এত সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে মনে হয় কবি যেন রোম্যান্টিক প্রেম-কাব্যের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছেন। আখ্যায়িকা কাব্যে নিসর্গ বর্ণনায় এতখানি সূক্ষ্মতা, এবং বীরভাবপ্রধান জাতীয়-ভাবোদ্দীপক কাব্যে প্রেমের এরূপ বিস্তৃত মাদকতাপূর্ণ বর্ণনা দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে কবি এই জাতীয় কাব্যের প্রকৃতি ও রচনাদর্শ সম্পর্কে সচেতন নন্।

কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে ভারতের অতীত গৌরবের দীর্ঘ বর্ণনা-চিত্রগুলি কাব্যের সহজ-সরল গতিপ্রবাহে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। কখন এইরূপ একটি আবর্ত্তে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইতে হইবে এই চিন্তায় পাঠক সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকে। কাব্যের প্রধান চরিত্র বীরবাহু ইন্দ্র-রঘু-রাম-পার্থ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের বীরত্ব-আদর্শ স্মরণ করিয়া বীরব্রত উদ্‌যাপনে উৎসাহিত হইয়াছে। নায়কের পক্ষে এইরূপ পুনঃপুনঃ স্মৃতি-রোমন্থন করায় সন্দেহ হয় যে নায়কের বীরত্ব-আদর্শ তাহার নিজের চরিত্রের উৎস হইতে উৎসারিত নয়। এই সন্দেহ দৃঢ় হয় যখন বীরবাহু অতি সহজেই যবন-সৈন্য-তরঙ্গের বন্যায় তৃণখণ্ডটির মত ভাসিয়া যায়। যবনের সহিত বীরবাহুর যুদ্ধের মধ্যে কোন প্রকার আবেগ-উন্মাদনা সৃষ্ট হয় না। বীরবাহুর পরাজয়, কান্যকুব্জপতির চিতানলে আত্ম-বিসর্জ্জন, যবন কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকার এবং বীরবাহু-পত্নী হেমলতাকে দিল্লী আনয়ন—এতগুলি ঘটনা এত দ্রুত ও এত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে যে ইহার প্রস্তুতির জন্য বীরবাহুর বীরত্ব-আস্ফালন, প্রাচীন ভারতীয় বীর-পুঙ্গবদের বীরত্ব-স্মৃতি-স্মরণ অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহার পর যবন-কারাগারে হেমলতার বিলাপের অতি-পল্লবিত বর্ণনা কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুকে ভিন্নপথে চালনা করিয়াছে এবং ওষ্ঠাধরে বিষপাত্র রাখিয়া হেমলতার যে অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত কাব্যিক বিলাপ, তাহা করুণ-রসের পরিবর্ত্তে হাস্য-রসেরই উদ্রেক করে—

"যে রক্ত-মাংসের তরে অবলা আনিলি ঘরে
এবে তার সবাকার দেখি ভয়ে পালাবি॥
চক্ষু, কর্ণ, নাসা আর সর্ব্বাঙ্গ হইবে ছার
খানকতক সাদা সাদা হাড় শুধু দেখিবি ;

সেই নেত্র নীলোৎপল সে অধর বিম্বফল
সেই নাসা সেই কর্ণ সে বদন বিমল।
সেই পীন পয়োধর, সেই নিতম্বের ভর
সেই মৃদু বাহুলতা করতল কোমল॥
জিনিয়া সরসীর সর সেই যে মাংসের থর
সেই চারু রূপচ্ছটা শশধর-গঞ্জনা।"

পাঠান-রাজ হেমলতার মৃতদেহ দেখিয়া কিরূপ বিস্মিত হইবে নিজ দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গের রূপবর্ণনা করিয়া হেমলতা যখন তাহার বিবরণ দিতেছে, তখন তাহার মানস-অবস্থার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। হেমলতা তখন যবন-কারাগারে, স্বামী বীরবাহু পরাজিত ও পলায়িত, সম্মুখে পানপাত্রে বিষ।

হেমলতার বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে—কাব্যের প্রথম অংশ সমাপ্ত। ইহার পর কাব্যের উত্তরাংশে কবি আখ্যায়িকা-কাব্যের ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া কাব্যমধ্যে বহু অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই পর্ব্বের কাহিনীর মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা ও বাস্তব-অবাস্তবের সীমা রক্ষিত হয় নাই। সুতরাং তাহার আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই।

কাব্যখানিতে রঙ্গলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের লিপিচাতুর্য্য অনুসরণ করিবার চেষ্টাও দেখা যায়। এই কাব্যের যদিও কোনপ্রকার সাহিত্যিক মূল্য থাকিত, তাহা হইলে এই প্রভাব-বিচারের কিছু সার্থকতা ছিল; কিন্তু সে প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

তবে বীরবাহুর দেশপ্রেম এ-যুগে যতই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ও আবেগপ্রবণ বলিয়া মনে হউক, সেই যুগে এই দেশপ্রেম-ই জনচিত্তের কাছে কাব্যখানিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বীরবাহুর উচ্ছ্বাসবহুল বক্তৃতায় সেই যুগের দেশপ্রেমের আবেগ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—

"মাগো ওমা জন্মভূমি!
আরো কত কাল তুমি
এ বয়সে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে।

পাষাণ যবনদল
বল আর কত কাল
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥
কতই ঘুমাবে মা গো
জাগো মা জাগো
কেঁদে সারা হয় দেখ কন্যাপুত্র সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়
একবার কোলে কর, ডাকি মা মা ব'লে ॥
কাহার জননী হ'য়ে
কারে আছ কোলে ল'য়ে
স্বীয় সুতে ঠেলে ফেলে কার সুতে পালিছ ॥"

ইহা ছাড়া বীরবাহু কাব্যের অন্য কোন মূল্য নাই। মেঘনাদ-বধ কাব্যের পূর্ব্বে আছে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—সে কাব্য মেঘনাদ-বধের প্রস্তুতি; অরুণোদয়ের পূর্ব্বে যেন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আলো-আঁধারি। বৃত্র-সংহার কাব্যের পূর্ব্বসূচনা হিসাবে কিন্তু চিন্তা-তরঙ্গিণী ও বীরবাহু কাব্যকে নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র রীতির কাব্য, তাই বীরবাহু কাব্যের কবি-ই যে বৃত্র-সংহার কাব্যের কবি—সে-কথা পূর্ব্বে জানা না থাকিলে উভয় কাব্যের রচনা-রীতি দেখিয়া কাহারও সেরূপ ধারণা হইবার কথা নয়। আবার বৃত্র-সংহারের পরবর্ত্তী রচনা আশাকানন, ছায়াময়ী, চিত্ত-বিকাশ—ইহার সহিত চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্যের নাড়ী-সম্পর্ক স্পষ্টত ধরা পড়ে। বৃত্রসংহার-কে তাই হেমচন্দ্রের মূল কাব্যধারায় প্রক্ষেপ বলিতে হইবে। কবি যে তাঁহার প্রতিভার নিজস্ব ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অপরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া আসিয়াছেন, হেমচন্দ্রের সমস্ত রচনার সহিত বৃত্র-সংহার কাব্য পাঠ করিবার পর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

চিন্তা-তরঙ্গিণী (১৮৬১) ও বীরবাহু-র (১৮৬৪) পর হেমচন্দ্রের কাব্যের কালানুক্রম অনুযায়ী বৃত্র-সংহার প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রধানত এডুকেশন্ গেজেট্ ও বঙ্গদর্শনে বিবিধ বিষয়ক কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। এইরূপ বত্রিশটি খণ্ড কবিতা ছাড়া এই সময় তিনি সেক্স্পীয়ারের টেম্পেস্ট নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন (১৮৬৮)। হেমচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য কাব্য বৃত্র-সংহার প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। হেমচন্দ্রের খণ্ড

কবিতা সংখ্যায় প্রচুর। এই প্রবন্ধে গৌণভাবে আলোচনা করিলে সেগুলির প্রতি সুবিচার করা হইবে না। হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার ব্যাপক আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন।

॥ ৪ ॥

বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিপতাকা। মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের ক্লাসিক কল্পনার সিংহদ্বার যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, এই কাব্যের বজ্র-গম্ভীর ও ললিতমধুর শব্দমন্ত্র এবং উদাত্ত সঙ্গীতধর্ম্ম যাহাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই, তাহারা বৃত্র-সংহারের বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়াছে। বৃত্র-সংহার যেন মেঘনাদ-বধ কাব্যের শিশু সংস্করণ। তাই রস ও রুচি যাহাদের খুব সূক্ষ্ম নয়, তেমন রসিকেরাই বৃত্র-সংহারের ন্যায় কৃত্রিম আড়ষ্ট কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে বৃত্র-সংহার কাব্যের একটি ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করা যাইত, কিন্তু মেঘনাদ-বধ কাব্যের রস-মন্দাকিনীতে একবার অবগাহনের পর আর কেহ বৃত্র-সংহারের পল্বলে অবগাহন করিতে চাহিবে না।

মহাদেবের বর লাভ করিয়া বৃত্রাসুর ত্রিভুবনে অজেয় হইয়া উঠিল, দেবগণ বৃত্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পাতালে আশ্রয় লইলেন, বৃত্রাসুর স্বর্গ অধিকার করিল। এইখানে কাব্যের সূচনা। বহু সমালোচক মেঘনাদ-বধ অপেক্ষা বৃত্র-সংহার কাব্যের পরিকল্পনার বিশালতা লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃত্র-সংহার কাব্য প্রকৃতই বিশাল, তবে পরিকল্পনায় নয়, আকারে। মধুসূদন ভাবকে সংহত করিতে পারেন, তাই মেঘনাদ-বধ কাব্য আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু নীরন্ধ্র। হেমচন্দ্র ভাবকে বাষ্পের ন্যায় বিস্তৃত করেন, তাই বৃত্র-সংহার আকারে বৃহৎ। ক্লাসিক কবির ভাব-নির্য্যাস প্রস্তরের ন্যায় শক্ত ও কঠিন। সেই প্রস্তর-কঠিন ভাব-নির্য্যাসে নির্ম্মিত হয় ক্লাসিক কাব্যের ইমারৎ। রোম্যাণ্টিক কবির ভাব নীহারিকার ন্যায় তরল ও দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত। রোম্যাণ্টিক কবি ইমারৎ নির্ম্মাণ করেন না, পরিবেশ আবহ সৃষ্টি করেন। হেমচন্দ্র রোম্যাণ্টিক কবির ন্যায় স্থূল ভাবালুতা ও দুর্ব্বল অনুভূতিকে স্থান দিয়াছেন, তাই কাব্য আকারে

বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে ; ইহাকে পরিকল্পনার বিশালতা বলা যায় না। ক্লাসিক কাব্যের নীরন্ধ্র বস্তু-বিন্যাস ও বলিষ্ঠ ভাব-কল্পনার মধ্যে এই অনিয়ন্ত্রিত-উচ্ছ্বসিত ভাবালুতা বিশেষ অপকর্ষের কারণ হইয়াছে। তবে কবি যখন স্বেচ্ছায় কাব্যমধ্যে ইহার অবতারণা করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে যে কবি ক্লাসিক কাব্যাদর্শের নিয়ন্ত্রণ গ্রাহ্য করেন নাই।

মধুসূদন অত্যন্ত কৌশলে বীরভাবপ্রধান বস্তুমূলক মহাকাব্যের মধ্যে এক অন্তর্গূঢ় করুণ-রসের প্রস্রবণের উৎসমুখ অনাবৃত করিয়া দিয়া কাব্যের বস্তু-কাঠিন্যকে হৃদয়বেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুপ্রধান ঘটনা ও বীর-রসপ্রধান যুদ্ধায়োজনের ভূমিকায় এমন এক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছেন যে কাব্যের বস্তুনীরসতা মানবিক রসে জারিত হইয়া সহজেই রসিকের হৃদয়তীর্থে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই ভাবপ্রবাহকে এমন বিশুদ্ধ উপায়ে সংহত ও সংযত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে তাহা কাব্যের ক্লাসিক পরিবেশের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত হইতে পারিয়াছে। ঘটনাড়ম্বর ও বস্তুসমারোহ যে উচ্চগ্রামে তোলা হইয়াছে ভাব-অনুভূতিকে ঠিক সেই একই স্বর-পর্য্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যের বস্তুনীরসতা পরিহার করিবার জন্য স্বতন্ত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ঘটনাপ্রধান আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে রোম্যান্টিক সুরের অবতারণা করিয়াছেন। লৌকিক প্রেম-শোক-হর্ষ হৃদয়-ভাবের দ্বারা কাব্যের বস্তুকাঠিন্যকে দ্রবীভূত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের মূল পরিবেশ ও গতিপ্রবাহের সহিত একই ছন্দে অন্বিত না হইয়া তাহা কাব্যের দুইটি স্বতন্ত্র অংশরূপে খণ্ডিত হইয়া আছে। হৃদয়-উত্তাপে বস্তুকাঠিন্য বিগলিত হইয়া অনুভব-গ্রাহ্য হইতে পারে নাই। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে একটি সর্গের ঘটনা-বর্ণনা পরবর্ত্তী সর্গের ভাব-বর্ণনার দ্বারা কাব্যখানিতে মানবিক রস সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ওই দুইটি স্বতন্ত্র ধারা মেঘনাদ-বধ কাব্যের ন্যায় একত্র মিলিত হইতে পারে নাই, শেষ পর্য্যন্ত সমান্তরাল রহিয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া কাব্যের ঘটনাবিন্যাস ও কাহিনী পরিকল্পনার পশ্চাতে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট হৃদয়ভাবের ভূমিকা না থাকায় সামগ্রিকভাবে কাব্যখানি রসিকের কাছে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বৃত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের সমাপ্তি। সমস্ত আয়োজন-সমারোহ বৃত্রের পতনের ন্যায় একটি স্থূল ঘটনার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। রাবণের শোকাভিভূত পিতৃহৃদয়ের হাহাকারের মধ্য হইতে যেমন মানবজীবনের অকিঞ্চিৎকরতা,

মানবশক্তির মূল্যহীনতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, বৃত্রের পতন পাঠক-মনে তেমন কোন ভাবের উদ্বোধন করিতে পারে নাই। কাব্যখানি তাই একটি অখণ্ড হৃদয়-ভাবের অভাবে একান্তই কাহিনীমূলক ও বস্তুপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। নদী যেমন নানা শাখাপথে মহাসিন্ধুতে বিরামলাভ করিয়া সার্থকতামণ্ডিত হয়, মহাকাব্য বা আখ্যায়িকা কাব্যের ঘটনাও তেমনি নানা শাখাপ্রবাহে এক অখণ্ড ভাবসিন্ধুতে পতিত হইয়া চাঞ্চল্যের অবসান ঘটায়। বৃত্র-সংহার কাব্যের সেরূপ অখণ্ড কোন ভাব-ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাহিনী কেবল নদীর মত দীর্ঘ হইয়া বহিয়া গিয়া বৃত্র-সংহারের ন্যায় একটি স্থূল পরিণতির মোহানা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার তুলনায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের কাহিনী হ্রদের ন্যায় বলয়াকৃতি। বৃত্র-সংহারের কাহিনী নদীপ্রবাহের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি—এইজন্য প্রথমটির পরিকল্পনা ক্ষুদ্র আর দ্বিতীয়টির পরিকল্পনা বৃহৎ বলিয়া অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন।

কবি-চিত্তের সহানুভূতি পাইয়া রাবণ মেঘনাদ স্বর্ণলঙ্কা ও রক্ষকুল এক অনির্ব্বচনীয় মহিমা-গৌরব লাভ করিয়াছে। রাবণের শক্তি, রক্ষসেনার তেজোব্যঞ্জক গৌরবদীপ্তি, স্বর্ণালঙ্কার দিব্যৈশ্বর্য্যছটা সমস্ত কিছু মিলিত হইয়া পাঠকের সম্মুখে প্রাণশক্তিতে উচ্ছল এক স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করে। কিন্তু বৃত্র-সংহার কাব্যে হেমচন্দ্রের সহানুভূতি কোন্ দিকে তাহা সহজে বুঝিয়া ওঠা শক্ত। কবির সহানুভূতি কখন বৃত্রাসুরের দিকে, কখন দেব-কুলের দিকে ঝুঁকিয়া পাঠকের মনকে একটা উৎকণ্ঠিত সংশয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। কাব্যে বৃত্র ও অসুর-কুল, ইন্দ্র ও দেব-কুল প্রায় সমান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৃত্র-নিধনেই যখন কাব্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে বৃত্রাসুরের পতনচিত্রই কবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় এবং ইহার উপযোগী সমস্ত আয়োজন-চেষ্টা কাব্যের নেপথ্যলোকের বিষয়। কিন্তু বৃত্র অথবা অসুরকুলের প্রতি কবির সহানুভূতির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। একমাত্র আখ্যানাংশের জন্য ছাড়া অন্য কোন্ কারণে বৃত্রাসুরের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে তাহা বোঝা শক্ত। মেঘনাদ-বধ কাব্যে রক্ষকুল দুইটি গূঢ় উদ্দেশ্যে কবি-চিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রথম কারণ, রাবণ চরিত হইতে ট্রাজিক-রস উৎসারণ। দ্বিতীয় কারণ, মেঘনাদ ও রক্ষকুলের আশ্রয়ে দেশব্রত উদ্‌যাপনের উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা। বৃত্র-চরিত্রের পতনে যে ট্রাজিক-রস সৃষ্ট হয় নাই, যে পতন যে আমাদের ভাবলোকে কোনরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, তাহা সাধারণ

পাঠকও স্বীকার করিবেন। রুদ্রপীড়-চরিত্রেও দেশব্রতের কোন আদর্শই যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সেরূপ কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে যে কবির লক্ষ্য ছিল না তাহা কাব্যখানি সাধারণভাবে পাঠ করিলেও বোঝা যায়। তাহা ছাড়া এই ব্যাপারে মধুসূদনের সহিত হেমচন্দ্রের আরও একটা গুরুতর পার্থক্য লক্ষ্য করিতে হইবে। হিন্দু সংস্কার ও বিশ্বাসে রক্ষকুল ও অসুরকুল—উভয়েই অধর্ম্মাচারী। তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি দেখানো, অথবা তাহাদের চরিত্রের আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করা ভারতীয় সংস্কারের পরিপন্থী। রাক্ষস ও অসুর শক্তি সংসারের সর্ব্ব অমঙ্গলকর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া ভারতীয় সংস্কারে ধিক্কৃত হইয়াছে এবং এই দানব ও অসুর-শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়াই আবহমান কাল হইতে ধর্ম্ম ও মঙ্গলের জয়ধ্বজা উড়ানো হইয়াছে। মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম এই প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। কবি-চিত্তের সমস্ত সহানুভূতি-কোমলতা নিষ্কাশন করিয়া তিনি রাবণ মেঘনাদ স্বর্ণলঙ্কা ও রক্ষকুলের অন্যান্য চরিত্রকে এমনভাবে চিত্রিত করিলেন যে ঔজ্জ্বল্যে-দ্যুতিতে-ঐশ্বর্য্যে-দীপ্তিতে, শক্তি-বীর্য্যে রাবণ-মেঘনাদকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা প্রচলিত সংস্কার ও অভ্যস্ত বিশ্বাসের ঊর্দ্ধে উঠিয়া রাবণ-মেঘনাদের দুঃখে দুঃখানুভব করি। তাই বৃত্র-রুদ্রপীড়ের মধ্য হইতে যদি কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে এই অসুর-শক্তিকে দেব-শক্তির সমান মর্য্যাদা দান করিতে হইবে। কিন্তু হেমচন্দ্র অপরিশুদ্ধ আসুর-শক্তিকেই কাব্যে প্রাধান্য দিয়াছেন; তাই অসুরের পতন ও দেবকুলের জয়—ইহা একটা অতি সাধারণ নীতিকথামূলক কাহিনীরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যের সূচনায়-ই দেখি স্বর্ণলঙ্কার উচ্চ স্বর্ণচূড়াগ্রভাগ অস্তগামী গৌরব-সূর্য্যের আভায় বিষণ্ণ, পাণ্ডুর, আর স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণ এক অপরূপ অধ্যাত্ম-প্রভায় দীপ্ত। স্বর্ণলঙ্কার এই রূপের কাছে, রাবণের এই বিষাদ-গম্ভীর মূর্ত্তির কাছে আপনা হইতে যেন মাথা নত হইয়া আসে। এই উপযুক্ত ভূমিকায় কবি যখন কাব্য আরম্ভ করেন তখন পাঠক প্রথমেই ভুলিয়া যায় রাবণ রাক্ষস-প্রতিনিধি। বৃত্র-সংহারের সূচনা হইতে কিন্তু বৃত্রের আসুর-শক্তিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাই মেঘনাদ-বধ কাব্যকে শুরু হইতে যে উচ্চ সুরগ্রামে বাঁধা হইয়াছে তাহা কাব্যের রস-পরিণামের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে এবং বৃত্র-সংহারের হেমচন্দ্র শুরুতেই কাব্যকে যে নীচু সুরে বাঁধিয়াছেন বহু চেষ্টায়ও কাব্যকে সেই নিম্ন সুরগ্রাম হইতে উচ্চে উন্নীত করিতে পারেন নাই। দুই কাব্যের এই মূলগত পার্থক্য।

কাব্যের মধ্যে প্রকৃত বিরোধের চিত্র কোথায়ও ফুটিয়া ওঠে নাই। দেবগণ পাতালে বসিয়া অজগরের ন্যায় গর্জ্জন করিয়াছে এবং বৃত্র-ঐন্দ্রিলা স্বর্গে অসুরের আচরণ করিয়াছে। এই দুই পক্ষের বিরোধ নিতান্ত আবেগহীন ও যান্ত্রিকভাবে এক পক্ষের পতনের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে রাম-রাবণের বিরোধের জন্য মেঘনাদের ন্যায় উজ্জ্বল তারকা নভঃচ্যুত হইয়াছে, মেঘনাদের মৃত্যুতেই এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু বৃত্র-সংহার কাব্যে সেই চরম বিরোধের চিত্র নাই। এই কাব্যের দধীচি মুনির আত্মত্যাগের ঘটনাকে প্রাচীন সমালোচকেরা বিশেষরূপে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়াছেন যে এইরূপ পরহিতার্থে আত্মদানের আদর্শ যে-কাব্যের কথা-বস্তুতে রহিয়াছে তাহাই প্রকৃত মহাকাব্য। অনেকের ধারণা মেঘনাদের মৃত্যুও এই আত্মত্যাগের কাছে নিষ্প্রভ। কিন্তু দধীচির আত্মত্যাগ এ-কাব্যের নেপথ্য ঘটনা এবং সে ঘটনাটি এমন আবেগ-উত্তাপহীন যে মনে হয় মুনিবর যেন দেব-স্বার্থে আত্মোৎসর্গের জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ইন্দ্রের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরী হইয়া ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন। সুতরাং তাহার আত্মত্যাগে যত মহত্ত্বই থাক, কাব্যে তাহা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে এবং মূল আখ্যানাংশের সহিত তাহা তির্য্যক্‌ভাবে অতি ক্ষীণ সূত্রে বিধৃত হইয়াছে মাত্র। আবার যে উদ্দেশ্যের জন্য দধীচি মুনির অস্থির প্রয়োজন হইয়াছে, যে উদ্দেশ্যের জন্য ইন্দ্র একবার কুমেরু-শিখরে একবার কৈলাসে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ন্যায় বিমর্ষ-করুণমুখে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কাব্যে সেই উদ্দেশ্যকে এত দুর্ব্বল ও শক্তিহীন করিয়া দেখানো হইয়াছে যে পরিশেষে এই সাধারণ ব্যাপারের জন্য এইরূপ আড়ম্বর-সমারোহ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার ন্যায়ই হাস্যকর মনে হইয়াছে।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনার দরকার। মেঘনাদ-বধ কাব্যে মধুসূদন রাবণের পতনকে সম্ভব করিবার জন্য তাঁহার কল্পনাকে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-বিহারী করিয়াছেন। কিন্তু সে কাব্যে এই আয়োজন-সমারোহ হাস্যকর ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই, কারণ রাবণের মধ্যে মধুসূদন নিসর্গ-শক্তির গৌরব-মহিমা আরোপ করিয়া তাহাকে অজেয়-অবধ্য রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার চরিত্রের এমন ক্ষুদ্র গোপন রন্ধ্রপথও কবি উন্মুক্ত রাখেন নাই যে অলক্ষ্য গোপন পথে শনি প্রবেশ করিয়া তাহার পতনকে সম্ভব করিতে পারে। সীতা-হরণকে রাবণ তাহার পতনের প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া স্বীকার করে না, হয়ত কবিও করেন না। রাবণ তাহার পতনের জন্য বিধিকে

দায়ী করিয়াছে। যে চরিত্রের পতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা যায় না, যে পতনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বাস্তব-সীমা লঙ্ঘন করিয়া অলৌকিক বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সে পতনকে সম্ভব করিবার জন্য ত্রিভুবন চঞ্চল হইয়া উঠিলেও বিসদৃশ বোধ হয় না। কিন্তু যে দুর্ব্বল ভীরু দীপশিখা মুহূর্ত্তের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইতে পারে তাহার নির্ব্বাণের জন্য যদি প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে তাহা হাস্য-রসেরই উদ্রেক করে। রাবণের তুলনায় বৃত্রাসুর ভীরু দীপশিখা ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃত্র যে মহাদেবের বরে অজেয়-অবধ্য, কবি এই সংবাদটি পাঠককে জানাইয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু মহাদেবের আশীর্ব্বাদটির উপর এতখানি দায়িত্ব চাপাইয়া কবির পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা ঠিক হয় নাই। মহাদেবের বর এ যুগের পাঠকের কাছে একটা প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। হেমচন্দ্র কেবলমাত্র এই প্রতীকের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। তিনি বৃত্রকে মহাদেবের দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান করিয়া দেখিয়াছেন, বৃত্রের নিজস্ব শক্তি দেখিতে পান নাই। রাবণও মহাদেবের আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট; কিন্তু মেঘনাদ-বধের পাঠক সেকথা ভুলিয়া যায়। মেঘনাদ-বধে রাবণ নিজ প্রভায় উজ্জ্বল। হেমচন্দ্র বৃত্রের নিজের জন্য যে আয়োজন-ভূমিকার আড়ম্বর দেখাইয়াছেন তাহা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বৃত্রকে রাবণের ন্যায় শক্তিশালী ও বীর্য্যবান করিয়া তুলিবার প্রয়োজন ছিল। তাহার পতনের সহজ স্পষ্ট রন্ধ্রপথগুলিও বন্ধ করিয়া অলৌকিক বিধির সাহায্যে তাহার পতনকে সম্ভব করা উচিত ছিল। কিন্তু এই কাব্যে বৃত্র-ঐন্দ্রিলা তাহাদের পাপাচরণে এমন দুর্ব্বল ও শক্তিহীনরূপে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে যে দেবগণকে পরাজিত করিবার শক্তি দূরে থাক, একটি সাধারণ মানুষের অঙ্গুলি-তাড়না সহ্য করিবার শক্তি তাহাদের আছে কিনা তাহাতে সংশয় জাগে। সুতরাং হেমচন্দ্র অতি কৃত্রিম উপায়ে বৃত্রকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। বৃত্রের শক্তি তাহার নিজের শক্তি নয়, কবির দেওয়া শক্তি। সে-শক্তি কেবল মৌখিক আস্ফালনেই নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বীরহৃদয়ের বলিষ্ঠতার আভাস পাওয়া যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ঐন্দ্রিলা দেবশূন্য স্বর্গে অধীশ্বরী হইয়াও তৃপ্তি পায় নাই। তাহার জয়গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সে ইন্দ্রপত্নী শচীকে দাসী নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছে। বৃত্র নৈমিষারণ্য হইতে শচী অপহরণ করিবার আদেশ দিয়া এই দর্পিতা নারীর

ঐশ্বর্য্য-রূপ গর্ব্বে ঘৃতাহুতি দিয়াছে এবং ইহাই তাহার পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। এই আচরণে বৃত্রের আসুর-শক্তি প্রকাশিত হইয়া সাধারণ ন্যায়-ধর্ম্মের আদর্শ হইতে তাহার আচরণকে স্বতন্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছে। ঐন্দ্রিলার মধ্যে এই পাপ-কল্পনা passive, বৃত্রের সহায়তায় ও ক্ষমতায় তাহা কার্য্যকরী হইয়াছে। এই কাব্যে এই ঘটনাকেই বৃত্রের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু শচী স্বর্গে আনীত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তো দেবগণ বৃত্র-নিধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। শচী-উদ্ধারের জন্যই যে দেবগণ স্বর্গ-আক্রমণ করিয়াছিলেন, এ কথা মনে করা যায় না। (শচী-অপহরণ-সংবাদে মহাদেবের কাছে ইন্দ্রের আবেদন সহজেই অনুমোদন লাভ করিয়াছে; অন্য উপায়ে যে তাহা হইত না, সে কথা মনে করি না।) তাহা হইলে শচী-অপহরণের পাপকর্ম্মকে বৃত্রের একমাত্র পাপকর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহাকে একটি ব্যাপক পাপকর্ম্মের পরিশিষ্টরূপে দেখিতে হইবে। সে পাপকর্ম্ম কি? হয়ত দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়ন। কিন্তু ইহাকে একটি বৃহৎ পাপকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবার মধ্যে কি কোন যুক্তি আছে? শক্তি-বীর্য্যের পরীক্ষায় যদি কেহ দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করে, তাহা হইলে সেই অমিত শক্তিতেজকে অভিনন্দিত না করিয়া তাহাকে পাপকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব কেন? কিন্তু হেমচন্দ্র করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র সূচনা হইতেই দেবগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। সাধারণ হিন্দু sentiment দিয়া দেব ও অসুর শক্তির পার্থক্যে তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেবগণকে নেপথ্যে রাখিয়া অসুরগণকে প্রত্যক্ষ কাব্য-ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন কেন? যদি প্রচলিত বিশ্বাসকেই জয়যুক্ত করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে মধুসূদনের কাব্য-পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? ভিন্ন কোন আদর্শ গ্রহণ করাই তাঁহার উচিত ছিল। তাই স্পষ্ট বলিতে হয়, হেমচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যের মর্ম্মসত্য উপলব্ধি না করিয়া একবার তাঁহার কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন, আর একবার মেঘনাদ-বধ কাব্যের আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া কাব্যে সেই আদর্শ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর এক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বৃত্র-সংহার কাব্যের সাধারণ আলোচনা শেষ করিয়া বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করিব। সে বিষয়টি এই—হেমচন্দ্র মধুসূদনের আদর্শানুযায়ী যে ভাবে কাহিনী পরিকল্পনা ও চরিত্র-চিত্রণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার কবি-শক্তির ঠিক উপযোগী হয় নাই। হেমচন্দ্রের

প্রতিভা মহাকাব্য রচনার উপযুক্ত নয়, খণ্ড কবিতার রচনার অনুকূল। মহাকাব্য রচনায় কবির মন যদি যথার্থই ক্লাসিক আদর্শে গঁড়া হয়, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া বা অপরের আদর্শ অনুসরণ করিয়া কখনই এই শ্রেণীর কাব্যে স্বাভাবিকতা ফুটাইয়া তোলা যায় না। হেমচন্দ্র যখন খণ্ড কবিতাগুলি লিখিয়াছেন তখন প্রকাশের স্বচ্ছতা, ভাবের গাঢ়বদ্ধতা দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁহার কবি-প্রতিভার উপযুক্ত বাহন তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। মধুসূদনের কবিমন যথার্থই ক্লাসিকধর্ম্মী; তাঁহার ক্লাসিক কবি-মানস অতি ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বিষয়ের উপর কবিতা রচনাকালেও ভাষা ও উপমার রাজৈশ্বর্য্যকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই বীর জীবনের উজ্জ্বল বিকাশ দেখাইতে, উদাত্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশসৃষ্টিতে, বর্ণোজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনের উপযোগী ধ্বনি-গম্ভীর ভাষা ও ছন্দোসঙ্গীত তাঁহাকে স্বতন্ত্র চেষ্টায় আয়ত্ত করিতে হয় নাই। পার্ব্বত্য-ঝরনা যেমন স্রোতোবেগের মধ্যে সহজেই উপলখণ্ড বহিয়া আনে, কবির প্রগাঢ় অনুভূতিও তেমনি প্রকাশের পথে স্বাভাবিক ভাবেই ভাষা ও ছন্দোগৌরব সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। মেঘনাদ-বধের ভাষা-ছন্দঃ যদি কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার পথে প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে মেঘনাদ-বধ-এর সঙ্গীত কখনও হৃদয়গ্রাহী হইত না। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীর কাছেও যদি মেঘনাদ-বধ-এর শ্লোক আবৃত্তি করা যায় এবং সেই বিদেশীর যদি সুরবোধ থাকে, তাহা হইলে তিনি মেঘনাদ-বধের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন। Milton-এর Paradise Lost-এর মত নীরস, দুর্ব্বোধ্য ও দুরূহ কাব্য জগতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর যত সংখ্যক লোক এই কাব্যের প্রশংসা করেন, তাহার এক-চতুর্থাংশ লোক এই কাব্য পাঠ করেন। তথাপি এই কাব্যের যে কালজয়ী খ্যাতি, তাহা মনে হয় ইহার গম্ভীর সঙ্গীত ধর্ম্মের জন্য। ভাষা ও অর্থের অতীত যে এক অনির্ব্বচনীয় উদাত্ত সুর এই কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই কাব্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। সঙ্গীতে ভাব ও অর্থ গৌণ, সুর-ই প্রধান। কাব্যে ভাব, অর্থ ও সুরের ত্রিবেণী সঙ্গম। তথাপি ভাব ও অর্থকে বাদ দিলে মেঘনাদ-বধের সঙ্গীতাংশেরও এমন একটি মহিমা আছে যাহা সাধারণকে মুগ্ধ করিবে। এই সঙ্গীত-সৃষ্টি কৃত্রিম শব্দ-ধ্বনি দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। হেমচন্দ্র যেন কৃত্রিম উপায়ে মধুসূদনের সঙ্গীতের অনুকরণ করিয়াছেন। যে কবি-মানস হইতে মেঘনাদ-বধের সঙ্গীতের উৎপত্তি হেমচন্দ্রের কবি-মানস তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই তাঁহার বর্ণনা নীরস, শব্দপ্রয়োগ গদ্যাত্মক এবং পদবিন্যাস জটিল। মধুসূদন এত দুরূহ-অপ্রচলিত-

আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তথাপি তাহা অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মায় নাই। তাঁহার প্রত্যেকটি উপমা-চিত্র পাঠকের মানস-লোকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে। কিন্তু হেমচন্দ্রের উপমা-চিত্রগুলি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত ও জটিল, তাহা ভাবকে স্পষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশ করে না—প্রেরণার কৃত্রিমতাই ইহার কারণ। মধুসূদনের উপমা-চিত্রগুলি সংহত, অর্থ-গূঢ় ও ব্যঞ্জনাধর্ম্মী। হেমচন্দ্রের উপমা-চিত্রগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, আড়ম্বর-প্রধান ও বস্তুমূলক।

কবির প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত্ত কি না তাহার বিচারের শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর উপমা-চিত্র ও সঙ্গীত। ধ্বনিগম্ভীর শব্দপ্রয়োগে কবি পাঠককে বিভ্রান্ত করিতে পারেন, কিন্তু কেবল ধ্বনিগম্ভীর শব্দসমাবেশে উদাত্ত সঙ্গীত সৃষ্ট হইতে পারে না, এই শব্দ-সম্ভারের সুভগবিন্যাসেই সার্থক সঙ্গীত-সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। উপমা-চিত্রগুলিও সেইরূপ। সহজ বর্ণনায় কবি তাঁহার প্রেরণার কৃত্রিমতা ঢাকিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু উপমা-চিত্রে কৃত্রিমতা ঢাকা থাকে না। মধুসূদনের উপমা-চিত্রগুলির পার্শ্বে হেমচন্দ্রের উপমা-চিত্রগুলিকে দাঁড় করাইলে ইহাদের মৌলিক প্রেরণাগত পার্থক্যটি ধরা পড়িবে।

॥ ৫ ॥

এইবার বৃত্র-সংহার কাব্যের আখ্যান-পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইবে। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পরাজিত দেবগণের পাতালপুরীতে গুপ্ত-মন্ত্রণার বর্ণনা দিয়া কাব্যের সূচনা। দ্যুতিহীন, দীপ্তিহীন দেবগণের ক্ষুব্ধ-বিমর্ষভাব কবি সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিবিড় ধূমান্ধ পাতালপুরীর সংযত ও স্পষ্ট চিত্রাঙ্কনেও কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

"বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
রাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত নিশিতে
কুজ্ঝটিমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,

পাণ্ডুবর্ণ সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তন্ুঃ—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে।"

দেবগণের দীপ্তিহীন ম্লান মূর্ত্তি অঙ্কন করিতে কবি যে কয়েকটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই সার্থক এবং সুনির্ব্বাচিত। কিন্তু এই বর্ণনার পর কবি দেবগণের মন্ত্রণা-বিতর্ক ও আত্মকলহের যে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন, কাহিনীর অগ্রগতির দিক দিয়া তাহার সার্থকতা কতখানি সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যায়। এই বিতর্কসভায় স্থির হইল যে কুমেরু শিখর হইতে ইন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া দুরন্ত অসুরকে বধ করিবার জন্য দিবারাত্র সমর চালাইয়া যাওয়া হউক—

"সকলে সম্মত শীঘ্র উঠি ব্যোমপথে,
বেষ্টিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদিবা,
চির সমরের স্রোতে ঢালিয়া শরীর
দেব নিন্দাকারী দুষ্ট অসুরে ব্যথিতে ॥"

স্বর্গবিতাড়িত দেবগণ যে অসুরকে নির্ব্বিবাদে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে দিবে না এ কথা স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সত্য। সুতরাং অসুর-নিধন-যুদ্ধে দেবগণের এই প্রস্তুতি এবং ইহার জন্য এই আত্মকলহ ও বিতর্ক কাহিনীর দিক দিয়া নূতন কোন জটিলতা সৃষ্টি করে নাই। এইরূপ একটি অবান্তর ও গুরুত্বহীন ঘটনা কাব্যের নেপথ্যে না রাখিয়া একটি স্বর্গে ইহার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা কাব্যের সূচনা করায়, এই সূচনাংশ স্বতন্ত্রভাবে কিছুটা কাব্যসৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইলেও ইহা দ্বারা কাব্যের গভীরতর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। কাব্যের দুইটি বিরোধীপক্ষের একদিকে দেবগণ আর একদিকে বৃত্রাসুর। দেবগণ স্বর্গবিতাড়িত, বৃত্রাসুর স্বর্গাধিষ্ঠিত। এইরূপ পরিস্থিতিতে দুই পক্ষের সংঘর্ষের জন্যই পাঠকের মন প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ বিতর্কসভা অনর্থক কালক্ষয় করিয়াছে মাত্র।

ইহার পর দ্বিতীয় সর্গে ঐন্দ্রিলা কর্ত্তৃক শচীকে দাসী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে কাব্যের একটা মূলসূত্রের উপর হাত পড়িয়াছে। পরে প্রথম খণ্ডে এগারটি স্বর্গে এই সূত্রটিরই অনুবৃত্তি চলিয়াছে। কবি নৈমিষারণ্য হইতে শচীকে স্বর্গে আনয়ন ব্যাপারকে কাব্যের একটি মূল অংশরূপে প্রাধান্য দিয়াছেন। কাব্যের প্রথম খণ্ডটিতে এই ঘটনারই বিস্তৃত বর্ণনা। কিন্তু এই ঘটনাকে মূল কাব্যপরিকল্পনার একটা গৌণ অংশ ছাড়া অন্য কিছু মনে করা যাইতে পারে

না। এই ঘটনাটিকে বৃত্রের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নয় এবং এই পাপের জন্যই যে বৃত্রের পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কাব্যের কোথাও বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হয় নাই। এই ঘটনার সহিত বৃত্রের পতনকে কবি দূর সম্পর্কসূত্রে বিধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, সুতরাং কাব্যের পরবর্ত্তী অংশে এই ঘটনার প্রভাব সুদূর-প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। তবে ঘটনাটিকে এতখানি গুরুত্ব দিয়া বর্ণনা করিবার হেতু কি? মেঘনাদ-বধের মূল আখ্যানাংশের মধ্যে রাবণের পাপের চিত্র নাই। হেমচন্দ্র বোধ হয় পাপের চিত্রটি উজ্জ্বলরূপে আঁকিয়া বৃত্রের পতনকে যুক্তি-প্রকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কবি কি আশা করেন না যে বৃত্রের উপর পাঠক সহানুভূতিশীল হউক? বৃত্রের পতনের পথ প্রশস্ত রাখিয়া তাহার দুর্ব্বলতা বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া বৃত্রকে বীর-চরিত্র রূপে আঁকিবার সার্থকতা কি? ইহাতে অনুমান করিতে পারি, পৌরাণিক বৃত্রের কাহিনী যেভাবে পুরাণকার বর্ণনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র ঠিক সেই পথটি অন্তত কাহিনীর দিক দিয়া অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব এমন কিছু বক্তব্য ছিল না যাহার জন্য প্রাচীন কাহিনীকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার প্রয়োজন হইতে পারে।

একাদশ স্বর্গে বিবৃত, বৃত্র-সংহার কাব্যের প্রথম খণ্ডকে এই কাব্যের ভূমিকা বা উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে। উপক্রমণিকাংশ ও মূল কাহিনী অংশ এইভাবে দুইটি প্রথম খণ্ডে বিবৃত হওয়ায় ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র অংশরূপেই রহিয়া গিয়াছে। রস-নিটোল কাব্যের আখ্যানাংশের মধ্যে এইরূপ বিস্তীর্ণ ফাটল-রেখা আবিষ্কার করা যায় না। কার্য্য-কারণ ও সূচনা-পরিণতি পরিপূর্ণ-ভাবে মিলিত হইয়া কাব্যের রস-পরিণামে সহায়তা করে। হেমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়া কাব্যের দুইটি অংশ দুইটি পৃথক দ্বীপের মত রাখিয়া দিয়া পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য সেরূপ কোন আদর্শ কবির ছিল কি না বোঝা শক্ত।

প্রথম খণ্ডে শচী-অপহরণ ঘটনার উপর এত গুরুত্ব এবং ইহার জন্য এত সমারোহ-আয়োজন-আড়ম্বর সৃষ্টি করিবার হেতু হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে কবি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে কাব্য-কাহিনী সংলগ্ন করিতে না পারিয়া ক্ষীণ সূত্রে গ্রথিত গৌণ অংশের উপরও অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কাহিনীর প্রবাহ কোন স্থির লক্ষ্যাভিমুখী নয় বলিয়া ইতস্ততঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যে একটা স্থির

পরিণতিকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাগুলি বিন্যস্ত হয়; কিন্তু বৃত্র-সংহার কাব্যের ঘটনা অবিন্যস্ত। এইরূপ অবিন্যস্ত ঘটনা দেখিয়া অনুমান হয়; গল্প বলাই যেন কবির অভিপ্রায়। কবির কোন ব্যস্ততার লক্ষণ নাই, তিনি যেন কথক-ঠাকুরটির মত পায়ের উপর পা তুলিয়া মুগ্ধ শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া গল্পের সূত্র ধরিয়া ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। ভাব-উচ্ছ্বাস নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন চেষ্টা নাই, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাহিনী সংক্ষিপ্ত করিবার কোন উৎসাহ নাই। এ আদর্শ ঠিক মহাকাব্য বা মহাকাব্যজাতীয় আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শ নয়, ইহাকে অনেকখানি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের আদর্শ বলা যাইতে পারে। ইহার তুলনায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের আখ্যানাংশের প্রচণ্ড গতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই কাব্যের ঘটনাগুলি যেন অশ্রান্ত স্রোতোবেগের উপর তৃণখণ্ডের প্রায় মুহূর্ত্তের মধ্যে' দুর্ব্বার গতিতে ভাসিয়া গিয়াছে। পাঠক যদি সজাগ না থাকে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যদি তীব্র না হয়, তাহা হইলে কাব্যেব অগ্রগতির সহিত সাম্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। বৃত্র-সংহার ধীর লয়ের কাব্য, মেঘনাদ-বধ দ্রুত লয়ের কাব্য। প্রথম কাব্যের আখানাংশে ঘটনার কুণ্ডলী আছে, আবর্ত্ত আছে; দ্বিতীয় কাব্যের আখ্যানাংশে আছে অশ্রান্ত দুর্ব্বার গতি। প্রথম কাব্যে যেন সমতলের নদীধারা, দ্বিতীয় কাব্য যেন পার্ব্বত্য ঝরনা-ধারা। একটিতে ব্যাপকতা আছে কিন্তু কল্লোল নাই, আর একটি শীর্ণ-আয়তন কিন্তু কলমন্দ্র-মুখর।

প্রথম খণ্ডের ঘটনা-বিস্তার ও আবেগ-বাহুল্য ইহাকে একটি স্বতন্ত্র কাব্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। মূল আখ্যানাংশের সহিত সংযুক্ত না হইলেও এই খণ্ডের যুদ্ধ-বর্ণনা, মাতৃ-স্নেহ, পত্নী-প্রেম, যুদ্ধ-পরাজয়ের গ্লানি, যুদ্ধ-যাত্রার সমারোহ, যুদ্ধ-জয়ের উল্লাস—এই সমস্ত বিষয়গুলি এমন বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে শচী-অপহরণ কাহিনী একটা স্বতন্ত্র কাব্যের মর্য্যাদা দাবী করিতে পারে। মদন কর্ত্তৃক নৈমিষারণ্যে শচীর নিকট ঐন্দ্রিলার ইচ্ছাজ্ঞাপন, অসহায় শচীর বীরপুত্র জয়ন্তকে স্মরণ, মায়াকানন সৃষ্টি, জয়ন্তের মাতৃরক্ষাহেতু নৈমিষারণ্যে আগমন, জয়ন্ত কর্ত্তৃক বৃত্র-প্রেরিত ভীষণ বধ, পুনরায় বৃত্র কর্ত্তৃক রুদ্রপীড়কে নৈমিষারণ্যে প্রেরণ, রুদ্রপীড়ের নৈমিষারণ্যে গমনোদ্যোগ, রুদ্রপীড়-পত্নী ইন্দুবালার উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলতা, জয়ন্ত-রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ, জয়ন্তের পরাজয়, শচীকে লইয়া রুদ্রপীড়ের স্বর্গে গমন, বৃত্র-ঐন্দ্রিলার নিকট রুদ্রপীড়ের যুদ্ধাভিজ্ঞতা বর্ণনা—ইহা একটি স্বতন্ত্র কাব্যের কথাবস্তু হিসাবে যথেষ্ট। কিন্তু

প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রেই বৃত্র-সংহার কাব্য। সুতরাং এই দুইটি খণ্ডকে স্বতন্ত্র মনে করিবার কারণ নাই, ইহা মূল কাব্যের একটি অংশ। সেই সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে যে, যে-কাব্যে একটি অংশের জন্য কবি এতখানি জায়গা ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন তাহা কোন্ আদর্শের কাব্য? তবে আখ্যায়িকা কাব্যের গঠন-আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে পারি যে এই খণ্ডটিকে কাব্যরঙ্গ-মঞ্চের পাদপ্রদীপের সম্মুখে না আনিয়া কবি যদি ইহাকে নেপথ্যালোকে রাখিয়া দিতেন তাহা হইলে কাব্যের সৌন্দর্য্য বাড়িত, গঠনও ত্রুটিশূন্য হইতে পারিত।

দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনীর অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবি দ্রুত ঘটনা-সন্নিবেশে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। একদিকে বৃত্রের সৌভাগ্য-আকাশে কালো মেঘের সন্নিবেশ, আর একদিকে বিশ্বকর্ম্মার শিল্প-সদনে ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্র নির্ম্মাণ। এইভাবে দুই দিক হইতে কাহিনীর দুইটি অংশ যেন নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে একটা প্রত্যাশিত ও অনিবার্য্য পরিণতি-লক্ষ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। হয়ত ঘটনার উপর দৈব প্রভাব এবং কাহিনীর সুপরিচিত পৌরাণিক ভিত্তিই এইভাবে পরিণতিকে যান্ত্রিক করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু দৈব-সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া, সুপরিচিত কাহিনীর মধ্যেও যে আবেগ উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায়, মেঘনাদ-বধ কাব্য তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বৃত্রের পতনের ভূমিকায় যে দৈব-সহযোগিতা আছে, ঠিক সেইরকম দৈব-সহযোগিতা-তেই মেঘনাদের পতনকে সম্ভব করা হইয়াছিল। দেব-অস্ত্রে সুশোভিত হইয়া মায়ার প্রসাদে অলক্ষ্যরূপে যখন লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে তখন পাঠক আশা করে না যুদ্ধে লক্ষ্মণ পরাজিত হইবে। সেখানে পরিণতি পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত এবং পাঠকের কাছেও তাহা অবিদিত নয়, তথাপি মেঘনাদ-নিধনকে যান্ত্রিক বা আবেগহীন মনে হয় না। রাবণও যে সবংশে নিহত হইবে সে কথা এত জায়গায় এত ভাবে শোনা গিয়াছে যে সে সম্বন্ধে পাঠকের মনে কোনরূপ সংশয় থাকে না। কিন্তু রাবণের পতন কি যান্ত্রিক বা আবেগহীন? তাই যে কাব্যের পরিণতি আমরা পূর্ব্বেই অবগত আছি, মধুসূদন অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত সেই জ্ঞাত-কাহিনীর চাবি দিয়া পাঠকের অন্তর্লোকের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পরিচিত আখ্যানাংশের মধ্য হইতে অপরিচিত অননুভূত জীবন-রস উৎসারিত করিয়াছেন। কারণ মেঘনাদ-বধ কাব্যে matter অপেক্ষা spirit-এর প্রাধান্য; আখ্যান অপেক্ষা অনুভূতি প্রবল। বৃত্র-সংহার ঠিক তাহার বিপরীত। ইহা বস্তুর জড়পিণ্ড; কবি একটা সহজ-সরল-বিরোধ-

হীন কাহিনীর উপর অযথা বস্তুভার চাপাইয়া তাহাকে বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্দ্রের বজ্র-সংগ্রহ এবং বৃত্র-নিধন—কাহিনীর এই পরিকল্পনাটি অতি ক্ষুদ্র। কবি নানাভাবে এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনাকে বস্তুভারে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবেগ-অনুভূতি উৎসারণের চেষ্টা যে করেন নাই, তাহা নয়; তবে কবির সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আখ্যায়িকা-কাব্যে মেরুদণ্ডস্বরূপ মূল কাহিনীর চারিদিকে বস্তু-তথ্য সমাবেশ করা বিশেষ অপকর্ষের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কিন্তু এই বস্তু-সমাবেশেরও একটা সীমা আছে। হেমচন্দ্র সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়াই বৃত্র-সংহারের বস্তুভার পাঠকের শ্বাস রোধ করে।

এইবার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাহিনীর প্রবহমানতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য হেমচন্দ্র যে বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাইবে। ইহার মধ্যে যুদ্ধ-বর্ণনাই প্রধান। পঞ্চদশ সর্গে, বিংশ সর্গে, দ্বাবিংশ সর্গে ও চতুর্ব্বিংশ সর্গে যুদ্ধের বর্ণনা (শেষের তিনটি সর্গ সর্ব্ববৃহৎ)। এই চার সর্গ ব্যাপী যুদ্ধ-বর্ণনা কাব্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং যুদ্ধ-বর্ণনায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব যে মধুসূদনের অপেক্ষা অধিক সে কথাও বলিয়াছেন। হেমচন্দ্রের কবিশক্তির প্রকাশ আবেগঅনুভূতিহীন বস্তু-বর্ণনাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং যুদ্ধ-বর্ণনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য প্রদর্শন খুবই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। প্রকৃতই কেবলমাত্র শব্দের আড়ম্বরে তিনি যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতা চমৎকার ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। শব্দ ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে কবি যেন পাঠকদের একেবারে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনের মধ্যে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কোদণ্ডটঙ্কার, রথ-চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি, সৈন্য-বাহিনীর গগনবিদারক চীৎকার, অশ্বের হ্রেষারব যেন পাঠকের কর্ণপটহে আসিয়া আঘাত করে। দেব-অস্ত্রের অপূর্ব্ব কিরণছটা, স্বর্ণমেঘমালা-সদৃশ কিরীট, সাগর-তরঙ্গের ন্যায় সৈন্যদলের দুর্ব্বার গতি পাঠকের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট চিত্রমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাই যুদ্ধ-বর্ণনায় হেমচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব-গৌরব দাবী করিতে পারেন।

কিন্তু হেমচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনা সম্পর্কে ইহাই শেষ কথা নয়। এবং বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেও এ কথা সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারিব না যে যুদ্ধ-বর্ণনায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব মধুসূদন অপেক্ষা অধিক। হেমচন্দ্রের কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ-চিত্রগুলি যদি একত্র মিলাইয়া তুলনামূলক আলোচনা করি,

তাহা হইলে দেখিব হেমচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কবির যেন যুদ্ধ-বর্ণনার একটা নির্দ্দিষ্ট ছক (Pattern) ছিল এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধ সেই নির্দ্দিষ্ট ছকে ফেলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার যুদ্ধ-চিত্রগুলি নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক। উদাহরণস্বরূপ বিংশ সর্গের যুদ্ধ-চিত্রটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সর্গের বহু জায়গা জুড়িয়া কবি দেব ও দৈত্য পক্ষের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বর্ণনা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হইতে পারে না। এই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘটিবে না, কোন একজন বিশেষ যোদ্ধার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইবে না। কেবল রথ ছুটিবে, তীর নিক্ষিপ্ত হইবে, এ-পক্ষে ও-পক্ষে সৈন্য আহত-নিহত হইবে। রামায়ণ-মহাভারত বা ইলিয়ডের ন্যায় প্রাচীন মহাকাব্যে এই শ্রেণীর যুদ্ধ-বর্ণনার একটা উপযোগিতা ছিল; কিন্তু আধুনিক যুগের কাব্যে এইরূপ যুদ্ধ-বর্ণনার উপযোগিতা কতখানি সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যাইতে পারে। যুদ্ধই হউক অথবা রঙ্গক্রীড়াই হউক কোন একটি বিশেষ পক্ষে যদি পাঠকের মন সহানুভূতিশীল না হয়, তাহা হইলে পাঠক তাহা হইতে আনন্দ পাইতে পারে না। মধুসূদন ইচ্ছা করিলে রক্ষসেনা ও বানরসেনার একটা খণ্ডযুদ্ধের বর্ণনা কাব্যের মধ্যে অনায়াসেই ঢুকাইয়া দিতে পারিতেন। উভয় পক্ষ তো যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইয়া ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া তাহারা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া যে পরস্পরের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতেই পরিবেশ আরও গম্ভীর হইয়াছে। খণ্ডযুদ্ধের দমকা বাতাসে নিস্তব্ধ-গম্ভীর পরিবেশটি লঘু হইয়া যাইত। তাই মধুসূদন তাঁহার পাঠকদের মাত্র একবারের জন্য রণভূমিতে লইয়া গিয়াছেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণচূড়ার অন্তরাল হইতে রণভূমি দেখাইয়াছেন) এবং সেখানে যে যুদ্ধ দেখাইয়াছেন তাহার এক পক্ষে পুত্র-শোকাতুর রাবণ, আর একপক্ষে মেঘনাদ-হন্তা লক্ষ্মণ। সে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে পাঠকের বুকের রক্ত শীতল হইয়া যায়। কিন্তু হেমচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনায় মানবিক-আবেদন একেবারেই নাই। সে যুদ্ধে কাহার সৈন্য মরিতেছে, কাহার রথের চাকা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, জয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষের অঙ্কশায়িনী হইল, সে প্রশ্ন যেন গৌণ। সৈন্যেরাও যেন জয়-পরাজয়ের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধ-বর্ণনার পশ্চাতে হৃদয়ভাবের বর্ণনা না থাকিলে সে যুদ্ধ-বর্ণনা নিষ্ফল, হেমচন্দ্রের এইরূপ বহু যুদ্ধ-বর্ণনা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হেমচন্দ্রের আড়ম্বর আছে, সমারোহ আছে, কিন্তু বীভৎসতা নাই। রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি আছে, কিন্তু যুদ্ধান্তকালীন রণভূমির নরক-দৃশ্য নাই। যুদ্ধের নাম

শুনিলে আমরা যে কেবল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার কথাই মনে করি তা নয়, সেই সঙ্গে শবকঙ্কাল-পরিকীর্ণ ভগ্ন রথ, মৃত অশ্ব-হস্তী ও শবলুব্ধ শৃগাল-কুকুরের আনাগোনার কথাও মনে হয়। হেমচন্দ্রের কাব্যে যুদ্ধের সে চিত্র নাই, মেঘনাদ-বধে তাহা আছে।

যুদ্ধ-বর্ণনার পর উনবিংশ সর্গে বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা ও বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বৃত্র-নিধন বজ্র নির্ম্মাণ-কৌশলের বিস্তৃত বর্ণনা এবং একবিংশ সর্গ কৈলাস-বাসিনী নগেন্দ্রবালার দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা। এই দুইটি প্রসঙ্গ কাব্যের অনেকখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা বর্ণনায় হেমচন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। কবি গভীর ধরণীগর্ভের একটা স্পষ্ট চিত্র কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই একটি জায়গায় হেমচন্দ্র ক্লাসিক কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যন্ত স্পষ্টরেখায় এই শিল্পশালার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং যেখানে দধিচীর পবিত্র অস্থি হইতে দেবজয়ী বৃত্রাসুর-নিধন বজ্র নির্ম্মিত হইতেছে, সেই শিল্প-শালাটি তাহার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সহিত যুক্ত করিয়া কবি অপরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন। অনুরূপ গাম্ভীর্য্য বৃত্র-সংহার কাব্যের আরও বহু জায়গায় হয়ত আছে, কিন্তু এই কাব্যের আর কোথাও হেমচন্দ্র কল্পনাকে এরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করিতে সমর্থ হন নাই।

"কোনখানে ধূম্রবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবী-গর্ভে—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী-জঠরে, কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত-আলোকে
আভাময়; রক্তবর্ণ তাম্রের স্তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ-আকৃতি
রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ
নিরখিলা আখণ্ডল সে মহী-জঠরে,
শোভাকর—শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলী উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনী-কোলে!
জলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে,

কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত ভাবে!
পীতবর্ণ হরিতাল-স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর;
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে।
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিয়া ধরায়।"

ইহার পর বজ্র-নির্ম্মাণ-কৌশলও কবি অনুরূপ গাম্ভীর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিয়া বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু একবিংশ সর্গে নগেন্দ্রবালা জয়াকে সম্বোধন করিয়া যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একদিকে তাহা কাব্যের পক্ষে যেমন অবান্তর তেমনি আর একদিকে ইহার নীরসতাও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। মনে হয় কবির প্রথম কাব্য চিন্তা-তরঙ্গিণীর নায়ক নরসখা নগেন্দ্রবালার রূপ ধরিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছে। এই সর্গে কবি কাব্যের ঘটনাপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করিয়া যে সৃষ্টি-রহস্যকথার আড়ম্বর করিয়াছেন কাব্যের পক্ষে তাহা দুর্ব্বলতম অংশ। এই তত্ত্বগুলিকে কবি কেবলমাত্র বক্তৃতারূপে উপস্থাপিত করিয়া ইহার কাব্যমূল্য লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। কাব্যে তত্ত্ব থাকে, কিন্তু জীবন-বিবিক্ত তত্ত্বের স্থান কাব্যে হইতে পারে না। কবি যদি কোন তত্ত্বানুভূতি প্রকাশ করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের আশ্রয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহাই কাব্য; আর জীবন-বিবিক্ত যে তত্ত্ব তাহাই দর্শন। এই সর্গের তত্ত্ব দার্শনিক, ইহার কোন কাব্য-মূল্য নাই।

যুদ্ধ-বর্ণনা, বিশ্বকর্ম্মা-শিল্প-সদন, বজ্র-নির্ম্মাণ-কৌশল বর্ণনা ও নগেন্দ্রবালার দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা—এইগুলি ছাড়াও মূল কাহিনীর পাশে আর একটি উপকাহিনীর অন্তঃস্রোত বহিয়া গিয়াছে। সেটি হইল—শচী-ঐন্দ্রিলা-ইন্দুবালা এই ত্রি-চরিত্রের সমবায়ে সৃষ্ট আর একটি ত্রিকোণাকৃতি কাহিনী। এইটি উপকাহিনী হইলেও কাব্যে ইহার প্রাধান্য মূল কাহিনীকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য মূল কাহিনীর অগ্রগতিতে ইহার সহযোগিতা খুবই অল্প। এই উপকাহিনীটি ঐন্দ্রিলা চরিত্রকে পরিস্ফুট করিতে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ঐন্দ্রিলা-চরিত্র চিত্রণ কাব্যের মূল উদ্দেশ্য নয়। তাহা হইলে দেখা

যাইতেছে যে কাহিনী-বিন্যাসেও কবি এমন সচেতন নন যাহাতে ঘটনা-প্রসঙ্গগুলি অন্ততপক্ষে মূল কাব্য পরিকল্পনার আদর্শানুযায়ী বিন্যস্ত হইতে পারে। নানা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়া কাহিনী-প্রবাহের সহজ গতিতে নানা বিরোধী তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তিনি পদে পদে কাব্যের অগ্রগতির বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি যদি বৃত্র-সংহারের পৌরাণিক কাহিনীটি নিজের ক্ষমতানুযায়ী সাধারণভাবে বর্ণনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে মনে হয় ঐরূপ হইত না। মধুসূদনকে না বুঝিয়া তিনি মধুসূদনের অনুসরণ করিতে গিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলে বৃত্র-সংহারের কাহিনী-অংশের আলোচনা শেষ হইবে। মহাকাব্যের বা আখ্যায়িকা-কাব্যের ঘটনা-বিন্যাসে কিছুটা নাটকীয় কলা-কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, তাহাতে কাহিনীর চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৃত্র-সংহারের কাহিনীটিতে নাটকীয় বিন্যাস নাই। কবি একবার স্বর্গে বৃত্র, আর একবার কুমেরু-শিখরে ইন্দ্রের বর্ণনা দিয়াছেন। একবার ঐন্দ্রিলার দর্পিতা মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন, আর একবার নৈমিষারণ্যে শচীর অসহায় বিপন্ন মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। এ-পক্ষের ঘটনা কিছু অগ্রবর্ত্তী হইলে ও-পক্ষের ঘটনা বর্ণনা করিয়া দুই বিরোধীপক্ষের ঘটনার সমান্তরালতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। কবি যেন ক্লান্ত কল্পনা-বৃষভের স্কন্ধে এই দুই পক্ষের কাহিনী দুইটি ঝুলাইয়া দিয়াছেন, সে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া একসময় লক্ষ্যে পৌঁছাইয়াছে। পাঠক সেই নীরস, একঘেয়ে চমৎকারিত্বহীন, আবেগ-উত্তাপহীন কাহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও শুষ্ককণ্ঠ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কৈলাসে নগেন্দ্রবালা যখন পরম বিজ্ঞের মত তাহার নীরস তত্ত্বের ঝুলি খুলিয়া বসে তখন পাঠকের ধৈর্য্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়। কোনক্রমে সেই তত্ত্ব-কথার আবর্ত্ত হইতে রক্ষা পাইয়া পাঠক যখন দেবসেনা ও অসুরসেনার অন্তহীন পরিণামহীন যুদ্ধের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সে-যুদ্ধের তূর্য্যনিনাদ ও অসিঝঙ্কারে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত না হইয়া কখন ইন্দ্র বজ্রটিকে বৃত্রাসুরের উপর নিক্ষেপ করিয়া এই কারাযন্ত্রণার অবসান ঘটাইবে, সেই শুভক্ষণটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তাই বৃত্র-সংহার কাব্য সমাপ্ত হইলে পাঠক তৃপ্তি বোধ করে বটে, কিন্তু সে তৃপ্তি কাব্য-পাঠের তৃপ্তি নয়, কাব্য যে শেষ হইয়াছে তাহার তৃপ্তি।

ঘটনা সমাবেশ ও কাহিনী-বিন্যাসে হেমচন্দ্র অপারদর্শী হইয়াও কাব্যকে

অথবা এত বস্তুভারে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছেন যে বস্তুর সাম্য রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহল-আগ্রহকে তিনি জাগাইয়া রাখিতে পারেন নাই। বর্ণনায় নাটকীয় কলাকৌশল অবলম্বন না করাতেই এইরূপ হইয়াছে। তিনি অবান্তর বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করেন নাই। কোন্ প্রসঙ্গটির বর্ণনায় সুর চড়াইতে হইবে, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। কাহিনীর আদি-মধ্য-ভাগ কল্পনা করেন নাই। কাহিনীর একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত্ত নাই। এমন একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা নাই যাহাতে পাঠকের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শান্ত নিস্তরঙ্গভাবে কাহিনীর প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, ইহাই বৃত্র-সংহার কাব্যের নীরস ও একঘেয়ে হইয়া উঠিবার অন্যতম কারণ।

॥ ৬ ॥

এইবার এই কাব্যের চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইবে। কাহিনী-বিন্যাসের ত্রুটি সত্ত্বেও স্থানে স্থানে বহু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণনায় হেমচন্দ্র কিছু কৃতিত্ব-গৌরব দাবী করিতে পারেন। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণের ত্রুটি বোধ হয় অপূরণীয়। বিশেষ করিয়া চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্যে, তাহাদের আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে কবি কোথায়ও মহাকাব্যোচিত মহিমামণ্ডিত আখ্যায়িকা-কাব্যের পাত্রপাত্রীর উপযোগী উদাত্ত গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। গম্ভীর পরিবেশ-পটভূমির মধ্যে তাই চরিত্রগুলির চারিত্রিক দুর্ব্বলতা ও লৌকিক ভাব-অনুভূতি অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিসদৃশ হইয়া কাব্যের মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও গৌরব সমুন্নতিতে বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কেবলমাত্র বিষয়-বর্ণনার গাম্ভীর্য্যই কাব্যের সুর উচ্চগ্রামে উন্নীত করে না, কেবলমাত্র ঘটনা-সমাবেশে কাব্যের অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে না। উদাত্ত চরিত্র-কল্পনা, ভাবগম্ভীর বিষয়-বর্ণনা ও গুরু-ঘটনা-সমাবেশ মিলিত হইলে কাব্যের গৌরব সম্ভব হইতে পারে। বৃত্র-সংহারে ভাবগম্ভীর বর্ণনা স্থানে স্থানে আছে, গুরু-ঘটনা-সমাবেশও কিছু কিছু আছে, কিন্তু উদাত্ত চরিত্র-কল্পনার অভাবে সেগুলিও কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বৃত্র-সংহার মেঘনাদ-বধ কাব্যের ন্যায় heroic poetry-র আদর্শেই রচিত। ইহার রচনা-আদর্শে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অনুবর্ত্তন লক্ষ্য করা না

গেলেও, ইহা যে বীরভাবপ্রধান কাব্য তাহা কাব্যের কাহিনী-পরিকল্পনা, ঘটনা-সমাবেশ ও চরিত্র-চিত্রণের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই সহজে বোঝা যায়। বৃত্র যখন বীরগর্ব্বে ঘোষণা করে—

"সঙ্কল্প করিনু অদ্য শুন দৈত্যকুল,
সঙ্কল্প করিনু হের স্পর্শীয়া ত্রিশূল—
সূর্য্যেরে রাখিব ক'রে রথের সারথি,
চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি,
পবন ফিরিবে সদা সম্মার্জ্জনী ধরি।"

তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে রাবণের ন্যায় শক্তি-গৌরব-ই এই চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহা ছাড়া এতগুলি যুদ্ধের দ্বারা যে কাব্যের পরিবেশ-পটভূমি পূর্ণ হইয়াছে তাহা যে বীরভাবপ্রধান কাব্য, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং বৃত্রকে ও এই কাব্যের অন্যান্য চরিত্রকে বীরকাব্যের চরিত্ররূপেই বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বীরকাব্যের চরিত্রের বীরত্ব-ই প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও এই বীরত্ব-ধর্ম্মের অন্তরাল হইতে তাহার মানব-পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত না করিতে পারিলে সে চরিত্রের আশ্রয়ে কাব্যের রস-পরিপুষ্টি সম্ভব হইতে পারে না।

বৃত্র-সংহার কাব্যের চরিত্র-বিচারে তাই চরিত্রের বীরধর্ম্মও যেমন লক্ষ্য করিতে হইবে তেমনি চরিত্রগুলি এক-একটি জীবন্ত গদা লইয়া উঠিয়াছে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার মানব-ধর্ম্মটিও দেখিতে হইবে। তবে সাধারণ-ভাবে বলিতে পারি এই কাব্যের কোন একটি চরিত্রও পাঠকের অন্তর্লোকে প্রবেশাধিকার পায় নাই। কাব্যের চরিত্রগুলি যে বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত হইয়া পাঠকের মর্ম্মলোকে প্রবেশ করিতে পারে, স্থূল বাহ্য পরিচয় পরিহার করিয়া যে সূক্ষ্ম ভাবপরিচয়ে শাশ্বত মানবরূপে তাহারা পাঠকের হৃদয়তীর্থে অধিষ্ঠিত হয়, বৃত্র-সংহার কাব্যের কোন চরিত্রে সে বৈশিষ্ট্য নাই। কবি কোথায়ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এ কথা সাধারণভাবে পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে কবি বীরচরিত্র অঙ্কনে কী পরিমাণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসাপেক্ষ। সে বিচারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কোন চরিত্রের বীরত্ব-গর্ব্ব প্রকৃতই তাহার বীর-হৃদয় হইতে উৎসারিত কি না, মুখে সে যে বীর-কীর্ত্তি দাবী করিয়াছে তাহার আচরণ ক্রিয়াকলাপের

মধ্যে সে দাবীর সমর্থন আছে কি না। তাহার বীরত্ব-গর্ব্ব কি শূন্যগর্ভ অথবা তাহা বীর চেতনার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত? সে আদর্শে বিচার করিতে গেলে প্রথমেই বৃত্রের মৌখিক আস্ফালন ও আচরণের মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কাব্যের প্রথম খণ্ডে বৃত্র সুমিত্রের মুখে স্বর্গে দেব-উৎপাত সংবাদ যেরূপ দৃঢ় অবিশ্বাসের সহিত উপেক্ষা করিয়াছিল—পরে সে বীরহৃদয় যেন আকস্মিকভাবে সংকুচিত হইয়া গিয়াছে।

"শুনিয়া হাসিলা বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ;
কহিলা, 'প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রিবর ?
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার ;
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ?
দানবের ভয়ে স্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া
লুক্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া !
সাধ্য কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গ মুখ,
যাক্ কতকাল আরো ঘুচুক সে দুখ'।"

এই উক্তিতে বৃত্রের ভয়হীন-শঙ্কাহীন বলিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয়-ই পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনায় বীর বৃত্র যেন শৃগালের ন্যায় ভীতশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম খণ্ডে বৃত্র-চরিত্রের বীর-হৃদয়ের যে পরিচয় আঁকা হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডের ভীরু ভাবের কালিমায় তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই খণ্ডের সূচনাতেই (দ্বাদশ সর্গে) জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় বৃত্রের অসহায়তা-হতাশাকে দূর করিবার জন্য বৃত্র-মহিষী ঐন্দ্রিলা-চরিত্রে কবি একটু মাত্রাতিরিক্ত তেজ সঞ্চারিত করিয়া বৃত্রকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে ঐন্দ্রিলার তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তির কাছে বধকালীন পশুর ন্যায় বৃত্রের মূর্ত্তিটি অধিকতর অসহায় দেখাইয়াছে।

"বামা তুমি' বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন।
হেরিলা ঐন্দ্রিলা মুখ গর্ব্বিত গম্ভীর,
দন্তে ওষ্ঠে প্রস্ফুটিত, চারু বিম্বাধর
বিস্ফারিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন।
সে চিত্র নিরখি বৃত্র আবার নীরব।

লাবণ্যমণ্ডিত গণ্ড দন্তের ছটায়
চিত্ত-প্রতিবিম্ব যেন প্রভান্বিত এবে
সর্ব্ব অঙ্গে, অবয়বে ললাটে গ্রীবায়।
যেন বা কি দৈববাণী অন্যের অশ্রুত,
গোপনে শুনেছে বামা তাই সে প্রত্যয়,
দৃঢ়তর এত মনে,—তাই উপহাস
করিছে দনুজ বাক্যে দনুজ-মহিষী।
দেখিয়া দৈত্যের মনে দর্প উপজিল ;
ঐন্দ্রিলার গর্ব্বে যেন চিত্ত ক্ষণকাল
জন্মিল প্রত্যয় হেন—তাহারি সে ভ্রম॥"

রাবণের সহিত বীরত্ব-গৌরবে বৃত্রের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই সর্গে ধরা পড়িয়াছে। এই সর্গে শিবের ক্রোধবহ্নিতে বৃত্র তাহার পতনের পূর্ব্বসূচনা দেখিয়া ঐন্দ্রিলাকে সর্ব্বাগ্রে অভিযুক্ত করিয়াছে—

"ঐন্দ্রিলে ঐন্দ্রিলে, জান নাকি হেনকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দিখণ্ড করি চরণ আঘাতে।"

রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারকে ত্রিভুবনে সকলেই নিন্দা করিয়াছে, রাবণ-পত্নী চিত্রাঙ্গদা পর্য্যন্ত। কিন্তু রাবণ নিজে ইহাকে কোনদিন পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে নাই ; অতি শোক-বিহ্বল মুহূর্ত্তেও তাহার বিলাপের মধ্য হইতে এ স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয় নাই যে সীতাহরণেই তাহার পতন। সূর্পনখার প্রতিও কখন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে রাবণ তীব্র বিষোদ্গার করে নাই, একবার মাত্র আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিল—'হায় সূর্পনখা, কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই রে অভাগী কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা এ ভুজগে?' এ উক্তিতে অভিযোগ নাই, ক্ষেদ নাই, কটাক্ষও নাই। রাবণ শক্তি-গৌরবী, সেই শক্তিকেই সে জগতের সমস্ত নীতি-আদর্শ-ধর্ম্মের উপর স্থান দেয়। রাবণ যাহা করে বিশ্ব তাহা স্বীকার করিয়া লইবে, রাবণ কখনও বিশ্বের বিধান স্বীকার করিয়া লয় না—রাবণের জগতের কক্ষাবর্ত্তন স্বতন্ত্র। এই শক্তি-অভিমান-ই রাবণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাহার গৌরবের মূল উৎস। বহুবার রাবণ দেখিয়াছে তাহার ভাগ্য-দেবতা তাহার প্রতি প্রসন্ন নন, বহুবার সে করায়ত্ত সিদ্ধিকে স্খলিত হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রাবণের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা দেখা যায় নাই। ধরিত্রীর মত সে কুম্ভকর্ণ-বীরবাহু-

মেঘনাদের অকালমৃত্যুর শোক-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, কিন্তু একটুও বিচলিত হয় নাই, তাহার নিজের শক্তির উপর সে কখনও আস্থা হারায় নাই। রাবণ ধরিত্রীর ন্যায় সহনশীল এবং ধরিত্রীর ন্যায় শক্তিশালী। ইহার তুলনায় বৃত্রের এইরূপ বালসুলভ দুর্ব্বলতা, এইরূপ কাপুরুষের ন্যায় সংশয় তাহার চরিত্রের বীরধর্ম্মকে তো প্রতিষ্ঠা করে-ই নাই, পরন্তু তাহাকে সাধারণ মানুষের স্তর হইতেও নীচুতে নামাইয়া দিয়াছে। শচীকে স্বর্গে আনিবার প্রস্তাব ঐন্দ্রিলার নিকট হইতে প্রথম উত্থাপিত হইলেও বৃত্র-ই সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ভীষণ-রুদ্রপীড়কে নৈমিষারণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। তখন ঐন্দ্রিলার সহিত বৃত্রও নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে বিশেষ কৌতুকবোধ করিয়াছিল, কিন্তু কৌতুক-রহস্য ঘটনাকে যখন গুরুতর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল, তখন সে কৌতুক বৃত্রের কাছে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে এবং এই পাপকর্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব ঐন্দ্রিলার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বৃত্র ঐন্দ্রিলাকেই তাহার পতনের জন্য অভিযুক্ত করিয়াছে। ইহা কোন বীর নায়কের সঙ্গত আচরণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

আবার শিবের ক্রোধাগ্নি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃত্রের হালভাঙ্গা পালছেঁড়া অসহায় মূর্ত্তি তাহার দুর্ব্বল হৃদয়কেই সুস্পষ্ট করে। ইহাতে অনুমান হয়, বৃত্রের শক্তি-গর্ব্বের মূলে আছে শিবের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ। বৃত্রের শক্তি দেবশক্তি, তাহার হৃদয় ও বাহুর শক্তি নয়। বীরের শক্তির প্রকাশ কোথায় ? ইষ্টদেবতা বিমুখ, সমগ্র জগৎ বিমুখ, নিসর্গশক্তি দেবশক্তি বিমুখ—এই বিশ্ব-বিমুখতার মধ্যে একমাত্র হৃদয়বল ও বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামেই শক্তির পরাকাষ্ঠা। সে সংগ্রামে পরাজয়-গ্লানিও গভীরতর বিজয়-গৌরবে অভ্যর্থিত হয়, যেমন হইয়াছে রাবণ চরিত্রে। কিন্তু বৃত্র যে দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, দেবগণকে সে যে দাস-পদে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করে, সে সঙ্কল্পের শক্তি সে যে কোথা হইতে পাইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনাতেই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বৃত্রের দুর্ব্বলতা দৈব-আশীর্ব্বাদের বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া আছে। দৈব-আশীর্ব্বাদের যে অক্ষয় রক্ষা-কবচ সে সংগ্রহ করিয়াছে সেই রক্ষা-কবচই বৃত্রের সমস্ত শক্তি, সমস্ত জয়-গৌরবের মূল। তাই আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ অপহৃত হইলে সে যেরূপ বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল, বৃত্রও ঠিক সেইরূপ বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। রাবণও মহাদেবের বরপুষ্ট ; কিন্তু রাবণের নিজের শক্তির কাছে সে সংবাদটি অত্যন্ত গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। রাবণ যে রামের বিরাট বানর-সৈন্যের বিরুদ্ধে, তাহার নিজের বিরূপ ভাগ্য-দেবতার বিরুদ্ধে

অটল বিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছে—সে শক্তি মহাদেব যোগান নাই, সে-শক্তি রাবণের বাহু-শক্তি।

যে চরিত্র শক্তি-অভিমানী, শক্তি অবমাননা ও পরাজয় তাহার কাছে মৃত্যু-তুল্য। কিন্তু বৃত্রের মধ্যে লক্ষ্য করি যে দেবাসুরের যুদ্ধে তাহার শক্তি-পরাজয়ের জন্য সে তত বিমর্ষ ও চিন্তিত নয়; পরাজিত হইলে এই সুখভোগ্য স্বর্গপুরী ছাড়িয়া যাইতে হইবে এই চিন্তাই তাহার মনে গুরুতর পাষাণভার চাপাইয়া দিয়াছে। 'কি ফল বাঁচিয়া স্বর্গ ছাড়ি ?'—বৃত্রের এই উক্তি দেখিয়া এমনও মনে করা যাইতে পারে যে স্বর্গের উপর তাহার তেমন কোন আকর্ষণ না থাকিলে, বৃত্র হয়ত গোপনে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবার কল্পনাকেও হেয় জ্ঞান করিত না এবং মন্ত্রীর সহিত সে বিষয়ে হয়ত পরামর্শও করিত। তবে একবার স্বর্গসুধা ভোগ করিয়া স্বর্গ ত্যাগ করা, বড়ই বেদনাদায়ক।

ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারি মধুসূদন যে গভীর অনুভব-কল্পনা হইতে রাবণ-চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সে গভীরতা বৃত্রে নাই। হেমচন্দ্র অতি স্থূল ও লৌকিক কল্পনায় বৃত্রকে রূপ দিয়াছেন। মেঘনাদ-বধে রাবণ রাক্ষস হইয়াও বীর মানব; বৃত্র অসুরই। অসুরের নীচতা তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রকট, অথচ পৌরাণিক অসুর-শক্তিটুকু তাহার নাই।

কাব্যের নাম যদিও বৃত্র-সংহার, তথাপি কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র বৃত্র নয়, ঐন্দ্রিলা। এই কাব্যের প্রথম খণ্ডকে যেমন 'শচী-অপমান' নাম দেওয়া যায়, তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডকে 'ঐন্দ্রিলার দর্পভঙ্গ' নাম দেওয়া যায়। ঐন্দ্রিলা চরিত্রে কবি হয়ত লেডি ম্যাকবেথের ছায়াপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সবক্ষেত্রে গৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐন্দ্রিলা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—রূপ-ঐশ্বর্য্য-ক্ষমতা-গর্ব্ব। শচীকে সে তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করিয়া শচী-অপমানের দ্বারা তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। বৃত্র দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া যখন স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল, তখন স্বর্গবাসী হইয়াও যে ঐন্দ্রিলার ক্ষমতা-লিপ্সা তৃপ্ত হয় নাই, দৈত্যপতি বৃত্রের নিকট খেদোক্তির মধ্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"কহিলা ঐন্দ্রিলা দিয়াছে যে সব,
জানি হে সে সব বিভব গৌরব
তবু সর্ব্বজন-পূজিতা নই।

মণিকুলে যথা কৌস্তুভ মহৎ
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ
বল দৈত্যপতি হ'য়েছি কই ?
এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে
গৌরবে তেমনি সুখেতে বিরাজে
এখনো আয়ত্ত হ'লো না সেই ॥"

হেমচন্দ্র ম্যাকবেথ নাটকের আদর্শে ঐন্দ্রিলা চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বীরত্ব-প্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ভালো করেন নাই। কারণ ক্ষমতা-লিপ্সা, রূপগৌরবের মোহ প্রভৃতি মানব-চরিত্রের গভীরতম অন্তর্লোকের প্রবৃত্তি-সংঘাতগুলি ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র আখ্যায়িকা-কাব্য নয়। প্রথমত মানব-চরিত্রের এই দিকগুলি রোম্যান্টিক-কাব্যের বিষয়, ক্লাসিক-ধর্ম্মী আখ্যায়িকা-কাব্যের বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, মানব-প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এমন সূক্ষ্ম ও জটিল ব্যাপার যে চরিত্রের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সেখানকার সুপ্ত অবচেতন-মনের গ্রন্থিসঙ্কুল ইচ্ছা-ভাবনা-কামনাগুলি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তবে এই প্রবৃত্তির সংঘাত-নিবৃত্তি-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বাস্তব ও মনস্তত্ত্বসম্মত করিয়া তুলিতে হয়, ইহাকে কোন কাব্যের গৌণ বিষয় করিয়া রাখিলে ইহার উপর সুবিচার করা হয় না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ও পরিবেশ চাই। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র এই প্রবৃত্তির আভাসটুকু দিয়া রাখিলেও চলে না ; সূচনা হইতে বিবর্ত্তন এবং বিবর্ত্তন হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত এই প্রবৃত্তির সমস্ত স্তরগুলি দেখাইতে পারিলে তবেই পাঠক ইহাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। সেক্‌সপীয়ার ম্যাকবেথের ন্যায় একখানি পূর্ণ নাটকে যে ভাবটিকে যে পরিবেশে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যের একটি পার্শ্ব চরিত্রের সাহায্যে তাহা ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐন্দ্রিলা চরিত্রের এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকে অঙ্কুর হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই, কেবলমাত্র মধ্যস্থলটুকু দেখাইয়াছেন। তাই ঐন্দ্রিলা-চরিত্র যেন কিছু বিসদৃশ, কিছু বেশিমাত্রায় চঞ্চল, কিন্তু অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। যে ঈর্ষাদগ্ধ, কুটিল মানস-পরিবেশের দ্বারা তাহার কর্ম্ম ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, সেই মানস-পরিবেশটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ-ভূমিকার অভাবে তাহার আচরণ-ব্যবহার যেন বিসদৃশ ও অবাস্তব বলিয়া মনে হইয়াছে। ঐন্দ্রিলার যে উক্তিটি উপরে

উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইটি দেখিলে মনে হয় যে স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিবার জন্যে ঐন্দ্রিলার একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। শচীকে গৌরবচ্যুত করিয়া তাহার গৌরব-সিংহাসন অধিকার করিবার উদগ্র লালসাতেই যেন ঐন্দ্রিলা বৃত্রকে স্বর্গজয়ের প্ররোচনা দিয়াছে; স্বর্গ অধিকৃত হওয়ায় সেই উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হইয়াছে এবং সেই আংশিক সাফল্যের কথাই যেন উপরের এই উক্তিটির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কবি স্বর্গ-জয়ের পশ্চাতে ঐন্দ্রিলার গুপ্ত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতটুকুও দেন নাই, এবং কোথাও এমন আভাস পাওয়া যায় না যাহাতে স্বর্গজয়ের ঘটনাটিকে শচীর উপর ঐন্দ্রিলার বিজয়-গৌরবের সহিত সমন্বিত করিয়া দেখা যাইতে পারে। সুতরাং ঐন্দ্রিলার এই উদ্ধৃত-উক্তিটির ভূমিকা-অংশে ঐন্দ্রিলার মানস-প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ না হওয়ায় ইহা খুবই খাপছাড়া বলিয়া মনে হইয়াছে। কাব্যের শেষে একটিমাত্র লাইনে কবি ঐন্দ্রিলার পরিণতির সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন—

"দহিলা ঐন্দ্রিলা চিত্তে প্রচণ্ডে হুতাশে
চির দীপ্ত চিতা যথা!—ব্রহ্মাণ্ড ঘুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা। উন্মাদিনী এবে।"

কবি চরিত্রটির উপর যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহাতে এইরূপ একটি লাইনে তাহার পরিণতিকে সংক্ষিপ্ত করা স্বাভাবিক কলা-কৌশলের দিক দিয়া ঠিক হয় নাই। এই শ্রেণীর চরিত্রের পরিণতি-ই বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু ঐন্দ্রিলার পরিণতি-চিত্র এ কাব্যে নাই; তাহার পরিণতি-অংশ যদি কবি বৃত্র-সংহার কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যকবোধে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তখনই আমরা প্রশ্ন করিব যে পূর্ব্বে এই চরিত্রের এরূপ প্রাধান্য কবি কেন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন? তবে এ কথা ঠিকই ঐন্দ্রিলা-চরিত্রকে কবি যে আদর্শে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন তাহার জন্য একখানি স্বতন্ত্র কাব্য-রচনার প্রয়োজন ছিল।

কবি সব ক্ষেত্রে ঐন্দ্রিলা-চরিত্রের গৌরবও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। যাহার স্বামী স্বর্গজয়ী, সমগ্র দেবকুল যাহার স্বামীর প্রতাপে ভীত কম্পিত, তাহার ঈর্ষাও ঠিক সাধারণ মানুষের মত নয়। সে ঈর্ষার মধ্যেও একটা মহাকাব্যোচিত গৌরব থাকা উচিত ছিল। কিন্তু শচীর প্রতি ঐন্দ্রিলার ঈর্ষা-কলহ যেন বাঙ্গালী ঘরের ননদ-ভ্রাতৃবধূর ঝগড়া-কলহের নীচু স্তরে নামিয়া আসিয়াছে এবং শচী-ঐন্দ্রিলার এই উপকাহিনীটি মহাকাব্যের কঠিন ভূ-

সংস্থানের মধ্যে একটা জলাজমির মত অযথা অনেকটা জায়গা অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আবার বৃত্র শিবের ক্রোধাগ্নিতে ভীত হইয়া শচীকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ দিলে ঐন্দ্রিলার আচরণ সাধারণ পাঠকের রুচিকেও পীড়িত করে। ষোড়শ সর্গে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার সেই রুচিবিগর্হিত আচরণের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়াছেন। শচীকে ফিরাইয়া দিবার প্রস্তাব হইতে স্বামীকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া ঐন্দ্রিলা মদন-সহায়তায়, মাদকতাপূর্ণ অঙ্গসজ্জায় এবং বিলাসকলাদ্বারা যুদ্ধ-প্রত্যাগত স্বামীর চিত্ত বশ করিতে চেষ্টা করিল। রুদ্রপীড়ের ন্যায় দেবজয়ী পুত্র যাহার, ইন্দুবালার ন্যায় সাধ্বী পুত্রবধূ যাহার অন্তঃপুর উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহার পক্ষে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেমভক্তিতে নয়, রণক্লান্ত স্বামীর শ্রম অপনোদন করিবার জন্য নয়, কূট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এই বারাঙ্গনা সজ্জা, এই মদিরবিহ্বল প্রণয়সম্ভাষণ, এই কুটিল প্রেমাভিনয় অত্যন্ত অমর্য্যাদাকর।

ঐন্দ্রিলার সমস্ত ছলাকলা-বিলাস-বিভ্রম ব্যর্থ হইল। কিন্তু সে সর্ব্বপ্রকার পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। তাই এই প্রেম-চিত্র উপসংহারের ভার মদনের উপর—

"অব্যর্থ-সন্ধান! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ পরাণ
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানবকামিনী
লাবণ্যরাশি।"

এই কুৎসিত প্রেম-চিত্র অঙ্কনে যে কবির সৌন্দর্য্যবোধ পীড়িত হয় না, তিনি মহাকবি হইলেও তাঁহার রুচি প্রশংসনীয় নয়। ঐন্দ্রিলার পার্শ্বে প্রভাত-আকাশের ম্লান-পাণ্ডুর শুকতারাটির ন্যায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের একটি চরিত্র মনে পড়ে। তাহারও ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ পুত্র, প্রমীলা পুত্রবধূ, দুর্জ্জয় রাবণ স্বামী। কিন্তু স্বর্ণলঙ্কার কোন্ কক্ষের কোন্ গবাক্ষ হইতে তাহার অশ্রুস্রোত সাগরতরঙ্গে গিয়া মিশিতেছে, তাহা আমরা জানি না। মাত্র কয়েকবার সে শোকধৌত রক্তহীন পাণ্ডুর মুখচ্ছবি আমরা দেখিতে পাই, সে চির-মাতৃত্বের গৌরবে, স্নেহে কল্যাণে প্রেমে ভক্তিতে দেবী-প্রতিমারূপে তখনই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়।

ইন্দুবালার ন্যায় একটি চরিত্র এই শ্রেণীর কাব্যে অত্যন্ত বেমানান হইয়াছে।

যুদ্ধের ঘনঘটা ও বীরত্ব-আড়ম্বরের মধ্যে ইন্দুবালা নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া কাহিনী প্রবাহের এক তটপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সুতরাং প্রমীলা-মেঘনাদের প্রেম যেরূপ মাধুর্য্য ও বীর্য্যের সমবায়ে কাব্যে অপরূপ মহিমা লাভ করিয়াছে, ইন্দুবালা-রুদ্রপীড়ের প্রেম সেরূপ মহিমা লাভ করে নাই। কাব্যে ইন্দুবালার প্রকাশ অত্যন্ত কুণ্ঠিত। শচীর সহিত তাহার মধুর সম্পর্কটির উপরও ঐন্দ্রিলার রোষ-বহ্নি পতিত হইয়া তাহা ঐন্দ্রিলার দৃপ্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট সহায়ক রূপে ব্যাহত হইয়াছে। এবং ইন্দুবালা নীরবে সমস্ত ভৎ'সনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া কাব্যে একটা passive চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে। কবি কয়েকটি সর্গে অনর্থক এইরূপ একটি passive চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়া কাব্য-ভূমিতে স্থানের অপচয় করিয়াছেন। ইন্দুবালার মধ্যে কবি শচীর প্রতি সহানুভূতিশীলতার ভাবটি কোন্ গূঢ় কারণে ফুটাইয়া তুলতে চাহিয়াছেন তাহা বোঝা শক্ত। হয়ত ইহাদ্বারা ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতাযুদ্ধের বাষ্পাবেগে উত্তপ্ত কাব্যভূমির মধ্যে সরলতা ও শান্তির প্রস্রবণ আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, হয়ত ঐন্দ্রিলার দৃপ্ত চরিত্রের পার্শ্বে ইন্দুবালার সরল কুসুম-পেলব চরিত্রটিকে পাশাপাশি রাখিয়া উভয়ের পার্থক্যটি সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। কিন্তু কবির এই উদ্দেশ্য কাব্যের ঔচিত্যবোধকে কিছু পরিমাণ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সরমা অশোক কাননে সীতার পদতলে তুলসীর মূলে স্বর্ণ দেউটির প্রায় ছিলেন, কিন্তু সরমা রাবণ-অন্তঃপুর-লক্ষ্মী হইয়াও যে-সীতার দুঃখে দুঃখী হইয়াছিলেন তাহা কাব্যের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ করে না। কারণ সরমা রাম-ভক্ত বিভীষণের স্ত্রী। স্বামী রাম অনুগত, স্ত্রী সীতা অনুগত—এইভাবে বিভীষণ সরমা তাহাদের চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে সমগ্র লঙ্কাবাসীর নিকট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া সরমা চরিত্রে কবি এমন একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা দিয়াছেন যে সরমা যেন নিজের আদর্শনানুযায়ী নিজের পথ করিয়া লইতে পারে। ইন্দুবালার সে বৈশিষ্ট্য নাই, তাহার স্বামী রুদ্রপীড়ও দেব-বিপক্ষে, দেবযুদ্ধে অক্ষয় যশঃকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাহার অভিপ্রায়। সুতরাং স্বামীর আদর্শের প্রভাবে ইন্দুবালার চরিত্রের এই ভক্তি ও সরলতার দিকটি গড়িয়া উঠিয়াছে এমন মনে করা যায় না। আবার ইন্দুবালা চরিত্র এমন-ই ব্রীড়াসঙ্কুচিত ও আত্মসংবৃত যে নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলিবার পথ নিজে সৃষ্টি করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে ব্রততীর ন্যায়, আশ্রয়শূন্য হইয়া বাঁচিতে পারে না। সুতরাং তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি কোথা হইতে সে লাভ করিল, কেমন করিয়া শচী-ভক্তি তাহার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা

রহস্যাবৃত থাকে। আরও একটি কথা এই, দেবজয়ী স্বামী, স্বর্গবিজয়ী শ্বশুর ও দেবদ্বেষী শাশুড়ী—এই পরিবেশের মধ্যে ইন্দুবালার মধ্যেও আমরা দৈত্য ঘরণীর উপযুক্ত তেজ, দীপ্তি ও দার্ঢ্য দেখিবার প্রত্যাশা করি। হেমচন্দ্র দৈত্য অন্তঃপুরে বৈষ্ণবী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কাব্যের ঔচিত্যবোধ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

শচী চরিত্রও অপরিস্ফুট, passive। ঐন্দ্রিলা চরিত্রের রূপটি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কবি যেন শচীকে পটভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যে কোন চরিত্রকে এরূপ পটভূমিকার অমর্য্যাদা দিলে মূল কাব্যের পক্ষে তাহা অপকর্ষের কারণ হয়। যদি পটভূমিকার প্রয়োজন থাকে, কৌশলে সে পটভূমিকাকে নেপথ্যে রাখিতে হয়। রাবণের সুবিস্তৃত বক্ষপটে একটির পর একটি মৃত্যুবাণ আসিয়া আঘাত করিয়াছে আমরা দেখি। কিন্তু কোথা হইতে সে বাণ আসিতেছে, কে নিক্ষেপ করিতেছে তাহা আমরা জানি না। কবি কৌশলে তাহা কাব্য-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে রাখিয়াছেন। কাব্যে প্রত্যক্ষ রঙ্গ-মঞ্চের যেমন প্রয়োজন, একটি গোপন নেপথ্যলোকও তেমনি প্রয়োজন। রঙ্গ-মঞ্চের আলো, নেপথ্যের ছায়া, এই আলো-ছায়ার লীলায় কাব্যের রসপূর্ণতা। হেমচন্দ্র কাব্যের কোন ঘটনা, কোন চরিত্র, কোন ভাবকেই নেপথ্যে রাখিতে সাহস করেন নাই, পাছে দর্শকের দৃষ্টিতে না পড়ে। তাই বলা যায়, মধুসূদন কাব্য লিখিয়াছিলেন বিদগ্ধ রসিকের জন্য, সেই কারণে কাব্যের অনেক কিছু রস-প্রমাতাদের উপলব্ধির উপর তিনি ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র যেন যাত্রার আসরের শ্রোতাদের কাছে রস নিবেদন করিয়াছেন, তাই নেপথ্যলোকের আবরণ রাখিয়া কোন কিছু গোপন করিবার সাহস তাঁহার নাই।

বৃত্র-সংহারের বর্ণনাংশের স্থানে স্থানে গৌরব আছে; কিন্তু কোন একটি চরিত্রে গৌরব-সমুন্নতি নাই। এই কাব্যে যেখানে কবি প্রেম-হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কবির অক্ষমতার জন্যই তাহা যেমন কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি বাংলা যাত্রা-নাটকের হৃদয়ভাবের ন্যায় তাহা অতি স্থূল ও লৌকিক পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। শচীর পুত্রবাৎসল্য, ইন্দুবালার পতিপ্রেম, বৃত্রের শক্তি, ঐন্দ্রিলার দর্প-দম্ভ সমস্তই যেন অবিশুদ্ধ, কৃত্রিম এ অগৌরবসূচক।

হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতি বৃত্র-সংহার কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এ-কাব্য হেমচন্দ্রের প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশ-পথ হইতে বিক্ষিপ্ত। চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্যে যে প্রতিভার পূর্ব্ব সূচনা, পরবর্ত্তীকালের দশমহাবিদ্যা ও খণ্ড কবিতাগুলিতেই তাহার পরিণতি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হেমচন্দ্রের দশমহা-বিদ্যা ও খণ্ডকবিতাগুলি আলোচনা করা সম্ভবপর হইল না। তবে এই আলোচনা হইতে এটুকু প্রমাণিত হইয়াছে যে বৃত্র-সংহার হেমচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয়জ্ঞাপক নয়। বাংলা কাব্যের রসভাণ্ডারে হেমচন্দ্র যদি কোন রসের যোগান দিয়া থাকেন তবে তাহা অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে, বৃত্র-সংহারে নয়।

নবীনচন্দ্র সেন

॥ ১ ॥

আধুনিক বাংলা কাবের প্রথম পর্ব্বের শেষ কবি নবীনচন্দ্র সেন। কাল-বিচারে রবীন্দ্রনাথের কিছু অংশ এই পর্ব্বেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে কাল-পরিমাপ অপেক্ষা রস ও রুচির পরিমাপের গুরুত্বই অধিক এবং সে-বিচারে রবীন্দ্রনাথকে দিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বভূমিকা প্রথম পর্ব্বের কবি বিহারীলালের কবিতায়। প্রথম পর্ব্বের বহু কবির বিচিত্র প্রকার কাব্যসাধনার মধ্যে বিহারীলাল যে কাব্য-বীজটি উপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন, বাংলা কাব্য-ভূমির পোষকতা-আনুকূল্যে সেই বীজটি দ্বিতীয় পর্ব্বে রবীন্দ্রকাব্যে বিচিত্র শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই প্রথম পর্ব্বকে যদি সূচনা বলি, দ্বিতীয় পর্ব্বকে তাহা হইলে বিকাশ বলিতে হইবে। উনবিংশ শতকের প্রায় অধিকাংশ কবির মধ্যে এই সূচনা ও ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, এই পর্ব্বের কবিদের ইহা একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব। নবীনচন্দ্রের কাব্যেও এই প্রকারের একটি ইঙ্গিত আছে, ইহাকে বলিতে পারি—সমন্বয়ের ইঙ্গিত।

প্রথমে এই সমন্বয়ের ইঙ্গিতটি বুঝিয়া লইতে হইবে। সমন্বয় বলিয়াছি এই অর্থে যে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে সমাজ-মানসকে কেন্দ্র-সংহত করিবার জন্য বাঙালীর প্রাণশক্তি যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে নবীনচন্দ্রের যুগে জাতি-চিত্তের সেই

কেন্দ্র-সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু মত ও পথ, বহু বিরোধী প্রবৃত্তি ও ভাবের সংঘাত যেন এক ব্যাপক সামঞ্জস্য-সমন্বয় সূত্রে বিধৃত হইয়া এই যুগটিকে (১৮৭০-১৯০০) পূর্ণ ভাবস্থিরতা দান করিয়াছে। অবশ্য নবীনচন্দ্রের কাব্যের মাধ্যমেই যে এই সমন্বয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন মনে করিলে ভুল হইবে। বরং ইহার বিপরীতটি-ই সত্য। নবীনচন্দ্র এই সমন্বয়-যুগের সমকালীন বলিয়া তাঁহার কাব্যে সমাজ-মানসের মিলনাদর্শ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৮৭০-১৯০০—এই যুগটিকে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানযুগ বলা হইয়া থাকে। আবার এইটিকে সমন্বয় যুগও বলা যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়-যুগের প্রতিনিধি নবীনচন্দ্র, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটকে গিরিশচন্দ্র। কাব্য-নাটক-উপন্যাস—সাহিত্যের ত্রিধারায় এই সমন্বয়-যুগ বিশেষভাবে প্রতিফলিত। এই সমন্বয়ের পূর্ণতা—রবীন্দ্রনাথে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সংঘর্ষের প্রথম প্রকাশ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টার মধ্যে। কিন্তু সে সংঘর্ষ তখন বাহ্য আচার-ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত। স্পষ্ট অনুমান করিতে পারি বাহিরের মৃদু হাওয়ায় শান্ত জীবন-হ্রদে কেবলমাত্র ঈষৎ চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। আর এই চাঞ্চল্য ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতায় কিছু হাসিতে, কিছু অশ্রুতে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনের মর্ম্মে গিয়া পৌছায় নাই। এই বাহ্য সংঘর্ষ মধুসূদনের কাব্যে এক গভীরতম ভাব-সংঘর্ষরূপে প্রকাশিত। মধুসূদনের কাব্যে এই সংঘাতের প্রকারও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—তখন আত্মরক্ষা নয়, আত্মসম্প্রসারণ। প্রাচীনের কষ্টিপাথরে নবীনের ঔজ্জ্বল্য পরীক্ষা নয়, নবীনকে আহ্বান। নবীন প্রাণ-চাঞ্চল্যে প্রাচীন প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কারের কারাপ্রাচীর উন্মোচন। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্যে এই বিরোধের চিত্র তেমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তথাপি তাঁহারা বিরোধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করিয়া দেশ-ব্রতে আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া, জাতি-চিত্তকে প্রাচীন জড়তা-নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে উপস্থিত হইবার জন্য ডাক দিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্য-পাঞ্চজন্যের কর্ত্তব্য-আহ্বানে দেশবাসী সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে এই বিরোধের চিত্র এমন তীব্র ও ভয়াবহ যে অনুমান করিতে পারি এই সংঘাতের প্রবল বাত্যাবিক্ষোভের পর সমন্বয়ের স্তব্ধতা অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সংশয়-দ্বিধা-অবিশ্বাসের

দংশন-জ্বালা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। আশ্রয়-ভূমি ভাঙ্গিয়া নূতন আশ্রয়-ভূমি গড়িয়া তুলিতে হয়। তাই সংঘর্ষযুগের পর বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা-ভূমি গড়িয়া তুলিলেন। ইহাদের সাহিত্য-সাধনায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, জাতি-চরিত্র বিরোধী তরঙ্গের আবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া শান্ত নিস্তরঙ্গ প্রবাহে যথার্থই উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। জাতি-চরিত্র যেন কিছু আত্মস্থ হইতে পারিয়াছে। প্রতিকূল পরিবেশ, সংশয়, দ্বিধার চোরাবালি পার হইয়া আমরা যেন পদস্থাপনের ভূমিটুকুর উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছি। তাই এখন সংস্কার নয়, গঠন। বর্ত্তমানের সঙ্গে বিরোধ নয়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। মানুষ বর্ত্তমানের সমস্যা অতিক্রম করিতে পারিলে তবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিতে পারে। সংস্কার-যুগ বা প্রস্তুতি-যুগের অবসানে এখন হইতে প্রকৃতই গঠন-পরিকল্পনা যুগের শুরু।

বাংলার সমাজ-জীবনে এই সময় একটা সামঞ্জস্য-সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া এই পর্ব্বের সাহিত্যেও গঠন-পরিকল্পনা-শক্তি জয়ী হইতে পারিয়াছিল। সুতরাং সমাজ-জীবনের এই সমন্বয় আদর্শটিকেও বুঝিয়া লইতে হইবে। সমন্বয় অর্থে দুই বা ততোধিক শক্তির মিলন। উনবিংশ শতাব্দীর এই অর্দ্ধে সমাজের বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে একটা ভাব-সামঞ্জস্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অন্যত্র উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনে তিনটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করিয়াছি—(১)—রামমোহন রায়ের সংস্কার ধারা, (২) রাধাকান্ত দেবের সংরক্ষণ ধারা, (৩) ডিরোজিওর 'ইয়ং বেঙ্গল' ধারা। ইহার সহিত আর একটি চতুর্থ ধারা যুক্ত করিতে হইবে—খ্রীষ্টান মিশনারী ধারা।

ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্যদের ধারা পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত প্রবহমান থাকিতে পারে নাই। ডিরোজিওর অকালমৃত্যুতে এই ধারায় একটা আকস্মিক ছেদ-চিহ্ন পড়িল। তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোন দীর্ঘস্থায়ী ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। 'ইয়ং-বেঙ্গল'-গোষ্ঠীর উগ্র ব্যক্তি-সচেতনতা ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি সংস্কার-যুগের বহু দুর্জ্জয় বাধা অপসারিত করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেও তাহারা কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।

অপর দুইটি ধারা প্রচ্ছন্ন প্রকাশ্যভাবে বহিয়া আসিয়া ১৮৭৫-১৯০০— এই যুগে একটা অনায়াস সমন্বয় লাভ করিয়াছে। যে চতুর্থ ধারাটির উল্লেখ করিয়াছি সেই ধারাটির প্রতিঘাত রামমোহনের অনুবর্ত্তী দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বিরোধী-পক্ষ রাধাকান্ত দেবকে একবার সাময়িকভাবে একত্রিত করিয়াছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হিন্দু-বিরোধী প্রচারকার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া রক্ষণশীল-প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাদ্রীরা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া সেই বিদ্যালয়গুলিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিতেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই কার্য্যের তীব্র বিরুদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়। ওই আন্দোলনের পুরোধারায় ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সময় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব আনা হয় ও এই উপলক্ষে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল Hindu Charitable Institution —এই নামে। বহিঃশক্তির অভিঘাতে এই প্রথমবার ভিতরের দুই শক্তি মিলিত হইল; পরে এই দুই শক্তির সংযোগ আরও দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাই বাংলার সামাজিক সমন্বয়-যুগ।

রামমোহনের আদর্শ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের পরিপোষণায় এবং তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার আশ্রয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রবহমান ছিল। পরে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধিতায় সেই আদর্শ দুইটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একদিকে হইল দেবেন্দ্রনাথের 'আদি সমাজ'; আর একদিকে কেশবচন্দ্রের 'নববিধান'। আবার, রাধাকান্ত দেবের 'ধর্ম্মসভার' আদর্শ সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও জাতীয় সভার মধ্যেই বাঁচিয়া ছিল। ইহার সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। জাতীয় সভার পুরোধায় ছিলেন নবগোপাল মিত্র। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ-পদ্ধতি লইয়া কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' সমাজের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের আদি সমাজ, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা এবং জাতীয় সভা একত্র তুমুল আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইল। এই উপলক্ষে জাতীয় সভার উদ্যোগে 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। বক্তা হইলেন আদি সমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু, সভাপতি হইলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বক্তৃতাই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের শুভ সূচনা। রাজনারায়ণ বসুর এই বক্তৃতাই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জনচিত্তকে সচেতন করিয়া তুলিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশে লিখিলেন, "নির্ব্বাণোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মকে রাজনারায়ণ বসু রক্ষা করিয়াছেন"। 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী'-সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর রাজনারায়ণ বসুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। এইভাবে রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতাকে আশ্রয় করিয়া তখনকার বিরোধী দলগুলি একটা সামঞ্জস্য-মীমাংসার মধ্যে আসিয়া মিলিত হইতে পারিয়াছিল। এই মিলন সম্পূর্ণ হইয়াছে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রতীক রামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্য বিবেকানন্দ; সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্ম্মের ও সমাজের সঙ্কট মুহূর্ত্ত যখন অপসারিত হইল তখন ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে যুক্ত করিয়া বাঙ্গালী এক নূতনতর জীবন-সাধনায় ব্রতী হইয়া তাহার প্রাণশক্তিকে এক ভিন্নপথে পরিচালিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় সে ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।

নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সমন্বয় কেমনভাবে হইয়াছে, নারী ও পুরুষের কর্ত্তব্য কিভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, মানুষের চরম লক্ষ্য ও আদর্শ কিভাবে স্থির করা হইয়াছে এবং ইঁহাদের সাহিত্যে যে জীবনাদর্শ রূপায়িত হইয়াছে সেই আদর্শ বিবেকানন্দের ধর্ম্ম ও আদর্শের সহিত সুসংবদ্ধ হইয়া সে যুগের সাহিত্য ও ধর্ম্মসাধনা কেমন পরস্পরের পরিপূরক এক অখণ্ড সমন্বয় লাভ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। তবে নবীনন্দ্রের কাব্যপাঠের পূর্ব্বে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে নবীনচন্দ্রের কাব্যের কৃষ্ণ ও সুভদ্রা যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহা উনবিংশ শতকের সমন্বয়-যুগেরই আদর্শ। রাবণের মধ্যে আছে সংশয়-দ্বিধা ও বিরোধ। কৃষ্ণ-সুভদ্রার মধ্যে আছে গঠন-পরিকল্পনা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

বর্ত্তমান পর্য্যায়ের আলোচনাগুলিতে যুগ ও সমাজ-পটভূমিকা অপেক্ষা কাব্যের রসবিচারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র-পটভূমির যে সামান্য পরিচয়-জ্ঞানটুকু না থাকিলে কাব্যের রস-বিচারে বাধা সৃষ্টি হইতে পারে কেবলমাত্র সেই সাধারণ পরিচয়-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রাসঙ্গিক ভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে যুগ-পটভূমি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং নবীনচন্দ্রের কাব্যের পটভূমিকার বিস্তৃত বিশ্লেষণ বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্যের বহির্ভূত। নবীনচন্দ্রের কাব্যের রস-বিচারের উপরই বেশি গুরুত্ব দিবার চেষ্টা করা যাইবে।

'এডুকেশন গেজেট'-এ কয়েকটি খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইলে নবীনচন্দ্রের প্রতি কাহারও কাহারও সপ্রশংস-দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ কবি-জীবনের সাফল্য সম্বন্ধেও কেহ কেহ সুউচ্চ আশা পোষণ করিয়াছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হইলে সে আশা পূর্ণ হইল। পলাশীর যুদ্ধ বোধ হয় এখনও পর্য্যন্ত নবীনচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা আদৃত কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই কাব্য-ত্রয়ীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনখানি কাব্যকেই কবি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি মর্য্যাদা দিতেন এবং বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই তিনখানি কাব্যের গুরুত্বই অধিক। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই কাব্য তিনখানি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা করা যাইবে। নবীনচন্দ্রের কাব্যমালা সংখ্যায় এত বেশি যে তাহাদের প্রত্যেকখানি সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে না।

এই কাব্য তিনখানির রচনার প্রেরণা সম্বন্ধে কবি তাঁহার আত্মচরিত গ্রন্থে যে তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, সেটি লক্ষণীয়। "আমি ঘোরতর বিপন্ন হইয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্রে বদলী না হইলে আমার সেই যৌবন-সুলভ বিলাস-বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তের পবিত্র ছায়া পতিত হইত না; আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না।... সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল।...'বঙ্গ দর্শন' একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বিসমার্ক, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে রাজগিরি শিবিরে বসিয়া মহাভারত পড়িতে পড়িতে আমার প্রথম ধারণা হইল যে মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য (stupendous epic) নহে, উহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য।...তখন দুটি মহামূর্ত্তি আমার হৃদয়াকাশে পূর্ণিমা সন্ধ্যার পূর্ণচন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ।...আমি এই দুই মহামূর্ত্তি দেখিলাম এবং ভক্তিতে অধীর হইয়া তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণত হইলাম। একদিকে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস এবং অন্যদিকে অমিতাভ অঙ্কুরিত হইল।"—(আমার জীবন)

এই কাব্য-ত্রয়ীর বিষয়-পরিকল্পনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কবির দীর্ঘ

পত্রালাপ হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রস্তাবনা (Plot) দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি বিষয়ে ইতিহাসের প্রতিকূলতা করিবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। প্রথমত, কবি শ্রীকৃষ্ণকে religious, reformer (ধর্ম্মসংস্কারক) এবং মহাভারত (The Great Indian Empire)-স্থাপক বলিয়া তাঁহাকে new character দিতেছেন। দ্বিতীয়ত, ইহা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাবে অসত্য যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-শক্তির বিরোধী ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা অনার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতিবাদের উত্তরে কবি যাহা লিখিয়াছিলেন দীর্ঘ হইলেও তাহা উদ্ধারযোগ্য—"যদি ধর্ম্মসংস্কার বা ধর্ম্মসংস্থাপন এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল না, তবে তাঁহার লক্ষ্য কি ছিল? ভাগবতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ঘোরতর কর্ম্মবাদ স্থাপন করেন। ইহার অর্থ যদি ধর্ম্মসংস্কার না হয়, তবে কি? কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের সমর্থনকারী হইলে ভাগবতের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধার্ত্ত কিশোর কৃষ্ণকে একমুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষা দেন নাই কেন? কৃষ্ণসখা বনবাসী পাণ্ডবদের দুর্ব্বাসা ঋষির সশিষ্য জব্দ করিতে যাওয়ার এবং কৃষ্ণের শাক্-ভোজনে তাঁহার পরাভবের অর্থ কি? ভৃগুমুনির কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিবার অর্থ কি? পাণ্ডবদের পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা পর্য্যন্ত নিষ্ফল করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটাইয়া ভারত নিক্ষত্রিয় করিল কে? কর্ণ! কর্ণ কে? দুর্ব্বাসার মন্ত্রজাত কুন্তীর কানীন পুত্র। এই মন্ত্রজাত পুত্রের অর্থ কি? সূর্য্য কি মানুষের গর্ভে এরূপ পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন? ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুরদের অভিশাপে ক্ষত্রিয়াবশিষ্ট কৃষ্ণের বংশের ধ্বংসের এবং দুর্ব্বাসার অভিশাপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুর অর্থ কি? মুষলের ও দুর্ব্বাসার পায়সের গল্প কি বঙ্কিমবাবু বিশ্বাস করেন? আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃষ্ণের অপমৃত্যু ঘটাইল কে? অনার্য্য জরাব্যাধ। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের ফলভোগ হইল কেন?—আবার অনার্য্য ব্যাধেরা যাদবদের সর্ব্বস্ব, এমন কি রমণীদের পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল কেন? তাহার পর ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতকে হত্যা করিল কে?—তক্ষক। তক্ষক কি সর্প না অনার্য্য নাগপতি তক্ষক? অনার্য্য তক্ষক পরীক্ষিতকে হত্যা করিলেন কেন? তাহাও আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে। এইরূপে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের অভিশাপ কার্য্যে পরিণত করিবার অস্ত্র—অনার্য্য। ইহার কারণ কি? সর্ব্বশেষে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের অর্থ কি সাপ পোড়ানো, না পিতৃহন্তা নাগজাতির সঙ্গে রাজ্যোদ্ধারার্থ যুদ্ধ? এই যুদ্ধে নাগজাতিকে কে কে রক্ষা করিয়াছেন?—আস্তিক। আস্তিক কে?

ব্রাহ্মণ জরৎকারু ঋষির পুত্র। তাহার মাতা কে?—অনার্য্য নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী জরৎকারু। ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুর তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি কি সাপ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সাপের গর্ভে মানুষ আস্তিক জন্মিয়াছিল? এবংবিধ ঘটনাবলীর অর্থ কি এই নহে যে দুর্ব্বাসা প্রমুখ এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন এবং অনার্য্য-জাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার বংশের এবং ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন? দুর্ব্বাসা যে কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন, বঙ্কিমবাবু এ কথা পরে কৃষ্ণচরিত্রে স্বীকার করিয়াছেন —যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রকম-সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন।”—(আমার জীবন)

নবীনচন্দ্র এইভাবে মহাভারতের ঘটনাবলীর মধ্য হইতে যে এক নূতন তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা কবির মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়। কিন্তু স্বভাবতই এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ মতবাদও থাকিতে পারে, কিন্তু অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ঘটনা ও কাহিনী বিচার করিয়া নবীনচন্দ্রের এই ব্যাখ্যার যুক্তিযুক্ততা বিচার করা বর্ত্তমান আলোচনায় একপ্রকার অসম্ভব এবং কাব্য-বিচার প্রসঙ্গে সেরূপ ঐতিহাসিক বিচারের প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না। মধুসূদনও রামায়ণের রাম-রাবণ চরিত্রকে এক নূতন ভাবালোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি-মন দিয়া রামায়ণের রাবণ চরিত্রকে তিনি যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন মূল রামায়ণের মধ্যে সে ভাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্য-ত্রয়ীতে মহাভারতের কোন ভ্রান্ত ব্যাখ্যাও যদি উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, কাব্য-রসিকের দৃষ্টিতে গুরুতর ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই ব্যাখ্যা কাব্যের মধ্যে কতটা সত্য হইয়া উঠিতে পারিয়াছে—সেইটিই প্রধান বিচার্য্য।

বিস্তৃত মহাভারত মহাকাব্যকে মন্থন করিয়া নবীনচন্দ্র যে ভাব-নির্য্যাস সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি এই তিনখানি কাব্যের মধ্যে সংহত করিয়া আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। কাব্য-ত্রয়ীর মধ্যে নবীনচন্দ্র মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণের আদর্শ এবং সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের স্তরপরম্পরা অদ্ভুত মৌলিকত্বের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মহাভারতের ন্যায় বিশাল মহাকাব্যের বিচিত্র ঘটনা ও অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ের মধ্য হইতে তিনি আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়া এই কাব্যের যে মৌলিক তাৎপর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই তাৎপর্য্যকে যেভাবে কাব্যের রাজবেশ পরাইয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে মহাভারতের নূতন ব্যাখ্যা ও সেই ব্যাখ্যার অনুকূল যুক্তিপরম্পরা উপস্থাপন এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনার অন্তর্নিহিত মূল ভাবসত্যটি আবিষ্কারের দিকে কবি এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে এই কাব্য-ত্রয়ী যেন একটি ছন্দোবদ্ধ প্রবন্ধের রূপ লাভ করিয়াছে। কাব্য তিনখানি পাঠ করিবার পর এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে নব মানবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থিরূপে কিভাবে মহাভারতের সমগ্র ঘটনাকে কেন্দ্র-সংহত করিয়াছিলেন, সেই সূত্রটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই এই কাব্য-ত্রয়ী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। ইহাকে ঠিক বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা বলা যায় না। যে রাবণ-চরিত্র মধুসূদনের কবি-চিত্তের করুণাবারিতে অভিসিঞ্চিত হইয়াছে সে-রাবণ মধুসূদনের কল্পনায়ও সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদনের কল্পলোকের রাবণ বাল্মীকির কাব্যের রাবণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই মধুসূদন রামায়ণের অনুসরণ না করিয়া নূতন-ভাবে তাঁহার কাব্যের গঠন-রীতি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে তিনি মূল ঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া তাঁহার কল্প-লোকের রাবণকে রূপ দিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণ-চরিত্রও যদি নবীনচন্দ্রের কবি-চিত্তকে যথার্থই অনুপ্রাণিত করিতে পারিত, মহাভারতের কৃষ্ণ ও তাঁহার নব মানবধর্ম্ম যদি নবীনচন্দ্রের বুদ্ধিতে নয়, কল্পনায় অনুভূতিতে সত্য হইয়া উঠিত, তাহা হইলে তিনি মহাভারতের ঘটনার কেবল ভাষ্য রচনা না করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার কল্পলোকবাসী কৃষ্ণকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র যেভাবে মহাভারতের ঘটনাগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-চরিত্রের আদর্শ

প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রবন্ধকারের রীতি হইতে পারে, কবির রীতি নয়। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি যে কৃষ্ণ-চরিত্রের আদর্শ নবীনচন্দ্রের বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিলেও ইহা তাঁহার কবি-চিত্তকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। অথবা ইহাও হইতে পারে যে কৃষ্ণ-চরিত্রের এই নূতন ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে পারিয়া তাঁহার মন এত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে কাব্যের গঠন-কৌশলের প্রতি উদাসীন থাকিয়া এই নব-ব্যাখ্যাকে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য করিয়া তুলিবার দিকেই তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, যে গভীর ধ্যানলোক হইতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্ম, সে গভীরতা হইতে নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ী উৎসারিত নয়। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসকে তাই মৌলিক সৃষ্টি না বলিয়া 'the historical narration of the original creation' বলা যাইতে পারে।

কাব্য-ত্রয়ীর পরিকল্পনা বিশাল। এই বিশালতা-ই ইহার একটি মৌলিক ত্রুটি। মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ মহাকাব্যের ঘটনারাজির ভূমিকায় কৃষ্ণ-চরিত্রের তিনটি লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যেন দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। মহাকাব্যের বিশাল পরিধির মধ্যে যে চরিত্রটি বিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে, সে চরিত্রটি এত জটিল ও ব্যাপক ঘটনাচক্রের সহিত সংশ্লিষ্ট যে, আধুনিক যুগের কোন কাব্যের মধ্যে তাহার সমগ্র জীবন-বৃত্তটি অঙ্কিত করা সম্ভব হইতে পারে না। তাই কবি কৃষ্ণের জীবনের কোন খণ্ডাংশের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া সেই আলোকে যদি তাঁহার জীবনের দূরতম পরিধি আভাসে-ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কবির চেষ্টা কিছু পরিমাণে সফল হইতে পারিত। কৃষ্ণের দীর্ঘ জীবন বৃত্তটিকে কাব্যের বিষয়রূপে নির্ব্বাচন করায় কাব্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, গভীরতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বিশাল পরিকল্পনায় ব্যাপকতা ও গভীরতা দুইটি দিক-ই সমানভাবে রক্ষা করিতে গেলে যেভাবে ঘটনা-সমাবেশ ও চরিত্র-সৃষ্টি করিতে হয় আধুনিক যুগের মহাকাব্যে বা আখ্যায়িকা-কাব্যে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। তাই কাব্যের গভীরতার দিকটি উপেক্ষা করিয়া কবি কেবল পরিকল্পনার ব্যাপকতার দিকটির উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন। হয়ত কবির আশা ছিল কাব্যের রূপায়ণে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও পরিকল্পনার বিশালতা ও মৌলিকত্বের জন্যই সেগুলি উপেক্ষিত হইতে পারিবে। কিন্তু ত্রুটিগুলি এমন-ই মারাত্মক যে কাব্য-ত্রয়ীর স্থানে স্থানে

সহজ কবিত্বের প্রকাশ থাকিলেও রূপায়ণ-ত্রুটির জন্য সমগ্রভাবে কাব্য তিনখান শ্রেষ্ঠ কাব্যের গৌরব দাবী করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে কাব্যরূপে না হউক, মহাভারতের মৌলিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার জন্য ইহার একটা অনন্যসাধারণ গুরুত্ব চিরদিন স্বীকৃত হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে প্রবন্ধকার তৃপ্ত হইলেও, কবি তৃপ্ত হইতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-ত্রয়ীর পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া এইরূপ বিশাল পরিকল্পনাকে কাব্যে রূপায়িত করা কিরূপ দুরূহ হইবে সে বিষয়ে কবিকে সতর্ক করিয়াছিলেন—"You have planned a new 'Mahabharata' indeed—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্ম রামায়ণ। It is nothing against the plan that is ambitions. Provided that you execute with some grandeur as you have planned, you will perfectly justify yourself. Properly executed, the poerty will of course take its rank as the greatest in the language···I warn you, however, not to be too confident of success; of popularity. I can not promise you much. If executed adequately, many will properly consider it as the Mahabharat of the Nineteenth century···the old Mahabharat is so grand and has such a deep hold on your readers that only first class execution can make the new acceptable to them."

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সতর্কবাণী হইতে এ কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে নবীনচন্দ্রকে প্রাচীন মহাভারত মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য-গৌরবের সহিত সমকক্ষতা করিয়া তাঁহার কাব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রকৃতই নবীনচন্দ্র মহাভারতকারের সমকক্ষতা অর্জ্জন করিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। কারণ মহাভারত কাহিনীর অংশ লইয়া নূতনভাবে একখানি কাব্যরচনা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, তাঁহার ইচ্ছা মহাভারতের উপাদান লইয়া নূতন রীতিতে আর একখানি কাব্য রচনা করা। সে কাজ যে কিরূপ অসম্ভব বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবেই তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্কবাণী বুঝিতে পারিলে নবীনচন্দ্র এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। যাহা হউক, নবীনচন্দ্র তাঁহার আরব্ধ ব্রতের দুরূহতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কাব্যের execution-এর

প্রতি উদাসীন থাকিয়া conception-এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহার ফলে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ছন্দোবদ্ধ মহাভারত-ভাষ্য হইয়া উঠিয়াছে, শ্রেষ্ঠ কাব্যের গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং যে রূপায়ণ-ত্রুটির জন্য পরিকল্পনার কাব্য-সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, এইবার সাধারণ-ভাবে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের তিনটি লীলার মধ্য দিয়া কবি কৃষ্ণের আদর্শ রূপায়ণের তিনটি স্তর বর্ণনা করিয়া কাব্য-ত্রয়ীর মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছেন; সুতরাং এই তিনখানি কাব্যের স্বয়ং-সম্পূর্ণ মূল্য থাকিলেও মূলত ইহারা একই ভাবের তিনটি পর্ব্ব। এই কাব্য-ত্রয়ীর প্রথম কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৮৬, শেষ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৯৬। এখানে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন মনে হয় যে কাব্য-প্রেরণাকে এইরূপ দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত করা সম্ভব কি না। কবি তাঁহার আত্মচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, রৈবতক কাব্যকে বাঙ্গালী পাঠক সমাদরের সহিত গ্রহণ করে কিনা ইহা দেখিয়া পরে তিনি কুরুক্ষেত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। আবার রৈবতক কাব্য কিছু সমাদর লাভ করিলে কুরুক্ষেত্র রচনাকালে কবির মন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল এই ভাবিয়া যে রৈবতক কাব্য রচনা করিয়া যে খ্যাতি পাওয়া গিয়াছে, কুরুক্ষেত্র রচনা করিয়া সে খ্যাতি তিনি নষ্ট করিয়া না ফেলেন। এইভাবে রৈবতকের পর কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের পর প্রভাস কাব্য রচিত হয়। বুদ্ধিপ্রধান মননশীল প্রবন্ধ এইভাবে নূতন চিন্তায়, নূতন উপস্থাপন-রীতিতে ধীরে ধীরে রচিত হইতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণা (সে প্রেরণা লিরিক হউক বা এপিক হউক) এইভাবে টানিয়া বিস্তারিত করা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যায় এবং মহাকাব্য-জাতীয় কাব্য-রচনায় খ্যাতি-লোলুপতা বা অন্তঃপ্রেরণা কোন্‌টির তাগিদ প্রবল হইয়া দেখা দেয় তাহাও বিবেচ্য। তবে খ্যাতি-প্রলোভনের কথা ছাড়িয়া দিলেও নবীনচন্দ্র যেভাবে তাঁহার কাব্য-প্রেরণার সূত্রকে দীর্ঘায়িত করিয়াছেন, তাহা কাব্যসৃষ্টি-তত্ত্বের দিক দিয়া স্পষ্টই একটি ব্যতিক্রম। বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণা যেন চকিতের বিদ্যুৎ-আলোক, মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যেই অপসারিত হয়— "And the intense feeling, the ecstasy, which goes to make a lyric, does not last long. It blazes up to a white heat and dies away in a moment."—এ মন্তব্য লিরিক-প্রেরণা সম্পর্কে প্রযোজ্য হইলেও যে কোন দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে

পারে। তবে বহু আখ্যানপ্রধান দীর্ঘ কাব্য বা কবিতায় কবি-প্রেরণা নিঃশেষিত হইলেও ঘটনার বিবরণ ও বস্তুসন্নিবেশের দ্বারা প্রেরণার অভাবটি আবৃত করিয়া রাখা হয়। তাই অসাধারণ কবি না হইলে দীর্ঘকাব্য-কবিতার প্রত্যেক শব্দ, উপমা-চিত্র বা ঘটনা-চরিত্র-পরিকল্পনার পশ্চাতে বলিষ্ঠ কবি-প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। নবীনচন্দ্র যেভাবে তাঁহার বক্তব্যের অনুবৃত্তি প্রেরণাকে দীর্ঘ ও বিস্তারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা একেবারেই অসম্ভব এবং কবিধর্ম্মবিচ্যুত। নবীনচন্দ্রের প্রেরণা বিশুদ্ধ হইলে তাহা ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ১০ বৎসর স্থায়ী হইতে পারিত না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে-'divine vision' শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রেরণা-স্বরূপ কাজ করে নবীনচন্দ্রের প্রেরণা সে স্তরের নয়। কাব্য-ত্রয়ীর প্রধান ত্রুটি প্রেরণাগত, অন্য ত্রুটিগুলি আনুষঙ্গিক।

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ঠিক আখ্যায়িকা-কাব্যের উপযোগী নয়। অথচ তিনি এমন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়াছেন যাহা আখ্যায়িকা-কাব্যে ভিন্ন পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। আখ্যায়িকা-কবি (narrative poet) ও বর্ণনাত্মক-কবি (descriptive poet) ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। ত্রুটি-দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিয়াও হেমচন্দ্রকে আখ্যায়িকা-কবি বলা যায়, নবীনচন্দ্রকে বলিতে হয় বর্ণনাত্মক কবি। তবে কোন দীর্ঘ কাব্যই কেবলমাত্র আখ্যানাংশ বা কেবলমাত্র বর্ণনাংশকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে না। সব কাব্যেই আখ্যান ও বর্ণনা ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া থাকে। কবির প্রবণতা ও দক্ষতা দেখিয়া কোন্‌টি তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম তাহা ধরিতে পারা যায়। আখ্যায়িকা-কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় কাহিনীর জটিলতা, ঘটনার বিস্তার ও সংঘর্ষ সৃষ্টিতে। আখ্যায়িকা-কাব্যের উপস্থাপন ভঙ্গীতেও কিছুটা নাটকীয় কলা-কৌশলের অবতারণা করা হয়। আখ্যায়িকা-কাব্যের কবি ঘটনা ও চরিত্রের বীজ-বিকাশ-পরিণতির স্তর-পরম্পরা কাব্য-রঙ্গমঞ্চের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়া দেন। বর্ণনাত্মক-কবি সাধারণত প্রত্যক্ষ ঘটনাকে পরিহার করিয়া চলেন, তাঁহার দক্ষতা নেপথ্যে-সংঘটিত ঘটনাগুলির স্বচ্ছন্দ-সাবলীল বর্ণনায়। আখ্যায়িকা-কবি ঘটনা-চরিত্রগুলিকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের ভাবসত্য নিষ্কাশনের ভার পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেন। বর্ণনাত্মক-কবি কাহিনীর ইতিহাস সংকলন করিয়া, স্মৃতির মাধ্যমে ঘটনার স্তর-পরম্পরার বর্ণনা দিয়া মূল পরিণতিটিকে স্বয়ং পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন। তিনি পাঠকের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়া বর্ণনার দ্বারা পাঠককে যেভাবে দেখাইবেন, পাঠক সেইভাবে দেখিবে। সেখানে ঘটনা মুখ্য, কবি-চিত্ত গৌণ। এই কারণে আখ্যায়িকা-কাব্য objective, বর্ণনাত্মক-কাব্য subjective। আখ্যায়িকা-কবির ধর্ম্ম হইল—

"I cannot tell how the truth may be
I say the tale as 'twas said to me."

বর্ণনাত্মক-কবির আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পাঠকের দৃষ্টি কাব্যের ঘটনা ও চরিত্রের উপর হইতে সরাইয়া নিজের দিকে লইয়া আসেন। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা বর্ণনাত্মক-কবির অনুরূপ, কিন্তু তিনি এমন একটি বিষয়কে তাঁহার কাব্যের কাহিনীরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন যাহা objective কবি-কল্পনা ও প্রত্যক্ষ ঘটনার সংঘাত সৃষ্টি ভিন্ন অন্য উপায়ে পরিস্ফুট হইতে পারে না। নবীনচন্দ্রের কবিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যই তাঁহার কাব্য-ত্রয়ীর সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর style-ও তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয় নাই। কাব্যের পরিকল্পনা যেরূপ বৃহৎ, 'grand style' বা 'classical style'-এ ভিন্ন (আর্নল্ড যাহাকে 'architectonics' বলিয়াছেন) এই কাব্যের রূপায়ণ সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু নবীনচন্দ্র যে style অবলম্বন করিয়াছেন তাহাকে 'grand style' বলা যায় না। স্থানে স্থানে কবি অত্যন্ত স্থূল ও লৌকিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কবির অনুভূতি কারণে অকারণে এমনভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং উচ্ছ্বসিত অনুভূতির বসন্তের পুষ্পরাজির ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়া এমনভাবে কাব্যের তটবন্ধনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে যে 'classical style'-এর সংহতি সংযম ও নীরন্ধ্রতা প্রতিমুহূর্ত্তেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ক্লাসিক-কবিকে অনুভূতি-উচ্ছ্বাস নির্ম্মমভাবে সংযত করিতে হয়, কিন্তু কবি নবীনচন্দ্র যেন স্বেচ্ছায় ক্লাসিক কাব্যাদর্শের নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অনুভূতি-আবেগকে অর্গলমুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ক্লাসিক কাব্যের আদর্শ যে তিনি স্বীকার করেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাই নবীনচন্দ্র কাব্যের উপযুক্ত style নির্ব্বাচন করিতে না পারিয়া সূচনাতেই তিনি তাঁহার পরিকল্পনার সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়াছেন।

মধুসূদনের ন্যায় পাশ্চাত্ত্য এপিক কাব্যের গঠনাদর্শ গ্রহণ না করিয়া কাব্যের

বিষয়ানুরূপ কোন গঠনাকৃতি তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। নির্দ্দিষ্ট কোন আদর্শ কবির সম্মুখে না থাকায় কবির কল্পনা বন্ধুর পার্ব্বত্য-ভূমির ন্যায় কখনও উঁচু কখনও নিচু হইয়া কাব্যে কোন স্থায়ী ভাবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই। কল্পনার অসাম্য (inaccurate imagination) এই কাব্য-ত্রয়ীর অন্যতম প্রধান ত্রুটি। কবির কল্পনা কখনও উচ্চ ভাবগ্রামে বাঁধা হইয়াছে, কখনও আবার একেবারে সহজ মেঠো সুরে নামিয়া আসিয়াছে, কখনও দার্শনিক তত্ত্বের দুরবগাহ গভীরে নিমজ্জিত হইয়াছে, কখনও বাঙ্গালী গৃহস্থের পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়াছে। এইভাবে কখনও গম্ভীর কখনও লঘু-চপল ভাবকে প্রাধান্য দিয়া কবি কাব্যের মধ্যে একই সঙ্গে sublime ও ridiculous-কে পাশাপাশি স্থান দিয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী-ভূমিকাটি কাব্যের sublime-অংশ (অর্থাৎ কাব্যের পরিকল্পনা) এবং যেখানে কবি নিজ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছেন, সেখানেই sublime-এর পরিবর্ত্তে পাইয়াছি ridiculous।

নবীনচন্দ্র তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে স্থূল অমার্জ্জিত আবেগানুভূতির বাষ্প পুরিয়া দিয়া তাহাদিগকে মহাভারতীয় পটভূমি-পরিবেশের উচ্চভূমি হইতে সাধারণ লৌকিক জগতের নিম্নভূমিতে নামাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রগুলির elevation ও dignity নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কাব্যের প্রধান চরিত্রের মর্য্যাদা-গৌরব যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে সহজেই সমগ্র কাব্যের সুরও নামিয়া আসে। নবীনচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি লিরিকধর্ম্মী বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। লিরিক-প্রেরণা ঘটনা ও চরিত্রের elevation রক্ষা করিতে পারে না। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি যদিও লিরিক-ধর্ম্মী তথাপি তিনি একটি classic theme-কে কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছেন; তাই বহু চেষ্টাতে মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়াও তিনি ক্লাসিক কাব্যহর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই, কতকগুলি রোম্যাণ্টিক চিত্র আঁকিয়াছেন।

বর্ণনাত্মক-কবির দক্ষতা ঘটনার বর্ণনায়, ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে নয়। নবীনচন্দ্র তাই যেমন একটিও সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন নাই তেমনি অধিকাংশ স্থলে সুলভ ভক্তিভাবের আশ্রয়ে ঘটনার অনিবার্য্য সংঘাতকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। অথচ নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূল প্রেরণা চরিত্র-সৃষ্টি। কৃষ্ণচরিত্রকে নূতনভাবে নূতন আদর্শমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ত্রয়ী-কাব্য-পরিকল্পনা। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টির অক্ষমতা তাঁহার সে

অভিপ্রায়কে সার্থক হইতে দেয় নাই। তাই সৃষ্টির দুর্ব্বলতা তিনি তত্ত্ব-ব্যাখ্যার বাহুল্যের দ্বারা আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে তত্ত্বকে তিনি কৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন, কৃষ্ণের জীবনে-সাধনার মধ্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া, জীবন-বিবিক্ত তত্ত্ব-ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি সে দুর্ব্বলতা পূরণ করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে কবির তত্ত্ব-বাণী পাঠকের কাছে সুপ্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনের সহিত সংযুক্ত না হওয়ায় তাহা কাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনাত্মক কবির ধর্ম্মানুযায়ী নবীনচন্দ্র নেপথ্য ঘটনা-বর্ণনা দ্বারা কাহিনীর ক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে কাব্য-ত্রয়ীর মূল পরিকল্পনার দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনা নেপথ্য বর্ণনা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে এবং এই নেপথ্য-বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তৃতার সমষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কাব্যের প্রকাশ-সুষমা অপেক্ষা কাব্যের বাণীকেই কবি প্রধান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। মহাভারতের যে মৌলিক তাৎপর্য্য কবি আবিষ্কার করিয়াছেন সেইটি সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; এই কারণে কাব্য-ত্রয়ীতে বক্তৃতার প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। কবির উদ্দেশ্যানুসারে বক্তৃতা-ই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইবে, কারণ "For oratory words should bo winged, that they may do their work of persuation, For poetry words should be freighted with association of feeling that they may awaken sympathy." নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ী 'persuation'-এর কাজ করিয়াছে, কিন্তু 'sympathy' জাগাইতে পারে নাই। কাব্য হিসাবে সেইখানে ইহার চরম দুর্ব্বলতা।

কাব্য-ত্রয়ীতে কল্পনার বিস্তার নাই, কবির কল্পনা কাহিনীর কক্ষাবর্ত্তনেই পরিভ্রমণ করিয়াছে। কাব্যে বিস্তার আসে কল্পনায়, উপমায়, চিত্রে ও ছন্দে। এই বিস্তারকে বলিতে পারি vibration। শ্রেষ্ঠ কাব্যে vibration একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। Vibration কেবল শব্দের ধ্বনিগত নয়, কাহিনীরও vibration আছে। মধুসূদন মেঘনাদ-বধ কাব্যে একটি সংকীর্ণ সাধারণ ঘটনার শিশির-বিন্দুতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন—ইহাই এই কাব্যের কাহিনীগত vibration বা ধ্বনি। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর বাচ্যার্থে কাহিনীর যে অংশটুকু প্রকাশিত তাহার অতিরিক্ত কোন ধ্বনি আবিষ্কার করা যায় না। সাধারণ কাহিনী-প্রধান কাব্যে ইহা একটি বিশেষ

ক্রটি রূপে বিবেচিত না হইলেও শ্রেষ্ঠ কাব্যের পক্ষে ইহা একটি মৌলিক ক্রটি।

কাহিনীতে যেমন কল্পনার বিস্তার নাই তেমনি কাব্য-ত্রয়ীর ভাষায় উপমায়, চিত্রে ও ছন্দেও বিস্তারের অভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, এ ভাষা ঝরনা-ধারার ন্যায় স্বচ্ছন্দ প্রবাহে বহিয়া যায়। এইরূপ ভাষা সাধারণ কাহিনীমূলক কাব্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও কবি যে ভাবভিত্তির উপর তাঁহার কাব্য-ত্রয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এ ভাষা সে ভাবের উপযোগী হইতে পারে না। উপমা-চিত্রের সাহায্যে কবি যদি তাঁহার কাব্যের বিষয়ে অনুরূপ গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সহজ সাবলীল ছন্দে কেবল আখ্যানাংশকে বিবৃত না করিয়া সুনির্ব্বাচিত শব্দের ধ্বনিতরঙ্গে যদি বর্ণনায় বিষয়ের মধ্যে গাম্ভীর্য্য-গৌরব আরোপ করিতে পারিতেন, এক-একটি ক্ষুদ্রাবয়ব অর্থগূঢ় উপমায়, চিত্রে, রূপকে যদি বিস্তৃত তরল বর্ণনাকে সংহত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পরিকল্পনার বিশালতা কাব্যের মধ্যে কিছু প্রতিফলিত হইতে পারিত। কিন্তু কবি সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। কেবল বর্ণনা-শক্তি নয়শ, কেবল ভাব প্রকাশের শক্তিও নয়, দুর্লভ দেবানুগ্রহ ব্যতীত যে বিষয়ের কাব্যরূপায়ণ অসম্ভব, নবীনচন্দ্র শব্দ-ছন্দের উপর কিছু অধিকার আয়ত্ত করিয়া সেই বিষয় লইয়া কাব্যরচনায় সাহসী হইয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনায় যে 'epic machinery'-এর অনুসরণ করিতে-ই হইবে, এমন দাবী কেহ করে না; কিন্তু গঙ্গার জন্য গঙ্গোত্রীর প্রয়োজন। ক্লাসিক কবি-কল্পনা ব্যতীত মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। কিন্তু যে কবি-মানস-পরিবেশ হইতে ক্লাসিক মহাকাব্যের উৎপত্তি নবীনচন্দ্রের মানস-পরিবেশ সেরূপ নয়, এই কারণে নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে।

কবি প্রাচীন কাব্য-কথাবস্তুকে এমনভাবে আধুনিক মতবাদ ও ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহাতে কাব্যের মূল সুর যেন নষ্ট হইয়া গিয়া রসনিষ্পত্তিতে বাধা জন্মাইয়াছে। প্রাচীন যুগের কাহিনীর মধ্যে আধুনিক মতবাদ কতখানি মিশ্রিত করিলে কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত জন্মাইবে না, কবির সে সাম্যবোধের অভাব ছিল। মধুসূদনও রাবণ-চরিত্রকে অনেকখানি আধুনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত করিয়া নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা রামায়ণের মূল আবহাওয়া-পরিবেশকে নষ্ট করিয়া ফেলে নাই। কিন্তু নবীনচন্দ্র একদিকে কৃষ্ণ-সত্যভামা, জরৎকারু-কৃষ্ণ, পার্থ-

সুভদ্রা, উত্তরা-অভিমন্যু—ইহাদের প্রেমানুরাগের চিত্রকে আধুনিক ঔপন্যাসিকের রীতিতে উপস্থাপিত করিয়া প্রাচীন মহাভারতীয় যুগের প্রেমানুরাগের স্বভাবধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, অন্যদিকে সুভদ্রা-শৈল প্রভৃতির মধ্যে মানবপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শিবিরে শিবিরে ঘুরাইয়া আহতদের শুশ্রূষা করাইয়াছেন। এমন কি বৃদ্ধ বিরাট রাজার শর-ক্ষতে ঔষধের প্রলেপ দিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। মনে হয়, এই আধুনিক উপস্থাপন-রীতি ও আধুনিক মতবাদের প্রভাব এই কাব্যের মূল সুরকে প্রাচীন মহাভারতীয় যুগ হইতে একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লইয়া আসিয়াছে। মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনার আধারে এইরূপ আধুনিক মতবাদ পরিবেশন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবির উপস্থাপন-ভঙ্গীতে নাটকীয় কলা-কৌশলের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না, তবে পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে একটা dramatic emphasis লক্ষ্য করিতে পারি। প্রত্যেকেই অত্যন্ত জোর দিয়া সমগ্র শক্তি যেন কথার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এই কারণে চরিত্রগুলি বাক্-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তরের শক্তি বা ভাব যেন বক্তৃতার রন্ধ্র-পথ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতাগুলিই তাই চরিত্রের প্রাণ, এইগুলি বাদ দিলে তাহাদের কঙ্কাল-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইহার মূলে হয়ত গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রভাব আছে, তবে নাটকের পক্ষে যাহা অপকর্ষের কারণ হয় নাই, কাব্যের পক্ষে তাহা বিশেষ অপকর্ষের কারণ হইয়াছে।

সুতরাং সব দিক বিচার করিয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিব যে কাব্য-ত্রয়ীর অংশবিশেষে কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও সামগ্রিক বিচারে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস একটি বৃহৎ কাব্য-পরিকল্পনার ব্যর্থ রূপায়ণ-প্রচেষ্টা হিসাবে বাংলা কাব্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এবং মিল্টনের কাব্য সম্পর্কে একজন বিখ্যাত সমালোচক যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অভিমতের কিছু অংশ নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ী সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইতে পারে—"Milton has taken a scheme of life itself. Had he, in the choice of subject, remembered the principle of the Aristotelean Poetics (which he otherwise highly prized) that men in action are the poet's proper theme, he

would have raised his imaginative fabric on a more permanent foundation; upon the appetites, passions and emotions of men, their vices and virtues, their aims and ambitions, which are a far more constant quantity than any theological system, This perhaps was what Goethe meant when he pronounced the subject of Paradise Lost to be abominable, with a fair outside, but rotten inwardly"—Milton—M. Pattison.

॥ ৪ ॥

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই তিনখানি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-ব্রতের তিনটি পর্ব্ব বর্ণিত হইয়াছে। রৈবতকে সেই জীবন-ব্রতের সূত্রপাত, কুরুক্ষেত্রে জটিলতা ও বিস্তার এবং প্রভাসে পরিণতি। সুতরাং রৈবতক কাব্যকে একটি বৃহৎ ভাব-বনস্পতির বীজ বা ভূমিকা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কবি নবীনচন্দ্র মহাভারতীয় যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের একটা স্পষ্ট পটভূমিকা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সে পটভূমিকা কতখানি ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিচার কাব্যের রস-বিচারের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য্য নয় বলিয়া অবান্তর। পটভূমিকাটি হইল এই—মহাভারতের যুগে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানদের সহিত রক্তক্ষয়ী আত্মকলহে, আর্য্য-অনার্য্যের অন্তহীন বিরোধে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিদ্বেষ-বিষাগ্নিতে ভারতবর্ষ জর্জ্জর ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। এই প্রতিকূল পটভূমিকায় কৃষ্ণ প্রেম ও প্রীতির যাদুমন্ত্রে ভারতবর্ষকে চরম দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই মূল ভাবটি কাব্যে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের আশ্রয়ে কিভাবে বিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

কুড়িটি সর্গে সম্পূর্ণ রৈবতক কাব্যের ঘটনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে এই কাব্যের কাহিনী প্রধানত দুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। একদিকে কৃষ্ণের অখণ্ড ধর্ম্মরাজ্য গঠনের ব্রত এবং সেই ব্রত সফল করিবার জন্য অর্জ্জুন-ব্যাস ও কৃষ্ণের আলোচনা-পরামর্শ। আর একদিকে কৃষ্ণের আদর্শের বিরোধী-শক্তি অনার্য, ও ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি দুর্ব্বাসার প্রস্তুতি। একদিকে উদার মানবধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, আর একদিকে সেই চেষ্টাকে বিফল করিবার আয়োজন। এই প্রধান কাহিনী-প্রবাহের অন্তরালে আর একটি প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, সেটি—পার্থ-সুভদ্রা, শৈল-অর্জ্জুন, জরৎকারু-কৃষ্ণের প্রেমানুরাগের কাহিনী।

এইভাবে বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা কবি যে কাহিনী বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা কাব্যের মূল পরিকল্পনাকে পরিস্ফুট করিতে কতখানি সহযোগিতা করিয়াছে, তাহা বিচার করিতে হইবে। কিন্তু সেরূপ বিচারের পূর্ব্বে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে রৈবতক কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা সুভদ্রা-হরণকে মূল কাব্য-পরিকল্পনার একটি প্রধান ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় কিনা। দ্বিতীয়ত, শৈল-অর্জ্জুন, পার্থ-সুভদ্রা, জরৎকারু-কৃষ্ণ—ইহাদের প্রেমানুরাগের কাহিনীর কি এমন বিশেষ গুরুত্ব আছে যাহার জন্য নেপথ্য অন্তরালে না রাখিয়া ইহাকে কাব্যের প্রত্যক্ষভূমিতে লইয়া আসা হইয়াছে। তৃতীয়ত, ব্যাস-অর্জ্জুন-কৃষ্ণ—ইহাদের নীরস দার্শনিক আলোচনা এবং সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সর্গে কৃষ্ণের পরিকল্পনা-আদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কাব্যের মূল পরিকল্পনার সহিত কোন্ বিশেষ সম্পর্ক-সূত্রে গ্রথিত হইতে পারিয়াছে?

কবি যেভাবে কাব্যের সূচনা করিয়াছেন তাহাতে সুভদ্রা-হরণকে কাব্যের অনিবার্য্য পরিণতিরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রথম সর্গে প্রভাস-তীরে সূর্য্যোদয় ক্ষণে কৃষ্ণ-দুর্ব্বাসার বিরোধের মধ্য দিয়া কাব্যের সূত্রপাত। কবি সূর্য্যোদয়ের ন্যায় একটা সাধারণ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বাসার আদর্শগত মৌলিক বিরোধটিকে অতি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। বাহ্যত মনে হইবে যে মগ্নচিত্ত কৃষ্ণ দুর্ব্বাসাকে শ্রদ্ধা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয় ইহাদের বিরোধের সূত্রপাত, কিন্তু এই বাহ্য ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া কবি কৌশলে ইহাদের আন্তর-বিরোধকে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণ স্বভাবধর্ম্মের উপাসক, যুক্তিবাদী। জড় সংস্কারের বন্ধন তিনি অস্বীকার করিয়াছেন—

"কে বা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত,
সঞ্জীবনী সুধারাশি; স্বভাবে চালিত
ভ্রমে রবি, শশী, তারা; বহে সমীরণ।
স্বভাব-নিয়ন্তা এক বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর,
স্বভাবের অনুবর্ত্তী বিশ্বচরাচর।"

কবি কৃষ্ণকে মানবরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রত্যেকটি অলৌকিক লীলাকে বাস্তবজগতের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্ণ সর্ব্বমানবের মঙ্গল-কামী উদার ধর্ম্মের প্রচারক। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও ঋষিকুল জড়-অন্ধধর্ম্মের উপাসক। প্রভাসতীরে সূর্য্যোদয় কৃষ্ণের অন্তর্লোকে এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির উদ্রেক করিল এবং ঋষিগণ অভ্যাস ও সংস্কার-বশে শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্র-আবৃত্তি দ্বারা সূর্য্যদেবকে বন্দনা করিলেন। কেবলমাত্র সূর্য্য-বন্দনা নয়, ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ যে রূঢ় সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণের নবীন ধর্ম্মের নিকট ঋষিদের সমগ্র অধ্যাত্ম-সাধনাই তিরস্কৃত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, সুতরাং দুর্ব্বাসা ও কৃষ্ণের বাহ্য বিরোধের মধ্য দিয়া কৃষ্ণের নবীন ধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কারের বিরোধের ব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম সর্গে কৃষ্ণ-দুর্ব্বাসার বিরোধ যেমন নব মানবধর্ম্ম এবং প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সংঘাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, তেমনি দ্বিতীয়-তৃতীয় সর্গে ব্যাস-কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের সংলাপ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বৈর-সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়া আর একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির বিরোধ-আশঙ্কাকে সজীব করিয়া রাখে। পরে চতুর্থ সর্গে বিজয়ী আর্য্যজাতির প্রতি বিজিত অনার্য্যজাতির বৈরভাব দুর্ব্বাসার পোষকতায় ও সহায়তায় পূর্ণ তেজে জ্বলিয়া উঠে এবং সর্গে অনার্য্য প্রতিনিধি ও দুর্ব্বাসার গুপ্ত মন্ত্রণা আর একটি ব্যাপক সংঘাতের আশঙ্কাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে প্রথম চারিটি সর্গে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের আদর্শের প্রতিস্পর্দ্ধী তিনটি প্রতিকূল শক্তির আভাস দিয়া যেভাবে কাব্যের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে করা যাইতে পারে, কবি কাব্যের কথা-বস্তুর ক্ষেত্র-পরিধির আভাস দিয়া এইবার মূল action-এর উপর হস্তক্ষেপ করিবেন এবং পর্য্যায়ক্রমে এই তিনটি বিরোধী আদর্শের সহিত কৃষ্ণের আদর্শের সংঘাত ও জয়ের দ্বারাই কাব্যের উপসংহারটি ঘটিবে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের এই কাহিনী-পরিকল্পনা

তিনখানি বৃহৎ কাব্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাই প্রথম কাব্য রৈবতকের মধ্যে সমস্ত বিরোধ-সংঘাতের মীমাংসা আশা করা যাইতে পারে না। তবে কাব্যের পরিকল্পনা যখন কৃষ্ণের নবীন মানবধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, তখন এই আদর্শের স্পষ্ট জয়-নির্দ্দেশক কোন ঘটনায়, অথবা বিরোধী পক্ষের সহিত এই আদর্শের তীব্র সংঘাতে রৈবতকের উপসংহার হইবে পাঠক-সমালোচক ইহাই প্রত্যাশা করে। কিন্তু নবীনচন্দ্র কাব্যের মূল পরিকল্পনার সহিত ক্ষীণসূত্রে বিধৃত সুভদ্রা-হরণ ঘটনাটিকে রৈবতক কাব্যের কেন্দ্রস্থ ঘটনারূপে নির্ব্বাচন করিয়া এই কাব্যের ঘটনা-সমাবেশ ও কাহিনী-পরিকল্পনাকে দুর্ব্বল ও ত্রুটিবহুল করিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রথম চারিটি সর্গে বহু অবান্তর বিষয় আসিয়া ভিড় করিলেও মোটামুটি-ভাবে কবি কাহিনীর সূত্রটি ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন এবং প্রকৃত আখ্যায়িকা-কাব্যের কবির ন্যায় একটি ভাবী ব্যাপক সংঘাতের সম্ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর হইতে কবি কাহিনীর স্বাভাবিক অগ্রগতির পথ হইতে সরিয়া আসিয়া রোম্যান্টিক প্রণয়-রাগের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিয়াছেন। আখ্যায়িকা-কাব্যেও যে আবেগ-অনুভূতি বর্জ্জিত হইবে, ঘটনার আড়ম্বর-সমারোহ ভিন্ন ভাব-অনুভূতি উদ্বোধনের দ্বারা এই শ্রেণীর কাব্য যে মানবচিত্তকে অধিকার করিবে না, এমন দাবী কেহই করে না। মেঘনাদ-বধ কাব্য ঘটনা-বিন্যাসের চমৎকারিত্ব অপেক্ষা ভাবসমৃদ্ধির জন্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; তবে আখ্যায়িকা-কাব্যের মূল actionটি একটি হৃদয়-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেমন মেঘনাদ-বধ কাব্যে হইয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যের মূল চরিত্র দুইটি যেন সূচ্যগ্রভাগের ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিকূল ঘটনার মৃদু কম্পনে পাঠক-হৃদয়কে দুঃসহ বেদনায় বিদ্ধ করিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র মিণ্টনের কাব্য ইহার ব্যতিক্রম, তবে সে কাব্যের আবেদন ভিন্ন প্রকারের। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহাদের কাব্যের মূল আখ্যানাংশকে কোন গভীর হৃদয়-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া স্বতন্ত্র উপায়ে কাব্যের নীরসতা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কাব্যের স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করিয়া ফেলিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর মূল পরিকল্পনাটি এমন তত্ত্বপ্রধান ও বুদ্ধিনির্ভর যে তাহার সহিত মানব-অনুভূতির কোন যোগসূত্র স্থাপিত হইতে পারে না; তাই কাব্যের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া এবং কাব্যের পরিধি লঙ্ঘন করিয়া কবিকে

মানব-চিত্ত-সমুদ্র মন্থন করিতে হইয়াছে। কিন্তু কাব্যের পক্ষে তাহা অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর হইয়া পড়িয়াছে।

কবি অবশ্য প্রধান কাহিনীর সমান্তরাল প্রেমানুরাগের কাহিনী প্রবাহটিকেও কাব্যের মূল পরিকল্পনার সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবির সে চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, সে কথা বলা যায় না। কৃষ্ণ যে অখণ্ড মহাভারত-রাষ্ট্র গঠনের কল্পনা করিয়াছেন, সে কল্পনাকে সফল করিবার পক্ষে কৃষ্ণের অবলম্বন অর্জ্জুনের বাহুবল এবং ব্যাসদেবের বুদ্ধিবল। তাই অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলে ভবিষ্যৎ মহাভারত-রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে সফল করিবার জন্য অর্জ্জুনের বাহুশক্তি কৃষ্ণের পক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, কবি হয়ত এইরূপ অনুমান করিয়া সুভদ্রা-হরণ ঘটনাকে কৃষ্ণের মহাভারত-পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে বিবেচনা করিয়াছেন এবং ঠিক একই কারণে সুভদ্রা-অর্জ্জুনের প্রেম সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমগ্র রৈবতক কাব্যখানি তাহাদের প্রেমানুরাগের সৌরভে সুরভিত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রথমত অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণের মধ্যে আদর্শগত কোন বিরোধ নাই; অর্জ্জুন কৃষ্ণের আদর্শের একজন বড় সমর্থক, যেমন সমর্থক ব্যাসদেব। সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে ব্যাস এবং অর্জ্জুনের সহযোগিতা কৃষ্ণ বিনা বাধায় লাভ করিতে পারিবেন। তাই সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের পরিণয় বন্ধনে যে কৃষ্ণ নূতন করিয়া অর্জ্জুনের শক্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এমন মনে করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে ব্যাসদেবকেও কৃষ্ণের পক্ষে আনিবার জন্য নূতন ঘটনা উদ্ভাবন করিয়া আর একখানি কাব্য-রচনার প্রয়োজন ছিল।

আর একটি কারণেও হয়ত সুভদ্রা-হরণকে মূল কাব্য-পরিকল্পনার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে প্রমাণিত করিবার জন্য কবির সচেষ্টতা ছিল। কবি দুর্ব্বাসার সহায়তায় বলরামকে সুভদ্রা-অর্জ্জুনের পরিণয়-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া বলরাম-প্রিয় ও পাণ্ডব-বিদ্বেষী দুর্য্যোধনকে সুভদ্রার পতিরূপে মনোনীত করিয়াছেন। এবং সুভদ্রাকে কেন্দ্র করিয়া-ই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছিল ও দুর্ব্বাসা-ই যে ফুৎকার দিয়া এই স্ফুলিঙ্গকে বৃহৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে পরিণত করিয়াছিলেন, পরে নবীনচন্দ্র এইরূপ একটা স্পষ্ট আভাসও দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার চক্রান্তের মধ্যে একটা স্পষ্ট প্রত্যাশা ছিল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইলে অনার্য্যদের মস্তকে

পদস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হইবে। কিন্তু দুর্ব্বাসার চক্রান্তকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণরূপে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কাব্যের মূল conflict—উদার মানব-ধর্ম্ম এবং সংকীর্ণ সংস্কারান্ধ জড়-ধর্ম্মের সংঘাত, আর্য্য ও অনার্য্যের জাতি-সংঘাত, পরস্পরের সম্মুখীন না হইয়া একেবারে নেপথ্যে পড়িয়া যায় এবং সমগ্র ঘটনা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কৌশলী দুর্ব্বাসার উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু দুর্ব্বাসাকে কবি প্রথম হইতে এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে তাহার আদর্শ ও ধর্ম্মের উপর পাঠকের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও সমর্থন থাকিতে পারে না, তাই দুর্ব্বাসাকে কৃষ্ণের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। এবং কেবলমাত্র দুর্ব্বাসার পরাজয়ের মধ্য দিয়াই কৃষ্ণের আদর্শের জয় ঘোষণাও উপযুক্ত হইতে পারে না। দুর্ব্বাসা একটা নির্দ্দিষ্ট বিরোধী-শক্তির প্রতিনিধি। কবি রৈবতক কাব্যের ভূমিকায় তিনটি বিরুদ্ধ-শক্তির ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। দুর্ব্বাসার চক্রান্তে সংঘটিত এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেই তিনটি শক্তির মধ্যে মাত্র একটির সহিত মীমাংসা হয়। সুতরাং এই আংশিক জয়ের দ্বারা কৃষ্ণ পূর্ণ বিজয়-গৌরব দাবী করিতে পারেন না, কারণ মূল কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটি খণ্ডাংশ মাত্র। কিন্তু কবি এই খণ্ডাংশটিকে কাব্যের মূল action-রূপে প্রাধান্য দিয়া অন্য দুইটি বিরোধকে অমীমাংসিত রাখিয়াছেন। কবি যখন কুরুক্ষেত্র নামে একখানি স্বতন্ত্র কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন তখন পাঠক স্বভাবতই দাবী করিতে পারে যে কুরুক্ষেত্র কাব্যের বিশাল রণভূমিতে খণ্ড বিরোধী শক্তিগুলি কৃষ্ণের মহান্ ব্যক্তিত্বের নিকট মস্তক অবনমিত করিবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে একটি সমস্যার মাত্র সমাধান করা হইয়াছে, অন্য দুইটি সমস্যাকে কবি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়া একটা সুলভ সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কবি তাঁহার শক্তির পরিধি সম্বন্ধে সচেতন না থাকিয়া কেবল কাহিনীর জাল বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এবং এই কাহিনীর জাল যে কাব্যের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেই গুটাইয়া আনিবার প্রয়োজন হইবে, সে খেয়াল রাখেন নাই। তাই শেষে কোনক্রমে আরব্ধ কাজ শেষ করিয়াছেন এবং অকস্মাৎ একটা ভক্তির বন্যায় কাব্য-ভূমিকে প্লাবিত করিয়া সব বিরোধ-সংঘাতের অবসান ঘটাইয়াছেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সুভদ্রা-হরণকে কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মূল কাব্য-পরিকল্পনার

একটা খণ্ডাংশ মাত্র। এই খণ্ডাংশের ভূমি প্রস্তুত করিবার জন্য কবি রৈবতকের ন্যায় একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় কবি তাঁহার পরিকল্পনাকে নীরন্ধ্র বস্তু-বিন্যাসে ও সুনির্ব্বাচিত ঘটনা-সমাবেশে সার্থকভাবে রূপায়িত করিতে পারেন নাই।

মূল কাব্য পরিকল্পনায় সুভদ্রা-হরণের যে গুরুত্বই থাক্, কবি যে এই ঘটনাটিকে একটা রাজনৈতিক ঘটনা রূপে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুভদ্রা-অর্জ্জুনের প্রেম-সম্পর্ক কেবলমাত্র তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে প্রেম-সম্পর্ক একটা ব্যাপকতর রাজনৈতিক কূটচক্রের সহিত সংযুক্ত; সুতরাং কাহিনীর দিক হইতে সুভদ্রা-অর্জ্জুনের আসক্তি এই ঘটনাটি মাত্র মূল্যবান। ইহার অতিরিক্ত ইহাদের প্রেমানুরাগের বিভিন্ন স্তরপরম্পরা—প্রথম অনুরাগের লজ্জানম্রতা, প্রবল প্রেমানুভূতির তীব্র মিলনোৎকণ্ঠা—ইহার কোনটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ-বর্ণনা কাহিনীর দিক হইতে অপরিহার্য্য নয়। তাই সুভদ্রা-হরণকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারণ রূপে স্বীকার করিয়া লইলেও সুভদ্রা-অর্জ্জুনের অনুরাগের পল্লবিত বর্ণনা কোনক্রমেই কাব্যের প্রয়োজনীয় অংশরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। কবি ক্লাসিক কাব্যাদর্শ অনুসরণ না করিলেও একথা তো ঠিক-ই যে রোম্যাণ্টিক প্রণয়-কাব্য রচনা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু সুভদ্রা-অর্জ্জুনের প্রেম-রহস্যের গহনে যখন কবি প্রবেশ করেন তখন আমাদের বুঝিতে অসুবিধা হয় কবির অভিপ্রায় কি। কেবল অর্জ্জুন-সুভদ্রা নয়, জরৎকারু-কৃষ্ণ এবং শৈল-অর্জ্জুন, ইহাদের অনুরাগ-আসক্তির কাহিনীও কাব্যে গৌণ অংশ অধিকার করিয়া নাই। কিন্তু কাব্যে এই প্রেমকাহিনীর উপযোগিতা কতখানি? ইহাতে মনে হয় কাব্যের বিষয়-উপস্থাপন-রীতি সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তিনি তাঁহার কাব্য-পরিকল্পনার মুখ্য ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে কাব্যের নেপথ্যে রাখিয়া অপেক্ষাকৃত গৌণ ঘটনা-চরিত্রগুলিকে সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন; কাব্যের উপস্থাপন-রীতি দুইটি—প্রত্যক্ষ উপস্থাপন (direct presentation) ও অপ্রত্যক্ষ উপস্থাপন (indirect presentation)। নবীনচন্দ্রের কাব্য পরিকল্পনানুযায়ী কাহিনী ও ঘটনার যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন ছিল সেগুলিকে নেপথ্যে রাখিয়া তিনি নেপথ্য-লোককে প্রত্যক্ষলোকে লইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের গতি ও উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী হইয়া পড়িয়াছে—রৈবতক কাব্যের প্রেমানুরাগের কাহিনীগুলিকে

স্মরণ রাখিয়া এই মন্তব্য করা যাইতে পারে।

কাব্য-পরিকল্পনার মধ্যে এই প্রেমানুরাগের কাহিনীর গুরুত্ব অতি নগণ্য হইলেও প্রথম চারটি সর্গের পর রৈবতক কাব্যে এইটি প্রধান কাহিনী-প্রবাহ। এই প্রধান প্রবাহের পাশে ব্যাস ও কৃষ্ণের পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা স্থান পাইয়াছে। ব্যাস-কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের আলোচনার মধ্যে যে নীরস দার্শনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, সে তত্ত্বালোচনাগুলিও কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হইতে পারে, যদি কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের উপর এই তত্ত্বগুলির প্রভাব স্পষ্ট করিয়া কবি দেখাইতে পারেন। নতুবা কেবলমাত্র সাধারণ তত্ত্ব-আলোচনা রূপে কাব্যে ইহাদের সার্থকতা স্বীকৃত হইতে পারে না। রৈবতক কাব্যের এই আলোচনাগুলি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রে কাহিনীর সহিত নিঃসম্পর্কিত বহু সাধারণ দার্শনিক আলোচনাও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; কবি যেন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহার নিজের দার্শনিক মতবাদকে এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পাঠকের কাছে পরিবেশন করিয়াছেন। আবার পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ বিচার করিলেও স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে এই জ্ঞানালোচনা অর্জ্জুন বা কৃষ্ণ ইঁহাদের কাহারও চিন্তা ও কর্ম্মের উপর উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ঘটনা পরিচালনায় অর্জ্জুনের দায়িত্ব বিন্দুমাত্রও নয়, সুতরাং অর্জ্জুনের নিকট ব্যাসদেব যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অপাত্রে পরিবেশিত হইয়াছে; আবার কৃষ্ণ এমন তীক্ষ্ণভাবে আত্মসচতেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি এমনভাবে তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন যে ব্যাসের উপদেশ-পরামর্শের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় নাই। তিনি তাঁহার নিজের পথেই অগ্রসর হইয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে শিষ্য গুরুকে উপদেশ দিয়াছেন এমনও দেখা গিয়াছে, এবং গুরু শিষ্যের অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবান হইয়া সে উপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়াছেন। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে নীরস আলোচনাগুলি কাব্যের নীরসতাই বৃদ্ধি করিয়াছে, কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে নাই।

রৈবতক কাব্যের অনেকগুলি সর্গে কৃষ্ণের মহাভারত-রাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত-রাষ্ট্রের গঠন ও রূপায়ণ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া কেবল পরিকল্পনা সম্বন্ধে কবি কৃষ্ণকে দিয়া এত বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন যে এই পরিকল্পনায় কোনরূপ সূক্ষ্মতা ও সাঙ্কেতিকতা রক্ষিত হয় নাই। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় এমনভাবে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে যে মনে হইয়াছে কবি তাঁহার মতবাদ

(theory)-কে যেন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বিভিন্ন ঘটনার বিবরণের ভিতর দিয়া উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছেন। কবির কল্পনায় যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত হয় তাহাকে রূপায়িত করিবার রীতি ঠিক এইরূপ নয়। সুতরাং কৃষ্ণের এই পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা অসঙ্গতভাবে যেন কাব্যের কিছু অংশ অধিকার করিয়া আছে।

রৈবতক কাব্যের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সুভদ্রা-পার্থ, কৃষ্ণ-জরৎকারু, শৈল-অর্জ্জুন—ইহাদের প্রেমানুরাগের কাহিনী, ব্যাস-কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের দার্শনিক তত্ত্বালোচনা এবং কৃষ্ণের মহাভারত-রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা, ইহার কোনটিই নবীনচন্দ্রের মূল পরিকল্পনার পরিস্ফুটনে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করে নাই। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে রৈবতক কাব্যের ঘটনা-বিন্যাস ও কাহিনী-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। এ কথা যেমন সত্য তেমনি সত্য যে রৈবতক কাব্যে কবি আখ্যায়িকা-কাব্যের ধর্ম্মানুযায়ী ঘটনার সংঘাত সৃষ্টি করিয়া কাহিনীকে জটিল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই, অথচ বহু বিরোধী শক্তির সমাবেশ এইরূপ একাধিক সংঘাতের সম্ভাবনাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই কাব্যে সুভদ্রা-অর্জ্জুন, কৃষ্ণ-জরৎকারুর প্রেমকাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণের নবরাষ্ট্র পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা অন্তঃশীলা ফল্গুর ন্যায় অতি ধীর মন্থর গতিতে বহিয়া গিয়া কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণের আদর্শ-মতবাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। একবার মাত্র দশম সর্গে কুমারী ব্রতে আততায়ী দস্যুর আক্রমণ অনার্য্য জাতির প্রস্তুতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া তোলে। কিন্তু সেই একবার মাত্র এবং তাহাও বিদ্যুৎ-আলোকের ন্যায় চকিত-আকস্মিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়াই অন্তর্হিত হয়। এবং চতুর্থ সর্গে দুর্ব্বাসা-বাসুকির মিলিত অভিযান-প্রস্তুতির যে আভাস পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে কোন স্ফুলিঙ্গ বা ধূমরেখা না দেখিতে পাইয়া সে প্রস্তুতিকে শরতের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অসার মনে করিয়া পাঠকের প্রত্যাশা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে দুর্ব্বাসার দৌত্যে ঘটনায় কিছু জটিলতা আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার উপর ইহার দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব অনুভূত হয় না। সুতরাং বিরোধী পক্ষ নিশ্চল থাকায় রৈবতক কাব্যের ঘটনা-প্রবাহ স্তিমিতভাবে একমুখী হইয়া বহিয়া গিয়াছে। এবং বহিয়া গিয়াছে বলিলেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, কাহিনী একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া কুণ্ডলাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

রৈবতক কাব্যের প্রেম-চিত্রগুলিও এই কাব্যের একটা মৌলিক ত্রুটির

কারণ হইয়াছে। এই কাব্যে কবি যে প্রেম-চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন সেগুলি ঘটনাপ্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যের উপযোগী না হইয়া রোম্যান্টিক প্রেম-কাব্যের উপযোগী হইয়াছে। আখ্যায়িকা-কাব্যের প্রেম-চিত্রগুলির মধ্যে মাদকতা-আবেশ থাকিলেও আত্মনিমজ্জন বা আত্মবিভোরতা থাকে না। কিন্তু এই কাব্যের প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেমের রহস্যময় গভীরে নিমজ্জিত হইয়াছে। প্রেম-অনুভূতি-আবেগ যে তাহাদের জীবনের একটা নগণ্য অংশ, তাহারা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমানুরাগ অপেক্ষা ব্যাপকতর-বিস্তৃততর ঘটনাচক্রের সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট, প্রয়োজনমূলক বস্তুজগতের মধ্যে প্রেমের ভাবাকাশ যে তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সংকীর্ণ অবসর, সে কথা বিস্মৃত হইয়া নানা আবেশে নানাভাবে তাহারা প্রেমের অসীম মাধুর্য্য-রহস্য আস্বাদ করিয়াছে। ইহা রোম্যান্টিক লিরিক কবির প্রেম-বর্ণনার ধর্ম্ম। এই কাব্যে এবং অপর কাব্য দুইখানিতেও নবীনচন্দ্রের প্রেম-অনুভূতি লিরিক কাব্যের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রকৃতি লিরিকধর্ম্মী, তাই কবির স্বভাব-ধর্ম্মকে পরিহার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মধুসূদনের কাব্যে প্রেম-অনুভূতি-আবেগ-ও যে একটা ক্লাসিক-মহিমা ও মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহার কারণ মধুসূদনের ক্লাসিক মানস-পরিবেশ। এই মানস-পরিবেশ হইতে সহজ-স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে যে আবেগ-অনুভূতি উৎসারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা রাজকীয় মর্য্যাদা আছে। হেমচন্দ্র কৃত্রিমভাবে এই মর্য্যাদা-গৌরব আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে ইহা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না, তাই হেমচন্দ্রের কাব্যে একটা বিরাট কঙ্কাল আছে, তাহাতে রক্ত-মাংস ও প্রাণ নাই। নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্র হইতেও ভিন্ন; তিনি কৃত্রিম পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন নাই; তিনি কৃত্রিমভাবে ক্লাসিক কাব্যের একটা theme কল্পনা করিয়া তাহাকে আপন কবি-প্রকৃতির স্বভাব-ধর্ম্মানুযায়ী লিরিক কবি-কল্পনায় বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত করিয়াছেন। তাই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই ব্যর্থ হইয়াছেন—তবে হেমচন্দ্র কৃত্রিম বলিয়া আড়ষ্ট, ও নবীনচন্দ্র অকৃত্রিক বলিয়া সহজ ও স্বাভাবিক।

তবে নবীনচন্দ্র রোম্যান্টিক প্রেম-চিত্রাঙ্কনেও বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন না। রোম্যান্টিক কবির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল ভাবের জটিলতা সৃষ্টি। রোম্যান্টিক কবির দৃষ্টি সহজ সাদা-কালোর প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তাঁহাদের আকর্ষণ সাদা-কালোয় মিশ্রিত বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতি। তাই

যে প্রেমে কেবল একই ভাবের অনুবৃত্তি রোম্যাণ্টিক কবির কাব্যে সে প্রেম-চিত্র সচরাচর স্থান পায় না। রোম্যাণ্টিক কবি আদর্শ-বাস্তবের মিলনে, আশা-নিরাশা, পাওয়া ও না-পাওয়ার মিশ্রণে এমন এক জটিল চিত্তাবস্থা সৃষ্টি করেন যাহা অসাধারণ আখ্যায়িকা-কাব্যের উপযোগী হয় না। নবীনচন্দ্রের প্রেম-বর্ণনা আখ্যায়িকা-কাব্যের ন্যায় সরল কিন্তু সবল নয়। এ প্রেম বস্তুকেন্দ্রিক নয়, আত্মকেন্দ্রিক; সেই কারণে লিরিকধর্ম্মী। এ প্রেম সংঘাতসংকুল আখ্যায়িকার উপযোগী হইতে পারে।

॥ ৫ ॥

রৈবতক কাব্যকে যদি মূল কাহিনীর বীজ বপনের ক্ষেত্র বলিয়া ধরা হয়, কুরুক্ষেত্র কাব্যকে তাহা হইলে কাহিনীর বিকাশের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং আশা করা যাইতে পারে যে রৈবতক কাব্যে যে ঘটনার বীজ উপ্ত হইয়াছে কুরুক্ষেত্র কাব্যে সেই ঘটনারই জটিলতা ও বিস্তার দেখানো হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কুরুক্ষেত্র কাব্য মূল কাহিনী-পরিকল্পনার একটি খণ্ডাংশ মাত্র এবং কবি রৈবতক কাব্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের অনিবার্য্য পরিণতি রূপে গ্রহণ করা যায় না। রৈবতক কাব্যের প্রত্যেকটি ঘটনার পশ্চাতে আর্য্য-অনার্য্যের সংঘাতে ভূমিকাটির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে পাঠকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আরও বহু গৌণ সংঘাতের মধ্যে আর্য্য-অনার্য্যের সংঘাতটিই কাব্যের মূল conflict-এর স্থানাধিকার করিবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাব্যে দেখা গেল কাহিনী মূল-প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছে। তাই রৈবতক কাব্যের পর কুরুক্ষেত্র কাব্য ঘটনার ক্রমানুবন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে উভয় কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের মধ্যে কাহিনীগত কোন গভীর সাদৃশ্য-ধর্ম্ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাব্য-দুইখানিকে একখানি বৃহৎ কাব্যের অংশরূপে গ্রহণ না করিয়া ইহাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা স্বীকার করিলেই যেন কাব্য দুইখানির ঘটনাগত ত্রুটি-

প্রমাদকে লঘু করিয়া দেখা সম্ভব হইতে পারে।

নবীনচন্দ্র তিনখানি কাব্যের মধ্যে একই ভাবকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিলেও কাব্য তিনখানি যে গভীর ভাবৈক-সূত্রে গ্রথিত না হইয়া সমুদ্রবক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহার কারণস্বরূপ ইহাই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে কাব্যে কাহিনীর মধ্যে যেখানেই ভাব-অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়াছে সেখানেই নবীনচন্দ্রের আবেগ কূলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছে। এই কূলপ্লাবী আবেগের তরঙ্গ-আন্দোলন ক্রমশই কাহিনীর মূল কেন্দ্রস্থল হইতে কাব্যকে দূরে সরাইয়া আনিয়াছে। কবিও সেই আবেগের প্রবাহে এমনভাবে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন যে একটু জোর করিয়া আবার কাহিনীর ভূমিস্পর্শ করিতে তাঁহার উৎসাহ দেখা যায় নাই। এই কারণেই নবীনচন্দ্রের কাব্য যে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল, যাত্রাশেষে সে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই। রৈবতক কাব্যের প্রথম চারিটি সর্গের পর সুভদ্রা-অর্জ্জুনের প্রণয়-অনুরাগকে কেন্দ্র করিয়া যে আবেগ-উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই উচ্ছ্বাস সর্ব্বপ্রথম কাব্যের গতিকে মূল লক্ষ্য হইতে দূরে অপসারিত করিয়া আনিয়াছে। ইহার পর কুরুক্ষেত্র কাব্যে উত্তরা-অভিমন্যুর প্রেমানুরাগ এবং সুভদ্রা-উত্তরা প্রভৃতির শোকের প্রবল বাত্যান্দোলন নবীনচন্দ্রের অনুভূতি-সমুদ্রে যে ভয়াবহ ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কাব্যের গতিকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখে পারিচালিত করিয়াছে। অনুমান করিতে পারি, কবি নবীনচন্দ্র আবেগের কুজ্ঝটিকায় কাব্যতরণীর হাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই, এই কারণে কাব্যের রূপায়ণ কাব্যের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। কবি এক তীর লক্ষ্য করিয়া আর এক তীরে নৌকা ভিড়াইয়াছেন। এই প্রবল উচ্ছ্বাস-আবেগই নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পক্ষে অন্তরায়। স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত আবেগ লিরিক রচনার পক্ষেও প্রতিকূলতা করে, লিরিক কবিতার উপাদান প্রগাঢ়-সংহত অনুভূতি। কিন্তু নবীনচন্দ্রের অনুভূতি সংহত নয়, উচ্ছ্বসিত; প্রগাঢ় নয়, তরল। এই কারণে ক্ষুদ্র লিরিক কবিতা অপেক্ষা আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার দিকে নবীনচন্দ্র বেশী মনোযোগ দিয়াছিলেন। আখ্যায়িকা-কাব্যে প্রধান কাহিনীর আবরণের মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার অবসর পায় এবং কাহিনীর বস্তু-আবরণ বা ভূমিকাটুকু থাকে বলিয়া ভাবকে অবিশুদ্ধ রূপেও সেখানে পরিবেশন করা যায়; কাহিনী-পটভূমিকার মেরুদণ্ডটিকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক-অমার্জ্জিত আবেগ-উচ্ছ্বাসও বিন্যস্ত হইতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র লিরিক কবিতার এরূপ কোন বস্তু-অবলম্বন

নাই, সেখানে ভাবকে স্বচ্ছ ও সংহত করিয়া তুলিতে হয়, উচ্ছ্বসিত আবেগকে ভাব-নির্য্যাসে পরিণত করিতে হয়—নবীনচন্দ্রের মধ্যে সে ক্ষমতার অভাব ছিল। তাই তিনি কাহিনী-কাব্যের কাহিনী-ভিত্তিটিকে অবলম্বন করিয়া লিরিকের বাষ্প উদ্গিরণ করিয়াছেন। তাই কবির পরিকল্পনা যদিও অখণ্ড মহাভারত-রাষ্ট্র-সংগঠক কৃষ্ণের জীবন-চিত্র অঙ্কন, তথাপি রৈবতক কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সুভদ্রা-অর্জ্জুনের প্রেমাসক্তি, কুরুক্ষেত্র কাব্যে উত্তরা-অভিমন্যুর দাম্পত্য-প্রণয়।

কুরুক্ষেত্র কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা 'অভিমন্যু-বধ'; রৈবতক কাব্যের যেমন 'সুভদ্রা-হরণ' নামকরণ হইতে পারে, কুরুক্ষেত্র কাব্যের তেমনি 'অভিমন্যু-বধ' নামকরণ সম্ভব। সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি অংশ 'অভিমন্যু-বধ'-এর দ্বারা কাব্য-পরিকল্পনায় কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এমন প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হইবে। অভিমন্যু-নিধনই ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও অধার্ম্মিক ঘটনা। সুতরাং বিরাট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্য হইতে যদি একটি কেন্দ্রীয় অংশ নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলে সেই একটি ঘটনার দর্পণে সমগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের spirit প্রতিবিম্বিত হইতে পারিবে, কবি হয়ত এই উদ্দেশ্যেই অভিমন্যু-নিধন ঘটনাটি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। মহাভারতকার কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াছেন, অধর্ম্মের পরাজয়ে এই রণভূমিতে ধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত-কাব্যের আদর্শ ভিন্ন-প্রকৃতির। তাঁহার কাব্যে কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধ ধর্ম্ম-অধর্ম্মের যুদ্ধ নয়—আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ, জ্ঞাতি যুদ্ধ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রনায়কদের যুদ্ধ অথবা উদার মানবধর্ম্ম ও সংকীর্ণ জড়-ধর্ম্মের যুদ্ধ অথবা ইহার যে-কোনটি। নবীনচন্দ্র ধর্ম্ম-অধর্ম্মের সংঘাতের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবেন—এ ইঙ্গিত তাঁহার কাব্যপরিকল্পনার মধ্যে কোথায়ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। তাই মূল কাব্য-পরিকল্পনার অখণ্ডতার মধ্যে কুরুক্ষেত্র কাব্যের উপযোগিতা নষ্ট হইয়া গিয়া অভিমন্যু-বধ একখানি স্বতন্ত্র কাব্যের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

রৈবতক কাব্যের ন্যায় কুরুক্ষেত্র কাব্যেও প্রধান ঘটনার চতুর্দ্দিকে আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়া কাব্যের বিস্তারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে এবং সেই প্রধান ঘটনার অন্তরালে কৃষ্ণের পরিকল্পনা বক্তৃতার সমষ্টিরূপে বিরাজ করিয়াছে। সুতরাং কাব্য-ত্রয়ীর যে মূল উদ্দেশ্য তাহা কেবল পরিকল্পনার

মধ্যেই বন্দী থাকিয়া কৃষ্ণের মুখে এবং কবির মনে রহিয়া গিয়াছে। পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার কোনরূপ সচেষ্টতা কৃষ্ণ বা কবির মধ্যে দেখা যায় নাই। পরিকল্পনার প্রতিকূল শক্তিও গুপ্তচরের ন্যায় কেবল অন্তরালে থাকিয়া ছলে-চাতুর্য্যে কার্য্যসিদ্ধির উপায় খুঁজিয়াছে, প্রত্যক্ষ ভূমিতে আসিয়া বিরোধ সৃষ্টি করিতে সাহসী হয় নাই। কৃষ্ণও ঘটনা-পরিচালনায় বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ না করিয়া রোম্যাণ্টিক কল্পনাবিলাসীর ন্যায় কেবল স্বপ্নের জাল বিস্তার করিয়াছেন। কাব্য-ত্রয়ীর ঘটনা-পরিচালনায় কৃষ্ণের দায়িত্ব কতটুকু এবং সে ঘটনাগুলি কৃষ্ণের আদর্শের বাস্তব-রূপায়ণে অনুকূলতা করিয়াছে-ই বা কতখানি? এই দুইটি প্রশ্নের ভূমিকায় ঘটনাগুলিকে একবার স্মরণ করিলেই কাব্য তিনখানির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হইবে। কাব্যের ঘটনা-প্রবাহ কোন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী না হইয়া সাধারণভাবে বহিয়া গিয়াছে এবং কৃষ্ণ এই ঘটনাপ্রবাহের ঊর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া ঘটনা-পরিচালনার দায়িত্ব দাবী করিতেছেন। বিশ্ব সংসারের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বিশ্বদেবতাকে যেমন আমরা সংসারের অতি তুচ্ছ-নগণ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী করি, কবিও কৃষ্ণকে সেইরূপ ঘটনার ঊর্দ্ধে রাখিয়া ঘটনা পরিচালনার জন্য তাঁহাকে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে কাব্য-ত্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনার সহিত কৃষ্ণ অতি তির্য্যকভাবে সংযুক্ত হইয়া আছেন। তাই কুরুক্ষেত্র কিভাবে কৃষ্ণের কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইল, কুরুক্ষেত্র কাব্য পাঠ করিবার পরও সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

কুরুক্ষেত্র কাব্যে কৃষ্ণ তাঁহার পরিকল্পনা লইয়া একেবারে নেপথ্যে পড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্থানাধিকার করিয়াছে কৃষ্ণ-ভগিনী সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ-প্রেমী শৈল। বিরোধী পক্ষের বাসুকি-দুর্ব্বাসাকেও অপসারিত করিয়া জরৎকারুর অন্তর্ব্বেদনাকেই কাব্যে আংশিকভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুভদ্রার নারীধর্ম্মের ব্যাখ্যা, উত্তরা-অভিমন্যুর প্রেমাকুলতা, জরৎকারুর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সুভদ্রা-উত্তরা-অর্জ্জুন প্রভৃতির শোক—কুরুক্ষেত্র কাব্যের ঘটনা মোটামুটিভাবে এই কয়েকটি পথে পরিচালিত হইয়াছে। কবি এই ঘটনারাজির উপর কৃষ্ণের প্রভাব-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়া ঘটনাগুলি সংঘটনের দায়িত্ব কৃষ্ণের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কবি হয়ত কৃষ্ণকে বিশ্ব-সংসারের স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে তাঁহার লীলাবিভূতিরূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রভাস কাব্যে যে ভক্তির বন্যা ছুটিয়াছে তাহার জন্য এইখান হইতেই কবি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কবির কাব্য-পরিকল্পনায় কৃষ্ণ অবতাররূপে

গৃহীত হন নাই, নবীনচন্দ্র তাঁহাকে সাধারণ মানবরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি কেমন করিয়া সাধারণ মানবমূর্ত্তির মধ্য হইতে অলৌকিক দেবমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল, কেমন করিয়া সাধারণ মানবের জীবন-কাহিনী ভগবৎ স্তবগানে পরিণত হইল, কবি কোথাও স্পষ্ট করিয়া তাহা দেখাইতে পারেন নাই। অথচ শৈল-সুভদ্রা-জরৎকারু প্রভৃতি কৃষ্ণকে অবতাররূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে এবং কবিও কৃষ্ণকে বস্তুপ্রধান ঘটনা-প্রবাহের উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া তাঁহার লোকোত্তর মহিমা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অভিমন্যুকে বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্র কাব্যখানি স্ত্রী-চরিত্র দ্বারা পরিচালিত। আবার এই স্ত্রী-চরিত্রগুলিও প্রত্যেকেই এক-একটি তত্ত্বের জড়পিণ্ড। সুভদ্রা-শৈল ইহারা একই তত্ত্বের রোমন্থন করিয়া কাব্যকে গোলকধাঁধাঁর পথে ঘুরাইয়া লইয়াছে। কাব্যের একটিমাত্র সচল প্রবাহ অভিমন্যুর কাহিনী। অভিমন্যুর মৃত্যুতে কাহিনী সাময়িকভাবে সমাপ্ত হইয়াছে, নতুবা সুভদ্রার নারীধর্ম্ম, শৈলর কৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন এবং জরৎকারুর বিলাপ কখনই কাব্যকে সমাপ্ত হইতে দিত না।

কবি হয়ত আর্য্য-অনার্য্যের মিলন-সেতুটি নারীচরিত্রের দ্বারা নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই কারণে কাব্যে স্ত্রী-চরিত্র বিশেষভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে।

"পারিব যেদিন মিলি ভগিনী দুজনে
আর্য্য-অনার্য্যের শক্তি করিয়া মিলিত
সেই মহাধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপিত,
রাজা অভিমন্যু, রাণী উত্তরা তোমার
সে মহাপ্রয়াগ তীর্থ দেখিবে যেদিন
আর্য্য-অনার্য্যের শক্তি সুভদ্রা-শৈলজা
বহিতেছে এক স্রোতে জাহ্নবী যমুনা।"

তবে আর্য্য-অনার্য্যের বিরোধকে স্ত্রী-চরিত্র দ্বারা মীমাংসা করা যেন সুড়ঙ্গ-পথে চৌর্য্যাপরাধের ন্যায় গর্হিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা-বাসুকির গুপ্ত পরামর্শ এই বিরোধকে এমন তীব্র ও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল যে স্ত্রী-চরিত্রের স্বভাবজাত ভাবালুতা দ্বারা তাহার মীমাংসা হওয়ায় বিরোধের তীব্রতাই যেন অস্বীকৃত হইয়াছে। আর্য্য-রমণী সুভদ্রা এবং অনার্য্য-রমণী শৈল ও কারু যখন

পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে তখন বিরোধ অপেক্ষা মিলনের উৎকণ্ঠাই তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল। কিন্তু এই মিলন-ধর্ম্মের প্রেরণা তাহারা কোথা হইতে পাইল? শৈল হয়ত অর্জ্জুনের দীর্ঘ সাহচর্য্যে মিলন-ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইতে শিখিয়াছে, কিন্তু শৈলের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র চরিত্রের উপর এই গুরু মিলন-ধর্ম্মের দায়িত্ব অর্পণ করায় আর্য্য-অনার্য্যের মিলন-গুরুত্বকে কি লঘু করা হয় নাই? সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটির কারণ এই, স্ত্রী-চরিত্রের দ্বারা আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের সেতু নির্ম্মিত হইলে বাসুকি ও দুর্ব্বাসা চরিত্র একেবারেই নিঃস্ব হইয়া পড়ে—যেন দুইটি তপ্ত বাক্য প্রয়োগ করিবার জন্যই তাহারা সৃষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ ধারণা জন্মে। কবি সম্মুখ-বিরোধের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের পথে সহজ ভাবালুতার আশ্রয়ে আর্য্য-অনার্য্যের মিলন সংঘটিত করিয়াছেন, ইহাতে আর্য্য-অনার্য্যে বিরোধের যে স্ফুলিঙ্গ একটা ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ইঙ্গিত দিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া কৃষ্ণের জীবন-প্রধান আখ্যায়িকা-কাব্য কৃষ্ণ-মঙ্গল কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র কাব্য হইতে সেই ভাবের সূচনা দেখা দিয়াছে।

রৈবতক কাব্যের ন্যায় কুরুক্ষেত্র কাব্যেও বিরোধী পক্ষের অভাবে কাহিনীর মধ্যে কোথাও জটিলতা ও সংঘাত সৃষ্ট হইতে পারে নাই। রৈবতকে বিরোধী পক্ষে ছিল—বাসুকি-দুর্ব্বাসা। কুরুক্ষেত্রে বাসুকি-দুর্ব্বাসা অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জরৎকারু। কিন্তু রৈবতক কাব্যে জরৎকারুর যে তেজ ও শক্তির আভাস দেখা গিয়াছিল, প্রেমের অপমানে সে যেরূপ দর্পিত-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ ফণা বিস্তার করিয়াছিল, কুরুক্ষেত্র কাব্যে তাহার সে উদ্ধত ফণাও যেন সঙ্কুচিত ও নম্র হইয়া আসিয়াছে। আর্য্যদের প্রতি জরৎকারুর বিজাতীয় ঘৃণাও যেন কৃষ্ণ-প্রেমের সম্মোহন-মন্ত্রে দূরীভূত হইয়া ক্রমশ গভীর কৃষ্ণানুরাগে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে কবি বিরোধী-পক্ষের বাহ্য আন্তর বাধাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া আখ্যায়িকা-কাব্যে ভাগবতের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের একটি পক্ষ প্রবল হইয়া তাহার আদর্শের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে; কিন্তু একমাত্র কবি-চিত্তের সহানুভূতি ও সমর্থনেই উহা সম্ভব হইয়াছে। কোন বিরোধী-শক্তির সহিত সে আদর্শের প্রত্যক্ষ সংঘাত হয় নাই বলিয়া সে জয়ধ্বজাকে পাঠক স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। কাহিনীপ্রধান কাব্যে কবি যাহা যেমনভাবে বলিবেন পাঠক সেইটিকেই সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করিয়া লইবে না; কবি যাহা দেখাইবেন পাঠক কেবলমাত্র তাহাকেই স্বীকার করিবে।

নবীনচন্দ্র কৃষ্ণ-সুভদ্রার আদর্শকে কাব্যের আঙ্গিকের ভিতর দিয়া পাঠককে দেখাইতে পারেন নাই, তিনি এই আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। তাই আমরা এই আদর্শ বুদ্ধি দ্বারা স্বীকার করিলেও হৃদয় দিয়া অনুভব করি না।

॥ ৬ ॥

তিনখানি কাব্যের মধ্যে প্রভাসের দুর্ব্বলতাই সর্ব্বাধিক। এই কাব্যে কাহিনীর সূত্র এত ক্ষীণ, ঘটনার সংখ্যা এত অল্প এবং তাহার ভিত্তিও এত দুর্ব্বল যে মনে হয় কবি যেন জোর করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কাব্য রচনার অভিপ্রায়ে কাহিনীর ধারাটিকে অযথা বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাই প্রভাস-কে একখানি পৃথক কাব্যের মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃত কবির হাতে পড়িলে ইহা একখানি পূর্ণ কাব্যের রূপ লাভ করিয়া বৃহৎ কাব্যের একটি স্বর্গরূপে গড়িয়া উঠিত। কাব্যখানি পড়িলেই বোঝা যায় যে কবির বক্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে; তাঁহার প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়াছে, তথাপি ঝড় থামিয়া গেলেও সমুদ্রবক্ষ যেরূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতে থাকে, নবীনচন্দ্রের হৃদয় তেমনি আন্দোলিত হইয়া কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য এই কাব্যখানির আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়াছে। তাই দৃঢ়বদ্ধ কাহিনী ও নীরন্ধ্র বস্তু সমাবেশের পরিবর্ত্তে ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস এই কাব্যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া কাহিনী-কাব্যের স্বভাবধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র কাব্যেও ভাবের উচ্ছ্বাস কাহিনীর তটবন্ধনকে অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত হইয়াছিল, কিন্তু সে উচ্ছ্বাসের মধ্যে মেরুদণ্ডস্বরূপ মূল কাহিনীকে আবিষ্কার করা তেমন দুরূহ ছিল না। প্রভাস কাব্যে সে কাহিনীর সূত্রটিও দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কাহিনীর উপসংহার করা ভিন্ন কাব্যে বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টির কোন উল্লেখযোগ্য নূতন মৌলিক ঘটনার অবতারণা করা হয় নাই। এই বস্তুদৈন্যই কাব্যখানির পূর্ণ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রবল অন্তরায়।

পূর্ব্ব কাব্য দুইখানিতে কবি কাহিনীর যে জালবিস্তার করিয়াছিলেন প্রভাস কাব্যে তাহা গুটাইয়া আনিয়া কৃষ্ণের জীবনের অন্তিমলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কারু-দুর্ব্বাসা-বাসুকি প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে পূর্ণতা দিবার চেষ্টা

করিয়াছেন। তবে পূর্ব্ব কাব্য দুইখানিতে ঘটনা-প্রবাহ, বিরোধী-তরঙ্গের অভাবে যেরূপ স্তিমিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল, অথবা কৃষ্ণের চরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মোহে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন চরিত্র কল্পনা না করিয়া কবি কৃষ্ণের প্রভাব ও মহিমাকে এমন অপ্রতিহতভাবে প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ দিয়াছিলেন যে, কাব্যের উপসংহার যেন উপসংহারের বহু পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। শূন্য রণাঙ্গনে সাধারণ সৈনিকের যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যেরূপ কোন আশঙ্কা থাকে না, তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষহীন কৃষ্ণের আদর্শের বিস্তার সম্বন্ধেও আমাদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা ছিল না; তাই প্রভাস কাব্য পড়িবার পর, এই কথাই মনে হয় যে কবি যেন একটা অবান্তর অংশের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কবির উচ্ছ্বসিত ভক্তিভাব প্রকাশ করা ভিন্ন, মূল কাহিনী বা ঘটনার দিক হইতে প্রভাস কাব্যের কোন উপযোগিতা নাই।

প্রভাস-এ কবির লিরিক মনোভাব কাব্যের বস্তুভূমিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং বস্তুপ্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যের পরিণতি নাম-কীর্ত্তনের ভাব-বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। আর্য্য-অনার্য্যের সংঘাত, উদার ধর্ম্মমত ও সংকীর্ণ জড়-ধর্ম্মমতের বিরোধ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানের সংগ্রাম, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণদের বিরোধ—এই এতগুলি সংঘাতকে কবি ক্ষীণভাবে বাঁচাইয়া আনিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, নামকীর্ত্তনের ভাব-সমুদ্রে তিনি তাহাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কৃষ্ণের মহাভারত-রাষ্ট্র গঠন-পরিকল্পনা ও দুর্ব্বাসা-বাসুকির স্পর্দ্ধিত উক্তির উপর প্রভাসের 'হরি বোল' ধ্বনি পাষাণ চাপা দিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কবি যে প্রেরণায় তাঁহার কাব্যর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, পরিণতি পর্য্যন্ত কবির সে প্রেরণা স্থায়ী হইতে পারে নাই।

প্রভাসের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণের লীলাবসান। এই প্রসঙ্গে কবি পূর্ব্ব কাব্যের চরিত্রগুলির একটা পরিণতি দিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। জরৎকারুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ-প্রীতি সূচনা হইতেই ছিল, শৈলর কৃষ্ণ-প্রেম কুরুক্ষেত্র কাব্যেই দেখা গিয়াছিল এবং পরিশেষে বাসুকির কৃষ্ণ-ভক্তি দ্বারা অনার্য্যজাতির মধ্যে কৃষ্ণ-মহিমা স্বীকৃত হইল। কূটচক্রী দুর্ব্বাসাও একটা প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণকুলও কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া মহাভারত-রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। দুর্ব্বাসা-শিষ্যের নিকট হইতে জানিতে পারি—

"… — …ব্যাপিয়া ভারত
এক মহারাজ্য ছত্র। ছায়ায় তাহার
খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম
শান্তির কোমল অঙ্কে, হইছে চালিত
শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত।
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ। সৌর শক্তি মত
করিয়াছে নব ধর্ম্ম প্রেম শৃঙ্খলিত।"

সুতরাং কৃষ্ণ যে পরিকল্পনা লইয়া কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন সে পরিকল্পনা পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া কবি সেইভাবেই কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন রহিয়া যায়—কৃষ্ণের পরিকল্পনা কি ভাবে কোথায় সফল হইল?

এই কাব্যে দুর্ব্বাসাকে কবি কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল বিচারেই দুর্ব্বাসার প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কবি কৃষ্ণের একটি লীলারূপে দেখিয়াছেন। এই যুদ্ধে ধর্ম্মের ও ন্যায়ের বিজয়-গৌরবের কাছে খণ্ড বিরোধগুলি শান্ত হইয়াছে, কবি এইরূপ একটি আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দ্বারা ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও কৃষ্ণের উপর আরোপিত হইয়া কৃষ্ণ দেবত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। তাই—

"গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে
লুকাইয়া মুখ রাখে বুকে!
বনের পাখীও যেন গাহিতেছে কৃষ্ণনাম
কৃষ্ণনামে নাচে মৃগ, শিখী,
বহিছে বন-মর্ম্মর, মর্ম্মরিছে তরুগণ
কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি।"

কিন্তু দুর্ব্বাসার মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ—

"কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ লীলা দুর্ব্বাসার।
কৃষ্ণের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের
এই মহানরমেধ করে উদ্‌যাপন!
* * * *

ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয় দাম্ভিক
পোড়াইয়া আধিপত্য দেব ব্রাহ্মণের
রক্ষিতে, করিয়া সেই কৃষ্ণ-নরমেধ
স্থাপিলাম এই শান্তি আসিন্ধু অচল ;—
কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন।”

ইহার পর দুর্ব্বাসা আবার বাসুকিকে এই বলিয়া আর্য্যের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করিতে উৎসাহিত করে—

“কুরুক্ষেত্রে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে ভারতভূমি
অনার্য্য তুলিয়া যদি শির
হয় এবে অগ্রসর লইতে ভারত রাজ্য
কি করিবে একা যদুকুল ?
শিমুল পুষ্পের মত কোথায় যাইবে উড়ি ?
ক্ষত্রজাতি হইবে নির্ম্মূল।”

যদুকুল ধ্বংসের ব্যবস্থাও দুর্ব্বাসা ইতিমধ্যে করিয়া রাখিয়াছেন,

“কামানল ঈর্ষানল জ্বালায়েছি যেইরূপ
যদুকুল হইবে নির্ম্মূল।”

কিন্তু অনার্য্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠার এমন সুযোগ পাইয়াও বাসুকি সে সুযোগ ব্যবহার করিতে উৎসাহ বোধ করে নাই। কৃষ্ণের মহিমা তাহার হৃদয়ে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে সে নিজেই নিজের পরাজয়কে স্বীকার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে। এবং ইহার কিছু পরেই তাহার দেহে বৈষ্ণব-ভক্তোচিত সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণও পরিস্ফুট হইয়াছে—

“হইতেছে বাসুকির স্বেদ কম্প ঘন ঘন।
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া দেহ অধীর
পড়িতে ; আপন অঙ্কে ভদ্রা লইলেন শির।”

এইভাবে কবি কৃষ্ণভক্তির দ্বৈপায়ন-হ্রদে কাব্যের বিভিন্নমুখী ঘটনা-প্রবাহকে মিলিত করিয়াছেন।

প্রভাসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাসুকি-সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ-জরৎ-কারুর মিলন। অনার্য্য ভ্রাতা-ভগ্নী যথাক্রমে সুভদ্রা-কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত ছিল। কাব্যে অবশ্য সুভদ্রা-বাসুকির প্রেমানুরাগের ইঙ্গিতটুকু মাত্র আছে ; সেই সঙ্গে এই ইঙ্গিতও আছে যে সুভদ্রার সহিত বাসুকির পরিণয়ে অসম্মতিই

কৃষ্ণের প্রতি বাসুকির বৈরভাবের অন্যতম কারণ। বাসুকির উক্তিতে তাহা স্পষ্ট-ভাবে জানা গিয়াছে—

"........ভাবিলাম
মথুরার সিংহাসন লইব মাগিয়া
প্রাচীন অনার্য্য রাজ্য, লইব মাগিয়া
সুভদ্রার করপদ্ম—কমল কলিকা।"

কিন্তু প্রভাসে দেখা গেল সুভদ্রার সহিত বাসুকির মিলন পূর্ণ হইয়াছে; তবে প্রিয়রূপে নয়, পুত্ররূপে। মধুর-রসের সম্পর্ক বাৎসল্য-রসে রূপান্তরিত হইয়াছে। মহাভাবের আবেশে বাসুকি যখন মূর্চ্ছিত হইল, তখন সুভদ্রা তাহাকে নিজ অঙ্কে লইলে বাসুকি বলিয়াছে—

"হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কি বা কামনলে
পূজিয়াছি পত্নীভাবে, চেয়েছি হরিতে বলে।
* * * *
আজ তুই প্রেমময়ী মা আমার! মা আমার!
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে বুকে
সে অঙ্কে শিশুর মত বাসুকি ঘুমাবে সুখে।"

আর একটি মিলন-দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে 'বীণা পূর্ণতান' নামীয় নবম সর্গে। সে মিলন জরৎকারু ও কৃষ্ণের মিলন। অনার্য্য রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় দুর্ব্বাসার সহিত বাসুকির যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির বাস্তব-রূপ দুর্ব্বাসা-জরৎকারুর পরিণয়। এই পরিণয় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অনার্য্যের শক্তি সঞ্চয়ের সুদৃঢ় ভিত্তি। সুতরাং জরৎকারুর নিকট কৃষ্ণ যেমন জাতিশত্রু তেমনি ব্যক্তি-শত্রু। বিজাতীয় ক্রোধের সহিত ব্যক্তিগত প্রেমের অসম্মানজনিত ক্ষোভ সংযুক্ত হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরৎকারুর কোমল নারীহৃদয় বজ্রকঠোর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কবি কৌশলে জরৎকারুর মধ্যে কৃষ্ণ-বিদ্বেষকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই। রৈবতক কাব্যের কয়েকটি সর্গে কৃষ্ণের প্রতি জরৎকারুর প্রকৃত বিদ্বেষ-ভাব দেখা দিলেও ক্রমশ প্রেমের খরস্রোতে তাহার চিন্তা-ভাবনা কৃষ্ণাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে। মুখে সে যতই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছে, তাহার মন ততই কৃষ্ণের দিকে ছুটিয়াছে। প্রেমের অসম্মানজনিত মৌখিক ক্ষোভ কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ আসক্তিকেই ব্যঞ্জিত করিয়াছে। এই ব্যঞ্জনা পরে স্পষ্ট হইয়াছে 'বীণা পূর্ণতান' নামীয় সর্গে। এই সর্গে দেখা গেল প্রজ্জ্বল

প্রেম কূলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছে, যে প্রেম মৌখিক স্বীকৃতি পায় নাই অন্তরে সে লোকোত্তর রাধাপ্রেমে পরিণত হইয়াছে—

"তুমি নয়নের আভা তুমি বাসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল।
তুমি মম চির-সুখ, তুমি মম চির-দুখ
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল।"

কৃষ্ণকেও দেখি তিনি কারুর জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন—

"পাইয়াছ বহু দুঃখ এস বক্ষে প্রেমময়ি।
উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তিধাম।"

পরিশেষে গীতার বাণী অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণ বাসুকিকে বলিয়াছেন—

"যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্ব-ভাবে মানব করে মম অনুসার।"

"ভ্রাতা-ভগ্নী দুইজন, চাহিয়াছ শত্রুভাবে
পাইয়াছ শত্রুভাবে আজি দুইজন।"

তাহা হইলে দেখিতেছি নবীনচন্দ্রের কাব্যের সূচনায় কৃষ্ণের মানব-রূপ, অন্তে দেব-রূপ। কবি যদি সাধারণ মানবকে দেবত্বের স্তরে উন্নীত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য অমর হইত; কিন্তু মানব আপনাকে দেবত্বে রূপান্তরিত করে নাই। কবির অন্তরের ভক্তিভাব তাঁহার নায়কের মানবদেহে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সেই কারণে কাব্য-ত্রয়ী অতি সাধারণ স্তরে নামিয়া আসিয়াছে।

॥ ৭ ॥

এইবার কাব্য-ত্রয়ীর কয়েকটি প্রধান চরিত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর কাহিনী বিশ্লেষণ ও ঘটনা বিচার করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে আখ্যায়িকা-কাব্যের মৌলিক গঠনরীতিকে কবি অনুসরণ করেন নাই, অথবা কবিপ্রকৃতির অনুকূল না হওয়ায় অনুসরণ করিতে গিয়াও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অনুরূপ ব্যর্থতার পরিচয় রহিয়াছে

চরিত্র-রূপায়ণেও। ঘটনা ও চরিত্র কাহিনী-কাব্যের এই প্রধান দুইটি অংশ সার্থকভাবে রূপায়িত না হইবার জন্যই নবীনচন্দ্রের কাব্য-পরিক্রমা সার্থক হইতে পারে নাই।

পাত্র-পাত্রীর মুখে ভাষা জুড়িয়া দিলেই চরিত্র সৃষ্টি হয় না। চরিত্রের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য—ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র (life and personality), নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে তাহার অভাব। নবীনচন্দ্র কোন চরিত্রকেই তাহার নিজ পরিচয়-জ্ঞাপক ব্যক্তিত্ব দান করিতে পারেন নাই। সেক্‌সপীয়ারের নাটকে জনসাধারণের দৃশ্যে যে চরিত্রগুলি আঁকা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের রেখাকৃতির ন্যায় তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন। কেহই অন্যের সহিত মিশিয়া যায় না, প্রত্যেকের মুখেই স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর শোনা গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে সামান্য দুই-একটি কথার মধ্যেই তাহারা নিজ ব্যক্তিত্বের দ্বারা এমনভাবে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে যে একবার তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিলেই দর্শক-পাঠক তাহাদের চিনিয়া রাখে, দ্বিতীয়বার কথা বলিবার সময় ভুল করে না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্যে কে কখন কথা বলিতেছে সব ক্ষেত্রে তাহা বুঝিয়া ওঠা শক্ত। বক্তব্যের উপর বক্তার স্বাতন্ত্র্য-চিহ্ন অঙ্কিত হইতে পারে নাই বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। তাই নবীনচন্দ্রের চরিত্রগুলি তাহাদের ব্যক্তিত্বকে উদ্‌ঘাটিত করে নাই, ঘটনাকে বিবৃত করিয়াছে। কাহিনীর প্রয়োজনে চরিত্র আসিয়াছে, চরিত্রের প্রয়োজনে কাহিনী আসে নাই। চরিত্র কাহিনীর বাহন হইয়াছে। নীরস বর্ণনার দ্বারা কাহিনী বিবৃত করিলে কাব্য একঘেয়ে হইয়া উঠিবে, তাই স্থানে স্থানে কাহিনীর সূত্রকে টানিয়া রাখিবার জন্য, এক-একটি বিশেষ তত্ত্বকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, কোন ঘটনাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করিবার জন্য চরিত্রগুলির অবতারণা করা হইয়াছে। কাহিনী-প্রধান বা চরিত্র-প্রধান কোন শ্রেণীর কাব্যেই ঠিক এই উদ্দেশ্যে চরিত্র পরিকল্পনা করা হয় না। এই কারণেই পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবীনচন্দ্রের কাব্যের বিষয়-বস্তু প্রবন্ধের উপযোগী, উপস্থাপন-ভঙ্গীটিও প্রবন্ধের ন্যায়। তবে পাত্র-পাত্রীর ভিড়ে, ভাব-অনুভূতি ও হৃদয়-সংঘাতের বাহুল্যে ইহার গঠন-পদ্ধতি কিছুটা উপন্যাসের গঠন-পদ্ধতির সমধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ চরিত্র-প্রধান কাব্য; তাই রাবণ-চরিত্রের মধ্যে মধুসূদন রামায়ণ হইতে স্বতন্ত্র যে ভাব-ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, রাবণ-চরিত্র হইতে পৃথক করিয়া নয়, রাবণ-চরিত্রের সহিত এক করিয়া-ই তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহা রাবণকে অতিক্রম করিয়া মধুসূদনের

মৌলিক ব্যঞ্জনা প্রধান হইয়া উঠে নাই ; রাবণের অন্তিম জীবন-নাট্যের প্রতিটি অঙ্কের, প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যেই সে ব্যঞ্জনা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের মধ্যে যে সমন্বয়-সংগঠন আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আরও ব্যাপক, আরও গভীর, আরও সুদূরপ্রসারী ; সুতরাং রাবণ অপেক্ষা কৃষ্ণ আরও সজীব, আরও জীবন্ত, আরও মহৎ হইয়া উঠিবে পাঠক এইটি প্রত্যাশা করে। কিন্তু নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের আদর্শ-মতবাদকে কৃষ্ণ-চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, এবং কৃষ্ণ-চরিত্রকে গৌণ করিয়া কাব্যে কৃষ্ণের আদর্শ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। আদর্শ-মতবাদকে ব্যাখ্যা করা সহজ, ইহা প্রবন্ধকারের বা ঐতিহাসিকের কর্ম্ম। কবির ধর্ম্ম আদর্শকে চরিত্রের জীবন ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে সত্য করিয়া তোলা ; জীবনের সঙ্গে তত্ত্বের মিলন ঘটানো। মধুসূদন তাহা পারিয়াছেন, নবীনচন্দ্র পারেন নাই।

নবীনচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র-ই রোম্যান্টিক। ক্লাসিক পরিবেশের মধ্যে এই রোম্যান্টিক চরিত্রগুলির বিসদৃশ আচরণ-ব্যবহার যে কতখানি হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে তাহা কাব্য-ত্রয়ীর সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাহারাই বুঝিতে পারে। তাহারা সকলেই নিসর্গ ও প্রেমের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে এমনভাবে সচেতন, নিসর্গ-শোভা ও প্রেমানুরাগের মধ্যে তাহারা এমন গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছে যে কাহিনীর সহিত প্রয়োজন-সূত্র ছিন্ন করিয়া তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কাহিনী-প্রবাহের মধ্যে এক-একটি রোম্যান্টিক আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ রোম্যান্টিক আবর্ত্ত কাহিনী-প্রবাহের পদে পদে। ক্লাসিক-কাব্যের মধ্যে মানব-প্রকৃতির সূক্ষ্মতা ও জটিলতা পরিহার করিয়া মানুষের সরল বিশ্বাস ও প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাই ক্লাসিক কাব্যের চরিত্রগুলি প্রেমকে দেহ-সম্পর্কবিচ্যুত এক অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি রূপে কল্পনা করিতে পারে না ; প্রেম সম্পর্কে তাহাদের অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু রোম্যান্টিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল অস্পষ্টতা ও জটিলতা। স্পষ্টতার সীমার মধ্যে তাহারা কখনই ধরা দেয় না, অস্পষ্টতার মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ঘুরিয়া ফেরাতেই তাহাদের সার্থকতা। তাই রোম্যান্টিক-চরিত্র প্রেমকে দৈহিক ভোগবাসনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লয় না, প্রেম ও নিসর্গ তাহাদের কাছে অসীম রহস্য ও বিস্ময়ের বস্তু। ইহার গভীরে যে অনন্ত মাধুর্য্য, সেই মাধুর্য্য-উপলব্ধিতেই রোম্যান্টিক চরিত্রের সার্থকতা। নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রকে একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মধ্য হইতে এই রোম্যান্টিক বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া পড়িবে।

নবীনচন্দ্রের পঞ্চাশ সর্গব্যাপী তিনখানি কাব্যে বিচিত্ররূপী বহু চরিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; বাহ্যরূপের অন্তরালে তাহারা প্রত্যেকেই যেন একই ভাবের ও একই রূপের মানুষ। তাই যখন কাহিনী অনুসরণ করিতে করিতে আমরা এক-একটি নূতন চরিত্রের সম্মুখীন হই, তখন স্পষ্টই মনে হয় এই কাব্যেই তাহাকে কোথায় যেন আর একবার দেখিয়াছি। সে যেন কাব্যের নূতন আগন্তুক মানুষ নয়। ইহা দ্বারা কবির বিচিত্ররূপী চরিত্র-সৃষ্টির অক্ষমতাই প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র; বঙ্কিমচন্দ্রও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-জীবনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে যতগুলি বিচিত্ররূপের মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল প্রায় একই সমাজের ও একই পরিবেশের লোক, কিন্তু উভয়ের জীবন-সমস্যার মধ্যে কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান! তেমনি ব্যবধান সূর্য্যমুখী-ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী-রোহিণীর মধ্যে। ইহার সহিত শরৎচন্দ্রের তুলনা করিলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব স্পষ্টই ধরা পড়িবে। প্রকৃত জীবন-শিল্পী একই মানস-লোক হইতে বিচিত্র প্রকৃতির চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন, ইহাকেই বলিতে পারি এককে বহুতে বিস্তৃত করিবার দুর্ল্লভ ক্ষমতা। নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই ক্ষমতাটির অভাব ছিল।

কাব্য-ত্রয়ীর প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি কাব্যের মূল সূত্রটি ধরাইয়া দিয়া নেপথ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কাব্য-তরণী একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ধাক্কা খাইতে খাইতে কোনক্রমে যে লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে লক্ষ্য কবির পরিকল্পিত নয়। প্রধান চরিত্র কাব্যের নেপথ্যে থাকিলে যে তাহা কাব্যের পক্ষে একটা অপকর্ষের কারণ হইয়া পড়ে তাহা নয়, কিন্তু সেরূপ কাব্যের প্রক্রিয়া ভিন্ন। সেখানে প্রধান চরিত্র নেপথ্যে থাকিয়াও অদৃশ্য সূত্রকারের ন্যায় কাব্যের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। পাঠক প্রধান চরিত্রটিকে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার প্রভাব এত অধিক মাত্রায় প্রধান হইয়া উঠে যে তাহার অনুপস্থিতির দ্বারাই যেন সে কাব্যের সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকে। নবীনচন্দ্র সে পথও অবলম্বন করেন নাই, তাঁহার কাব্যের যে পরিকল্পনা তাহাতে এরূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া সঙ্গতও হইতে পারে না। কারণ যে কাব্যে প্রধান চরিত্র নেপথ্যে থাকে, সে কাব্যে প্রথমেই অন্যান্য চরিত্র হইতে প্রধান চরিত্রটির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করিয়া

লওয়া হয়; কিন্তু নবীনচন্দ্র যে কৃষ্ণকে কাব্যের নায়করূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা-ই তাঁহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং সেক্ষেত্রে এই প্রধান চরিত্রটিকে সর্ব্বপ্রকার বিরোধী-ঘটনার সম্মুখীন না করিয়া তাহাকে নেপথ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিলে কাব্যের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে তত্ত্বরূপে এবং প্রভাসে দেববিগ্রহরূপে বন্দী রাখিয়া কাব্যের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়াছেন।

অনার্য্যদের সম্পর্কে কৃষ্ণের বিরূপ মনোভাব স্পষ্টভাবে কোথায়ও ব্যক্ত না হইলেও তাঁহার আচরণ উদার সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বাসুকি মথুরার সিংহাসন ও সুভদ্রার পাণিপ্রার্থনা করিলে কৃষ্ণের অসম্মতিসূচক উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে—

"বাসুকি! অনন্ত ঋণে ঋণী আমি তব,
জান তুমি উগ্রসেন ভোজবংশ পতি,
এই সিংহাসন তাঁর, করিতে অর্পণ
তিলার্দ্ধ তাহার মম নাহি অধিকার।"

এই উক্তিতে বাসুকি যদি মনে করে যে সততার আবরণে তিনি অনার্য্য দাবীকে অস্বীকার করিয়া আর্য্যদের স্বার্থরক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে সে অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। অনার্য্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া আর্য্যেরা তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছে চন্দ্রচূড়ের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়—

"নাগরাজ! তস্কর সে আজি,
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ
ইন্দ্রপ্রস্থের ইন্দ্রমুখে বিহরে যাহারা
সাধু তারা নাগরাজ তস্কর সে আজি!"

তাহা হইলে মথুরার সিংহাসনে বাসুকির ন্যায্য অধিকার হইতে কৃষ্ণ তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আর কৃষ্ণের মহাভারত-রাষ্ট্র গঠন-পরিকল্পনা আর কিছুই নয়, অনার্য্য জাতি মাথা উঁচু করিয়া আর্য্যদের বিতাড়িত করিতে না পারে তাহার জন্য প্রস্তুতি। এই কারণেই প্রতিবেশী নৃপতিগণের ঐক্য-সংহতির উপর তিনি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আত্মকলহ ও জাতি-বৈরম্যের রন্ধ্রপথ দিয়া অনার্য্যশক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ইহার জন্যই তিনি মগধ-পাঞ্চাল-চেদী প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে সাম্য-ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন। কৃষ্ণ-ব্যাসের কথোপকথনের মধ্যে অনবধানতাবশত

একবার এই প্রসঙ্গটি উঠিয়াছিল—

"যেইরূপে আর্য্যজাতি অনার্য্য আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য্য দুর্ব্বলে
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
একদিন।"

ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈল প্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয়ের মধ্যে অনার্য্য রাজ্য ছিল না; সুতরাং বুঝিতে হইবে ইহা আর্য্যদের প্রস্তুতি অনার্য্যদের বিরুদ্ধে, এবং প্রকাশ্যে না হউক প্রচ্ছন্নভাবে একটি বিরোধী পক্ষকে স্মরণ করিয়াই এই প্রস্তুতি চলিতেছিল।

কৃষ্ণের নিজের জীবনের মধ্যে অনার্য্যদের প্রতি হিংসার স্পষ্ট প্রমাণ থাকায় পূর্ব্ব অনুমান দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। বাসুকি সুভদ্রার পাণিপ্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ বলিলেন—

"এখনো বালিকা ভদ্রা, কেমনে তাহারে
অর্পিব পাশব বলে? হে নাগেন্দ্র! হেন
পৈশাচিক পরিণয় আর্য্যধর্ম্ম নহে।"

ইহা বিচক্ষণ স্বার্থান্বেষী কূট রাজনৈতিকের উক্তি। সুভদ্রার প্রতি বাসুকি যখন আসক্ত হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে সুভদ্রা নাবালিকা নয়। কৃষ্ণের এই প্রত্যাখ্যান-উক্তির মধ্যে অনার্য্য হইতে আর্য্যদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য গড়িয়া তোলাই যাঁহার জীবনের ব্রত, সঙ্কীর্ণ আর্য্য-অনার্য্য ধর্ম্মের পার্থক্য তাঁহার কাছে বড় হইয়া উঠিবার কথা নয়; 'হেন পৈশাচিক পরিণয় আর্য্যধর্ম্ম নহে'—ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণের ধর্ম্ম উদার মানবধর্ম্ম নয়, সঙ্কীর্ণ আর্য্যধর্ম্ম এবং আর্য্যেতর ধর্ম্ম হইতে এই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি স্বীকার করেন।

আবার জরৎকারুকে যেভাবে কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং জরৎকারু যেভাবে কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করিয়াছে, সেই অভিযোগ যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করি তাহা হইলে অনার্য্যদের প্রতি কৃষ্ণের ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধার ভাবই স্পষ্ট হয়। দীর্ঘ এক বৎসরের প্রেমাভিনয় করিবার পর কৃষ্ণ কারুকে প্রত্যাখ্যান

করিয়াছেন এই বলিয়া—

"কিন্তু যেই মহাব্রতে করিয়াছি যেই মতে
এই ক্ষুদ্র আত্মসমর্পণ
করিলে সে ব্রত ভগ্ন তুমি কি রমণী রত্ন
হেন পাপ ক্ষমিবে কখন?
চুম্বিয়া ললাট মম,— এস! সহোদরা সম,
হও ব্রতে সহায় আমার,
এস ভগ্নী দুই প্রাণ নারায়ণে করি দান
আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার।"

কৃষ্ণের ব্রত কি? জরৎকারু সে ব্রতে প্রতিবন্ধক-ই বা হইল কেমন করিয়া? প্রেম-প্রীতি-ই যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে জরৎকারুকে গ্রহণ করিলে তো সেই ব্রতের উদ্‌যাপন পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইতে পারিত, জরৎকারুকে অসম্মান করিয়া-ই তো কৃষ্ণ তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। তাই বুঝিতে হইবে জরৎকারুর অভিযোগ-ই সত্য—

"বুঝিলাম নিরমম! তব ব্রত তব পণ,
অনার্য্যের শোণিতে অধম
আর্য্য-রক্ত কলুষিত করিবে না কদাচিত
এই ব্রত এই তব পণ।"

কৃষ্ণ নীরবে এই অভিযোগ সহ্য করিয়া ইহার সত্যতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আবার একদিন নিজেকে 'ক্ষুদ্র মানব কি ছার' মনে করিয়া তিনি যে জরৎকারুকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়াছিলেন সেই ক্ষুদ্র মানব প্রভাসে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কারুকে বলিয়াছেন—

"পাইয়াছ বহু দুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি!
উভয়ের লীলা শেষ চল শান্তিধাম।"

একটি মানব-লীলা আর একটি দেব-লীলা, তাই কবির রুচিতে ইহা কল্পনা করিতে বাধে নাই; কিন্তু দেব-লীলার যথার্থ মর্ম্ম যাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না, তেমন পাঠকের রুচিকে ইহা পীড়িত করে। সে কথা স্বতন্ত্র। তবে ইহা হইতে এটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে কবি খুব কৌশলে মহাভারতীয় ঘটনাকে কৃষ্ণের উদার ধর্ম্মাদর্শের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ মৌলিকত্ব দাবী করিলেও মাঝে মাঝে এমন দুই-একটি অসঙ্গতি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে যে তাহা দ্বারা সমগ্র ব্যাখ্যাটি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাও কৃষ্ণের ন্যায় তত্ত্বরূপিণী। রৈবতক কাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গ দেখিয়া আশা করা গিয়াছিল যে কৃষ্ণের নবীন ধর্ম্মধ্বজার বাহক হইবে অর্জ্জুন ও সুভদ্রা। কবি হয়ত কুরুক্ষেত্র কাব্যেও সেইরূপ একটা আভাস আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হইতে পারে নাই। অর্জ্জুন কাব্যমধ্যে একেবারে নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছে। তবে কবি সুভদ্রাকে প্রাধান্য দিয়া নারীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেদিক দিয়া সুভদ্রাকে কৃষ্ণের পরিপূরকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুভদ্রা যেন কৃষ্ণের আর একটি দিক। কৃষ্ণ রাষ্ট্রগত ও জাতিগত বৃহত্তর সমস্যা-সংকটের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়া বাহিরের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সুভদা নারীর সেবাব্রত প্রচার করিয়া গৃহের শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুরুষের আদর্শ নিষ্কাম কর্ম্ম-ব্রত, নারীর আদর্শ নিষ্কাম সেবা-ব্রত; কৃষ্ণ-সুভদ্রার চরিত্রে এই দুইটি দিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কিন্তু কবি সুভদ্রাকে প্রথমেই যেরূপ ব্রীড়াসংকুচিত লজ্জানম্র রূপে দেখাইয়াছেন, তাঁহার মুখের উপর লজ্জার অবগুণ্ঠন টানিয়া তাঁহাকে এমন নির্ব্বাক-কুণ্ঠিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে কুরুক্ষেত্রে তিনি যখন লজ্জাবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া শিবিরে শিবিরে যুদ্ধাহতদের সেবা করিয়া ফেরেন তখন সে দৃশ্য যেন একটু বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। পার্থিব জগতের ঊর্দ্ধে যাহার ধ্যাননেত্র ভাবলোকে নিবদ্ধ থাকিত তাহার ভাবলোক হইতে প্রত্যক্ষ কর্ম্মলোকে উত্তরণ কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে। সুভদ্রা-চরিত্রের মধ্যে সেবা ও কর্ম্মের দুঃসহ ভাব বহন করিবার শক্তি ও দৃঢ়তা কবি দেখাইতে পারেন নাই।

শৈল চরিত্রটির উপর কবি একটা গুরুতর দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়াছেন। আর্য্য-অনার্য্যের মিলনের সেতু নির্ম্মাণের জন্য শৈলর দায়িত্বই বেশী। কিন্তু চরিত্রটির উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কাব্যে ততখানি গুরুত্ব তাহাকে দেওয়া হয় নাই। রৈবতক কাব্যে অর্জ্জুনের অনুচররূপে প্রভুর সেবার মধ্যে সে নিজেকে এমনভাবে মিলাইয়া দিয়াছে যে পৃথক করিয়া সে আমাদের চোখে পড়ে না। অর্জ্জুনের পাশে সে অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং সেই শৈল যখন কুরুক্ষেত্র কাব্যে গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে, আর্য্য-অনার্য্যের মিলন ঘটায়, তখন পাঠক বিস্ময়বোধ করে।

চন্দ্রচূড়ের কন্যা শৈল, পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্য ভৃত্যবেশে তাহার কাছে ছিল। কিন্তু কবি শৈলর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার দুর্ব্বার বাসনাকে স্থায়ী হইতে দেন নাই। কাব্যে যখন সে প্রথম

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তখন আর্য্য বা অর্জুনের প্রতি বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া সে অর্জ্জুনের প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; সুতরাং বৈরভাব অন্তর্হিত হইয়া কিভাবে মৈত্রীভাব তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল, কেন উগ্র শত্রুভাব বিসর্জ্জন দিয়া আর্য্য-অনার্য্যের মিলন-কামনায় তাহার চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়োজিত হইয়াছে—এইটিই শৈল-চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এইটি কবি শব্যের নেপথ্যে রাখিয়াছেন। তাহাকে কাব্যে যখন স্থান দিয়াছেন তখন তাহার মন এত পরিপক্ব, এত সবল যে সেখানে কোন পরিবর্ত্তনের চিহ্ন পড়িতে পারে না। সে তাহার দেহের, মনের ও বুদ্ধির যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া কেবল আদর্শ-প্রচারের ব্রত লইয়া কাব্যে উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণে শৈল-চরিত্র একটা তত্ত্বের স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

আবার রৈবতক কাব্যে অর্জ্জুনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শৈল যে অন্তর্হিত হইয়া গেল তখন আমরা আশা করিয়াছিলাম যে কাব্যে শৈলর প্রয়োজন যেমন সমাপ্ত হইল এবং অর্জ্জুনের কাছে তাহার প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া সে যেন কাব্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাব্যে তাহাকে আবার নূতন ভাবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আমরা আরও বিস্ময়বোধ করি। রৈবতক হইতে বিদায় লইবার পর এবং কুরুক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে কোথায় ছিল, কেমন করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃঢ় আসক্তির ধূপকে সে কৃষ্ণ-নামামৃতের আগুনে দগ্ধ করিতে পারিয়াছে—ইহা শৈল-চরিত্রের আর একটি গুরুতর অংশ ; কবি ইহাকেও কাব্যের নেপথ্যে সংঘটিত হইতে দিয়াছেন।

আখ্যায়িকা-কাব্যের চরিত্রের পরিবর্ত্তনকে বাস্তব এবং সত্য প্রমাণিত করিবার জন্য তাহাদের অন্তঃপ্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হয় না, সাধারণত ঘটনাই চরিত্রের মানস-পরিবর্ত্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ঘটনা ও চরিত্র এমন গভীরভাবে সংবদ্ধ করিয়া দেখানো হয় যেন একটি আর একটির পরিপূরক, একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না। সে কারণে আখ্যায়িকা-কাব্যের ঘটনার দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ভাগ্যের উপরও দ্রুতগতিতে পট পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু কোথাও সে পরিবর্ত্তনকে আকস্মিক বা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঘটনার ভূমিকায় চরিত্রের পরিবর্ত্তন এমন স্পষ্টভাবে দেখানো হয় যে কোথায়ও কবি পাঠকের যুক্তি ও বুদ্ধির উপর অত্যাচার করেন না। সেই কারণে চরিত্রগুলি প্রহেলিকা হইয়া উঠে না ; কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্যের আরও বহু চরিত্রের ন্যায় শৈল চরিত্র কেমন যেন প্রহেলিকার ন্যায় মনে হইয়াছে ;

সে যেন একটা অশরীরী বাণী।

কাব্যের মধ্যে জরৎকারু একটি দীর্ঘ রোম্যান্টিক জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। সে তাহার নিজের ভাগ্যদেবতার কঠোর হস্ত হইতে যে আঘাত পাইয়াছে তাহার সহিত কাব্যের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ নাই; কিন্তু কবি জরৎকারুর ট্রাজেডিকেও কাব্যের মূল কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। এক দুর্ব্বাসা চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করা ভিন্ন কারুর ব্যক্তি-জীবনের ট্রাজেডির সহিত কাব্যের স্পষ্ট যোগ কোন্ সূত্রে? ঘটনা-প্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যে ঠিক এইরূপ ঘটনা-নিরপেক্ষ অন্তঃপ্রবৃত্তির সংঘাত-সঙ্কুল চরিত্রের স্থান হইতে পারে না। কৃষ্ণের জীবনের সহিত নিজের জীবনকে বাঁধিতে গিয়া কারু একবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান-কাহিনী বর্ণনা করিয়া কবি অসতর্কভাবে তাঁহার নায়ক চরিত্রকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং কারু চরিত্রের মূল কল্পনাই কাব্যের একটি দুর্ব্বল অংশ। ইহার পর দুর্ব্বাসার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কাব্যের একটা প্রধান প্রবাহের সহিত সে যুক্ত হইতে পারিয়াছে এবং তাহা দ্বারাই কাব্যের মধ্যে সে তাহার প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বাসার চারিত্রিক নীচতা আবিষ্কার করিয়া দুর্ব্বাসার প্রতি কারুর মন যখন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে তখন কাব্যের মূল প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কাব্যে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কারুর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-অভিঘাতে কাহিনীর সহিত কাব্যের কোন যোগ নাই। যে-কাব্যে আর্য্য-অনার্য জাতি-সংঘাত, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্ণ-সংঘাত এবং রাষ্ট্র-সংঘাতকেই মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়রূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে সেখানে কারুর ব্যক্তি-জীবনের দুঃখাভিঘাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কবি কারু-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্ব্বাসার প্রতি তাহার দারুণ বিমুখতা এবং কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি, কৃষ্ণের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দুর্ব্বাসার পত্নীত্ব স্বীকার এবং কৃষ্ণের প্রতি বিরাগের ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্ন অনুরাগ যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু কারু আধুনিক উপন্যাসের চরিত্র, কবি মহাভারতীয় যুগের একটি চরিত্রের দেহে আধুনিক যুগের মন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে অসঙ্গতি সত্ত্বেও কাব্য-ত্রয়ীতে কারু-ই সর্ব্বাপেক্ষা সু-অঙ্কিত চরিত্র।

কবি সর্ব্বাপেক্ষা অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন বাসুকি চরিত্রাঙ্কনে। রৈবতক কাব্যের চতুর্থ সর্গে কবি বাসুকির মধ্যে যে তেজ ও শক্তির স্ফুলিঙ্গ দেখাইয়া-

ছিলেন সে-স্ফুলিঙ্গ বৃহত্তর অগ্নিকাণ্ড না ঘটাইয়া কেন যে ভক্তির জলোচ্ছ্বাসে নির্ব্বাপিত হইল, তাহা বোঝা শক্ত। দুর্ব্বাসার সহিত সে যে গুপ্ত-কক্ষে মন্ত্রণা করিয়াছিল এবং সেখানে আর্য্যদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের অব্যর্থ সুযোগ পাইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় যে উল্লাস-হুঙ্কার দিয়াছিল, সে হুঙ্কার গুপ্ত-কক্ষের বাহিরে আসিয়া কাব্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, গুপ্ত-কক্ষের চারি দেওয়ালের মধ্যেই সে হুঙ্কার অর্গলবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া সিংহকে যে নবীনচন্দ্র কিভাবে মুষিকে পরিণত করিয়াছেন, বাসুকি-চরিত্র তাহার উদাহরণ। রৈবতকের সিংহ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-নিনাদের মধ্যে শঙ্কিত হইয়া আত্মগোপন করিয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে গায়ে হরিনাম লিখিয়া, মুখে 'হরিবোল' বলিতে বলিতে প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

দুর্ব্বাসাকে কবি অনেকটা শকুনি চরিত্রের আদর্শে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তবে কাব্যের অন্য সমস্ত চরিত্রের ন্যায় দুর্ব্বাসাকেও যে কবি হরি-নামের নামাবলী গায়ে দিয়া কাব্যে উপস্থিত করেন নাই, সেজন্য প্রত্যেক পাঠক কবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। দুর্ব্বাসাকে এইরূপ হীনভাবে অঙ্কিত করিয়া কবি ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী মনের পরিচয় দিয়াছেন। দুর্ব্বাসা এক অদ্ভুত চরিত্র। সে জগৎজোড়া এক জাল মেলিয়া বসিয়া আছে, পাখী যে পথে উড়িয়া যাক্, জালে পড়িবে। আর্য্য-অনার্য্য সংঘাত বাধিলেই তিনি খুশী, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিলেও ভাগ্যচক্র তাঁহার অনুকূলেই ঘুরিবে। তবে তিনি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে আগুন জ্বলিতেছে সেখানে এক মুষ্টি খড় নিক্ষেপ করিয়া আগুন জ্বালাইবার কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি কখনও হতাশ হন নাই। প্রভাসে যখন পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ 'হরিবোল' বলিতেছে তখন তিনি বাসুকিকে বলিয়াছেন অনার্য্য রাজ্য-স্থাপনের ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। দুর্ব্বাসা চরিত্রের এই রূপ আমাদের সংস্কারকে ক্ষুণ্ন করে, দুর্ব্বাসার এ রূপের সহিত আমরা পরিচিত নহি।

নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর একমাত্র প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে কাব্য তিনখানির অংশবিশেষ খুবই সুখপাঠ্য। কবির বর্ণনায় আবেগ আছে, গতি আছে, ছন্দ আছে। কবির বর্ণনা ঝরনা-ধারার ন্যায় সহজ-স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া গিয়াছে, এই বর্ণনাগুলি-ই কাব্যের প্রাণ ও সৌন্দর্য্য। কাব্যের ঘটনা ও কাহিনী যেন এই বর্ণনার ঝরনা-ধারার মধ্যে লঘু উপলখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। নানাভাবে কাহিনীর প্রবহমানতা ব্যাহত হইলেও, বর্ণনার গতি কোথায়ও রুদ্ধ হয় নাই। কবি-চিত্ত-গঙ্গোত্রী হইতে এই বর্ণনার মন্দাকিনী বিচিত্র লীলায়, বিচিত্র ভঙ্গীতে বহিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত হইবে। রৈবতকের 'পূর্ব্বস্মৃতি' নামক সপ্তম সর্গটি এবং কুরুক্ষেত্র কাব্যের 'বীরের শোক' নামক পঞ্চদশ সর্গটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পূর্ব্বস্মৃতি' সর্গটিতে কৃষ্ণের শৈশব-কৈশোর জীবনের ঘটনার উপর কৃষ্ণের আদর্শের প্রতিফলন কবি কৃষ্ণের স্মৃতি-মঞ্জুষার আবরণ উন্মোচিত করিয়া এমন সার্থকভাবে দেখাইতে পারিয়াছেন যে বহু বৎসরের বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করিয়া সে-চিত্র আমাদের মনের দর্পণে স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। কৃষ্ণের স্মৃতির ভিতর দিয়া চিত্রগুলি ভাসিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহারা এমন কোমল ও পেলব হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ দিবালোকের রূঢ়তায় যেন তাহারা বিস্মৃত হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা হয়। চিত্রগুলির মধ্যে জ্যোৎস্না-রজনীর স্নিগ্ধতা আছে এবং মার্জ্জিত স্বচ্ছদর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তির ন্যায় একটা স্পষ্টতা আছে।

'বীরের শোক' নামক কুরুক্ষেত্র কাব্যের পঞ্চদশ সর্গটিতে বহু লোকের চোখের জল একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া যেন স্বচ্ছ স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে। সর্গটিতে কাহারও বিলাপ-ধ্বনি শোনা যায় নাই, জগৎ যেন সেখানে স্তব্ধ হইয়া আছে, মহাকাল যেন অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য এই দারুণ শোক-দৃশ্য দেখিতে নিশ্চল হইয়া আছে। সমগ্র সর্গটির মধ্যে যেন একটা বুক-ফাটা মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের উপর পাষাণ চাপা দেওয়া হইয়াছে। কবি এখানে যেভাবে তাঁহার আবেগ-অনুভূতিকে সংহত করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন তাহাতে মনে হয় মধুসূদন আসিয়া যেন নবীনচন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এ সংযম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই শোকের তুষারস্তূপ কবির

অনুভূতির উত্তাপে গলিয়া পরবর্ত্তী সর্গগুলিতে বহু নরনারীর চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পড়িয়াছে কবির চোখ হইতে। তাই কুরুক্ষেত্র কাব্যের শেষাংশ অতি তুচ্ছ রচনা। সেখানে কবি এত বেশী কাঁদিয়াছেন যে পাঠকের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। সেখানেই নবীনচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে।

—শেষ—